পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-'৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

মোছাঃ খোদেজা খাতুন

465932

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
465932

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফেব্রুয়ারি,২০১২

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-'৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাধ্যমে কলা অনুষদে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাহেদা আহমদ
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

465332

গবেষক

মোছাঃ খোদেজা খাতুন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফেব্রুয়ারি,২০১২

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের ঘোষণাপত্র

আমি মোছাঃ খোদেজা খাতুন ঘোষণা করছি যে, ইউ.জি.সি. পিএইচ.ডি. ফেলো হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০০৭-০৮ (পুন:) শিক্ষাবর্ষের, রেজিঃ নং-১০৩ একজন পূর্ণকালীন পিএইচ.ডি গবেষক। আমার গবেষনার বিষয় 'পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-'৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার গবেষণার ফল। জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে আর কেউ গবেষণা করেননি। পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশের জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মোছাঃ খোদেজা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465932

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পিএইচ.ডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে মোছাঃ খোদেজা খাতুন-এর দাখিলকৃত 'পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাহেদা আহমদ
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক
~~এম. ফিল~~/পি. এইচ. ডি
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া শীর্ষক' অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি তাই তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। প্রথমেই আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. জাহেদা আহমদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অভিসন্দর্ভটি রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণায় সহায়ক হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অনেক। আমার শিক্ষক প্রফেসর কে.এম. মোহসীন আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণার বিষয় নির্বাচন এবং বারবার কাজটি করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন আমার শিক্ষক নূরুল হুদা আবুল মনসুর। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। যাঁর পরামর্শ ও সার্বিক সহেযোগিতায় গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি তিনি আমার অপর শিক্ষক প্রফেসর আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে বার বার তাগিদ ও অনুপ্রেণা দিয়েছেন বিভাগের সহকর্মী প্রফেসর ড. শামসুন নাহার, প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম, মোঃ মামুনূর রশীদ, নাছির আহ্মদ ও মোহাম্মদ বিলাল হোসাইন। আমি তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ড. মোহাম্মদ হান্নান তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে তথ্য দিয়ে ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আতিকুর রহমান আমাকে পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে শিক্ষা ছুটি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বৃত্তি মঞ্জুর করেছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী ও পত্রিকা শাখা, ব্যানবেইস

Dhaka University Institutional Repository

লাইব্রেরী, আই.ই.আর লাইব্রেরী, নায়েম লাইব্রেরী, থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভটির বর্ণবিন্যাসে সহযোগিতার জন্য আমার স্নেহধন্য এস. এম. আব্দুল খালেককে আন্তরিক দোয়া ও ধন্যবাদ।

আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি তাঁকে যিনি আমার জীবনে সব সাফল্যের মূলে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন, যাকে এই গবেষণাকালীন সময়ে হারিয়েছি তিনি আমার চাচা আব্দুল করিম জোয়ার্দার। আমার মা-শাশুড়ি, স্বামী, ভাই-বোন ও শুভানুধ্যায়ী যাঁরা সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বাসার ছোট্ট মেয়ে শারমিন সাংসারিক কাজে দায়িত্ব পালন করে আমার গবেষণায় সহযোগিতা করেছে, আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার দুই মেয়ে তৃষা ও অন্বেষা আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েও গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছে। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমার স্বামী মোঃ মোকাররম আলী মিয়ার কাছে আমি অনেক ঋণী। গবেষণাকালীন সময়ে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন ছাড়াও গবেষণা কাজে আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি তার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোছাঃ খোদেজা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
গবেষকের ঘোষণাপত্র	:		I
প্রত্যয়ন পত্র	:		II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	:		III-IV
সূচিপত্র	:		V
ভূমিকা	:		১-৬
প্রথম অধ্যায়	:	১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা	৭-৮৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)	৮৪-১৬০
তৃতীয় অধ্যায়	:	১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা	১৬১-২০৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কমিশনসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা (১৯৪৭-১৯৭১)	২০৯-৩১১
পঞ্চম অধ্যায়	:	শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কমিশন সমূহের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া	৩১২-৩৫৮
উপসংহার	:		৩৫৯-৩৭০
পরিশিষ্ট	:		৮৭১-৩৮৫
তথ্যসূত্র	:		৩৮৬-৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

শিক্ষা একটি জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। একটি উন্নত সমাজ গঠনে, যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, সমগ্র সমাজের তথা প্রগতিশীল বিশ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। প্রায় দুইশত বৎসর স্থায়ী ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী বাংলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কোন বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেনি। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে গঠিত স্যাডলার কমিশন বাংলার শিক্ষার জন্য ব্যাপক সংস্কারের সুপারিশ করে। স্যাডলার কমিশন শিক্ষা সংস্কারের যে বাস্তব পরিকল্পনা ও সুপারিশ পেশ করে সরকার তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গত কারণেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ছিল পশ্চাদপদ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিপুলসংখ্যক হিন্দু কর্মচারি ও শিক্ষক দেশ ত্যাগ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে শূণ্যতা তীব্র আকার ধারণ করে। অন্যান্য সমস্যার সাথে বিধ্বস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনই ছিল সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ। পাকিস্তান সরকার শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমত: পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, তাই এই রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি আদর্শ ও নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত সর্বস্তরের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বেশ কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠন করে এবং দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রয়াস চালায়। সরকারি এসব সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক)গবেষণাকালীন সময়ের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ (coherent) চিত্র তুলে ধরা;

খ) পাকিস্তানের শিক্ষানীতি প্রণয়নে আদর্শগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ধারক সমূহের ভূমিকা পরীক্ষা করা;

গ) সংশ্লিষ্ট সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা

একটি সমাজে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি অনেক জটিল, দ্বান্দ্বিক বিষয় এবং এই উৎপাদক ও প্রভাবকগুলি জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দর্শন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। কীভাবে এইসব বিষয় পাকিস্তানের শিক্ষানীতি প্রণয়নে কাজ করেছে তা বিশ্লেষণাত্মক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্য যে কারণে এই অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে তাহলো, যে সকল ঘটনাবলি পাকিস্তানের দুই অংশের উপর প্রভাব ফেলেছিল তা পর্যালোচনা করা। আমার জানামতে প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কিত যেসব গবেষণা হয়েছে তা ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ের। পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ, পুস্তক রচিত হলেও বড় ধরণের কোন গবেষণা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও কমিশনসমূহ সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়নি। Adam Curle, 'Planning for Education in Pakistan (First Published in Great Britain. 1966) A personal Case Study'র ৫১ থেকে ৭০ পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০, ১৯৬০-৬৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ের কিছু তুলনামূলক আলোচনা করেছেন কিন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যে সব অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে সেই সব বিষয়ের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই গবেষণাটি ১৯৬৫ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

Dr. Sharifa Khatun-এর 'Development of Primary Education Policy in Bangladesh 1947-1990' (Published by University of Dhaka. Printed by city Press. Dhaka-1992.) গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শুধুমাত্র পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন সমূহের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তাছাড়া এই গ্রন্থে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

ড. মোহাম্মদ হান্নান-এর 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস' (প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা-২০০০) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনামলের (১৯৪৭-৭১) কমিশনসমূহ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার নিয়ে যে সুপারিশ করেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কমিশনের অন্যান্য সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ হান্নান-এর 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনেরর ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১' (প্রকাশক ওসমান গণি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০) গ্রন্থের ২৪৭ থেকে ২৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শরীফ কমিশনের সুপারিশ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ২৮৬- ২৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হামুদুর রহমান কমিশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ৪৩৫ থেকে ৪৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নূর খান কমিশনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং এই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় কমিশনের সুপারিশ সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী প্রণীত, " যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ' (জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯) গ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪৫ থেকে ৩৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং পাকিস্তান শাসনামলের যে সমস্ত কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কমিশন সমূহের প্রধান প্রধান সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটিতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার অগ্রগতি, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ও উভয় পাকিস্তানের তুলনামূলক আলোচনা, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

ড. নিতাই দাস প্রণীত 'বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতিও শিক্ষা' (প্রকাশক মোঃ হারুণ অর রশীদ, মীরা প্রকাশনা, ঢাকা-২০০০) গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮৪ থেকে ১১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাকিস্তানের শিক্ষা সম্মেলনের (১৯৪৭) সংক্ষিপ্ত আলোচনা, পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সুপারিশ, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন বা আতাউর রহমান খান কমিশন রিপোর্টের (১৯৫৭) সংক্ষিপ্ত আলোচনা, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ ছাত্রদের শিক্ষার দাবি ও নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব (১৯৬৯) এর স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স শিক্ষার অগ্রগতি ও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।

হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রকাশক-সাঈদ বারী, সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২) গ্রন্থে ৬৭টি প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব প্রবন্ধে শিক্ষার তাত্ত্বিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান শাসনামলের শিক্ষা সম্পর্কে খুব সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর 'সমাজের হাতে ও রাষ্ট্রের খাতে প্রাথমিক শিক্ষা' প্রবন্ধের ৫১ ও ৫২ নং পৃষ্ঠায় স্বল্প পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবুল খায়ের খান চৌধুরী ' মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের ক্রমবিবর্তন' প্রবন্ধের ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ১২১ পৃষ্ঠায় ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশের সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তান শাসনামলের অন্যান্য কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি

তপন বাগচী ও মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সম্পাদনায়, ' বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দু'শো বছর' (প্রকাশক সাঈদ বারী, সূচীপত্র প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৬) । এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারা, শিক্ষা ও জাতীয় জীবন এবং উচ্চশিক্ষা বিষয়ে মোট ৬২টি প্রবন্ধ। এইসব প্রবন্ধে সাম্প্রতিকালের লেখা থাকলেও অধিকাংশ লেখা উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ বাঙালি চিন্তাবিদদের। এসব লেখায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়-(১) বাংলা ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাকুলতা; (২) সকল স্তরের মানুষকে এ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য গভীর আগ্রহ; (৩) সর্বস্তরে এ ভাষা প্রচলনের জন্য ঐকান্তিক দাবি। গ্রন্থটিতে পাকিস্তানের শিক্ষা বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'শিক্ষা ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধের ২৫২ থেকে ২৬০ নং পৃষ্ঠায় শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন (১৯৫৯) নিয়ে সামান্য আলোচনা ও নূর খান কমিশনের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সুপারিশের সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আব্দুর রউফ এর 'শিক্ষা ও উন্নয়ন' প্রবন্ধের ৪২৮ থেকে ৪৩৪ পর্যন্ত পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে কিন্তু শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা ও পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে গবেষণা কর্মটিতে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা, সত্যতা যাচাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়। গবেষণা বিষয়টি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল বিধায় এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ কোন ঘটনার উদ্ভব ও বিকাশধারা বুঝতে হলে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োজন।

গবেষণার উপাদান

শিক্ষা কমিশনসমূহ ও শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে এই গবেষণার মূল বিষয়। তাই শিক্ষা কমিশনসমূহের মূল রিপোর্ট, শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স, ১ম, ২য়, ৩য় পঞ্চবার্ষিক (১৯৫৫-৬০,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০-৬৫, ১৯৬৫-৭০) পরিকল্পনা সেন্সাস রিপোর্ট (১৯৫১,১৯৬২ ও ১৯৭৪), পার্লামেন্ট বিতর্ক, এডুকেশন কনফারেন্স, এডভাইজারি বোর্ড অব এডুকেশনের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, বি-প্রসিডিংস অব এডুকেশন, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি ইত্যাদি থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু গবেষণা কাজে মুখ্য (Primary) এবং গৌণ (Secondary) উভয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তাই গৌণ উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মুখ্য উপাদানের আলোকে যাচাই বাছাই করে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

"পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া" অভিসন্দর্ভের মোট ৫টি অধ্যায়। প্রথমেই ভূমিকায় যে আদর্শের ভিত্তিতে পকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে কী তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তার মূল্যায়ন, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার বিভিন্ন স্তর যেমন–প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয় ও সবশেষে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারত থেকে আগত অভিবাসীরা কিভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় অংশের মধ্যে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি বাঙালির দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে শাসকগোষ্ঠী তাদের ইচ্ছামত ভিন্ন সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা অর্থাৎ ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সিলেবাস সংক্রান্ত যে সকল সমস্যা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কমিশনসমূহের রিপোর্ট, পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কমিশনের রিপোর্টের যে বিষয়গুলি জনগণ প্রত্যাখান করে এবং আন্দোলন গড়ে তোলে তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া উভয়অংশের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে তার চিত্র এবং যে সমস্ত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে তার কত অংশ পূর্বপাকিস্তানে এবং কত অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংখ্যা শিক্ষক ও ব্যয়ের চিত্র বিভিন্ন সারণিতে দেখান হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কমিশন সমূহের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কমিশন সমূহের সুপারিশের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেই চিত্র এবং সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারিদের স্বাধীন মত প্রকাশের উপর যে হস্তক্ষেপ করা হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও পরিশিষ্টে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার, প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা ও হার, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা, শিক্ষিতের হার ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাক মুসলিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

মানুষের নৈতিক উন্নয়ন, সমাজ গঠন ও দেশ পরিচালনায় সর্বোপরি মানবসভ্যতা-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানত শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তাধারা ও কর্ম প্রবাহের মাধ্যমে সমাজের উর্ধ্ব ও অধোগতি নির্ণীত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কেবলই দূর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো শিক্ষাখাতকে স্থবির করে রেখেছিল। সমাজের বিত্তবান লোকেরা শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। আর্যযুগের প্রথম দিকের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তাকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা বলে অভিহিতোকরা হত। এই ব্যবস্থায় শ্রেণী বিভক্ত হিন্দু সমাজে শুধু পুরোহিতোবা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। পশুচারণের উপর নির্ভরশীল আর্য সমাজ নানারকম বৃত্তিমূলক গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে যেমন- ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (অভিজাত ও যোদ্ধা), বৈশ্য (কৃষিজীবী ও বণিকগণ) এবং বিপুল সংখ্যক অনার্য দেশের আদি বাসিন্দারাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত যাদের নামকরণ করা হয় শূদ্র। প্রত্যেক অভিজাত পুরোহিতো(ব্রাহ্মণ) তাঁর পুত্র এবং ভ্রাতুস্পুত্রদের পরিবারের অর্জিত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও প্রার্থনা (স্তোত্র শিক্ষা দিতেন); বার বার আবৃত্তি করতে করতে এগুলি কণ্ঠস্থ হয়ে যেত; সম্ভবত: প্রতিটি পরিবার নিজেদের অর্জিত তত্ত্বের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলত।[১]

পরিষদ (প্রধানত: ব্রাহ্মণ প্রবীণদের সংস্থা), টোল (সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ) এবং পাঠশালা (প্রাথমিক বিদ্যালয়) এই তিন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। প্রাচীনকাল থেকে দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে অস্পৃশ্য এবং দেশের আদি অধিবাসী শ্রেণী তার আওতায় কখনো পড়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২] চতুস্পাঠী শাস্ত্রপাঠের কেন্দ্র ছিল এবং অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ প্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধমঠ সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে টোলগুলি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে সেগুলি ব্রাহ্মণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। টোলে কেবল ব্রাহ্মণরাই পড়াশুনা করতে পারত এবং দশ বৎসর বয়সে পড়া শুরু করে বার বৎসর ধরে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারত। [৩]

বড় বড় সব গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সাধারণত গাছতলায়, মন্দিরের বা কোন বাড়ীর আঙিনায় এসব বিদ্যালয় বসত। বিদ্যালয় বলতে বোঝাত ডজন খানেক বা কুড়িজন ছাত্র আর একজন শিক্ষক।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষককে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হতো। তাকে হয় নিষ্কর জমি অথবা ফসলের কিছু অংশ দেয়া হতো। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল গ্রামের জনসমাজের পক্ষ থেকে গ্রামের দেবতার পূজা করা; তাঁর আনুসঙ্গিক দায়িত্ব ছিল উচ্চতর তিন শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদেরও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শিক্ষা দেওয়া। গুরুর কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ, অনুশীলন ও প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সন্দেহমোচন এবং মননের সাহায্যে সত্যজ্ঞান লাভই ছিল শিক্ষণ পদ্ধতি। বিদ্যালয় জীবনেও ছিল সময়ানুবর্তিতা এবং বিধি-বিধান। গুরুগৃহে ১২ বৎসর জ্ঞান সাধনার পর উপযুক্ত শিষ্যরা সমাবর্তন উৎসবের মধ্য দিয়ে স্নাতকরূপে গৃহ ও কর্মজীবনে ফিরে যেতেন।[৪] প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্য থেকে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়েছিল তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ছিল পরনির্বাণ। বৌদ্ধ শিক্ষার আদর্শ হলো পৃথিবীর বন্ধন ও বাসনা থেকে মুক্তি। তাই ত্যাগ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূলমন্ত্র। সংসার ত্যাগী শিক্ষার্থীরা স্থান পেত বিহারে। তাদের ভিক্ষুরূপে তৈরি করাই ছিল শিক্ষার মূলনীতি ও পদ্ধতি। এ শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তিতা ছিল মূলমন্ত্র।[৫] খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকে বৌদ্ধ মঠগুলি নতুন শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এগুলি ভিক্ষুদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মঠের আশ্রয়ে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করত। ভিক্ষুরা সাধরণত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। এগুলির মধ্যে বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ও গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করে। এসব বিশ্বদ্যিালয়ে চীন, তিব্বত, কোরিয়া, মধ্য এশিয়া ও বোখারা প্রভৃতি দেশ থেকে ভিক্ষুরা আসতেন।[৬] চীনা পর্যটক ইউয়েন সাং-এর বর্ণনামতে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা খ্রিষ্টীয় ৬২৯-৪৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণ শুরু হয় এবং তার কাছে বৌদ্ধমতের পরাজয় ঘটে। তবে জনগণের চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্ম এক গভীর ছাপ রেখে যায়।

প্রাচীনকালে নারী শিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল এবং ঋষি নারীকে ঋষিকা কিংবা ব্রহ্মবাদিনী বলে আখ্যা দেয়া হতো। বিয়ের পর মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থাকত। অনেক ঋষিপত্নী ছিলেন পরম প্রজ্ঞার অধিকারিণী।[৭] কিন্তু সামাজিক ভাঙ্গাগড়া ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে নারী শিক্ষার ধারাটি ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও স্ত্রী শিক্ষার ঐতিহ্য কখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি।

মুসলিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৫৭) বাংলার মুসলমানগণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলেন।[৮] মুসলিম শাসক, উলেমা, সুফী, আমির ওমরাহ ও জমিদারগণ নিজেরা যেমন-বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষিত ছিলেন, তেমনি তারা মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার প্রত্যেক পরগণার গ্রামে মাদ্রাসা, মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ করা হতো। সে সময়ে শিক্ষা ছিল মূলত: মসজিদ কেন্দ্রিক। সমগ্র দেশে এমন কোন মসজিদ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে কোন মক্তব বা মাদ্রাসা গড়ে উঠেনি। ইহা ছাড়া সুফীদের খানকা, উলেমা ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। [৯] সে যুগে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার সর্বস্তর ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের উপর কোন বেতন ধার্য হতোনা।[১০] মুসলিম শাসক এবং সম্পদশালী অভিজাত ও জমিদারবর্গ করমুক্ত ভূমি দান করে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য উদার বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন।

স্কটিশ মিশনারী অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) বলেন যে, সম্পদশালী মুসলমান এবং জমিদার নিজ খরচে শিক্ষক রাখতেন এবং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি আরও বলেন যে, পাণ্ডুয়াতে এমন একজন স্বচ্ছল মানুষের অভাব ছিল যাঁরা কিনা সাধারণের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেননি।[১১] অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময়ে দেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমি কর বা খাজনা মুক্ত তালুক হিসেবে পেয়েছিল।[১২] এগুলোর আয় থেকে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সেকালে রাজভাষা ফারসি। তবে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরবি সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছিল। ইসলামি বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্তে ফারসি ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে আরবিতে লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছিল। এছাড়া সতের শতকের দিকে এদেশে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ঘটে। উর্দুকে আরবি ফারসির প্রসূতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিজাত মুসলিম এবং শাসক শ্রেণীর মৌখিক ভাষা হিসেবে উর্দু আরবি ফারসির পাশে স্থান করে নেয়।[১৩] কিন্তু বাংলার মুসলমানদের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা ছিল মাধ্যম। ফারসির প্রতি মুসলমানদের অনুরুক্তির নানা কারণ ছিল। প্রথমত ফারসি ভাষায় মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিল; দ্বিতীয়ত: অফিস আদালতের তথা সরকারি ভাষা ছিল ফারসি যা মুসলমানরা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে চর্চা করতেন। এ ছাড়া সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের রুচিশীল সাহিত্যের ভাষা ছিল ফারসি এবং তাদের বিশ্বাস ছিল অন্য কোন ভাষা কিংবা উন্নত পদ্ধতি এর পরিপূরক হতে পারে না। এই ভাষায় সহজ দক্ষতা থাকায় তাদের সন্তান-সন্ততিও ফারসির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সূচনা করত। [১৪] মুসলিম আমলে বাংলায় অসংখ্য আরবি-ফারসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মক্তব, মাদ্রাসা গড়ে উঠে। উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-৩৮) বাংলায় এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেন, যার প্রকৃতি ছিল ধর্মভিত্তিক। [১৫]

আলাউদ্দিন খলজীর সময়ে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ফিরোজ তুঘলো ক উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং আঠার হাজার ক্রীতদাসের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তেত্রিশটি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। [১৬] মুঘলো আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। মুঘলো সম্রাটরা মসজিদ, মাদ্রাসা তৈরি করে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। মুঘলো আমলে অনেক হিন্দু জীবিকা নির্বাহের জন্য আরবি-ফারসি শিক্ষা লাভ করে রাজদরবারের উচ্চ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আরবি-ফারসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা মুসলিম ছাত্রের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলায় আরবি-ফারসি বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ছাত্র ছিল ২০৯৬ জন এবং মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ১৫৫৮ জন।[১৭]

ব্রিটিশ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসার পর ১৮১৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এদেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। বরং এদেশের জনসাধারণকে কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী ও সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হতো। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এদেশ থেকে অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা। তাঁরা মনে করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে দেশীয় সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে এবং জনগণ এতে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়বে। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুললে তারা আত্মসচেতন হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পাবে, যে প্রাধ্যান্য তাদের পূর্বে ছিল তা এত শীঘ্রই ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।[১৮] সুতরাং কোম্পানির শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলিয়াম উইলবারফোর্স ১৮১৩ সালে ভারতে শিক্ষা ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তখন এ সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর জনৈক সদস্য বলেন যে, ইংল্যান্ড তাদের ভুলের জন্যই আমেরিকা হারিয়েছে। তাদের ভুল ছিল, সেখানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারত প্রসঙ্গেও যেন ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।[১৯]

এতদসত্ত্বেও ইংরেজদের আগমনের পর থেকে কোম্পানি শাসিত বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার স্থলে আধুনিক বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটে। যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতির প্রসার মানুষের জন্য নুতন দিক-নির্দেশনারূপে কাজ করে। তাই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, ইউরোপের আধুনিকতার ঢেউ এদেশকে প্রভাবিত করে। স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন খ্রিষ্টান মিশনারীরা। এছাড়াও স্থানীয় নব্যশিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালি ও ইউরোপীয় সহযোগীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় ইউরোপীয় শিক্ষা চর্চার প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ।

বাংলায় প্রথমে ইংরেজি শিক্ষা বেসরকারি উদ্যোগে শুরু হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে যে ধরণের উন্নতি দেখা গিয়েছিল সে সম্বন্ধে অবহিতোহয়ে এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ইউরোপীয়দের সহযোগিতায় পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহী হন। হিন্দু কলেজ, রামমোহন রায়ের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল, কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং মণ্ডপ স্থাপনের মধ্যেই তাঁদের প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। [২০]

কোম্পানির কিছু প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন. এ সকল শাসকদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের (১৭৩২-১৮১৮) নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতার কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবেদনক্রমে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা একদিকে যেমন ধর্মীয় ক্ষেত্রে এদেশবাসী সহানুভূতি পাওয়া যাবে অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার আমদানি রোধ করা যাবে। কারণ ১৮২৩ সালে গঠিত পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির অভিমত ছিল প্রাচ্যবিদ্যা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও প্রাচ্যদর্শন হবে শিক্ষার বিষয়। টোল, চতুস্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসা সংস্কৃত কলেজ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। [২১] প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৬৪-১৭৯৪) কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলসেলি কর্তৃক কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও এ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কেবল কোম্পানির তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের ভারতীয় আইন ও ভাষাসমূহ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তবুও ভারতে শিক্ষা বিস্তারে এটি বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল। [২২]

ইংরেজি জানা নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি এবং খ্রিষ্টান মিশনারীরা ভারতে কোম্পানির শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দাবি জানান। এর সাথে যুক্ত হন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা প্রাচ্য শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানান। কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস কলেজ এদেশবাসীকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় বিবেচনা করে লর্ড মিন্টো নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই ১৮১৩ সালের সনদ আইনের ৪৩নং ধারায় বলা হয় কোম্পানি রাজস্ব হতে প্রাপ্ত অর্থের প্রায় এক লক্ষ টাকা এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে। এই আইনে শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের জন্য তিনতি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় যথা- (১) শিক্ষিত ভারতীয়দের উৎসাহ দান (২) সাহিত্যের পুনর্জীবন ও উন্নতি সাধন এবং (৩) ভারতে গড়ে উঠা ব্রিটিশ বসতিতে বসবাসকারী ইংরেজদের জন্য বিজ্ঞানের প্রচলন ও উন্নতি সাধন। [২৩]

১৮২৩ সালে বাংলা প্রদেশে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য দশ সদস্যের একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ.টি. প্রিনসেপ এবং এইচ. এইচ. উইলসনের মত ব্যক্তিদ্বয়। ১৮১৩ সালে সনদ আইনে মঞ্জুরীকৃত এক লক্ষ টাকাও কমিটিকে দেয়া হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে আরবিও সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক বেশি থাকায় কমিটি সুপারিশ করে- ক) কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন. খ) ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন; গ) আগ্রা ও দিল্লীতে দু'টি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন; ঘ) আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ; ঙ) প্রাচ্য পণ্ডিতবর্গ নিযুক্ত করে প্রাচ্য ভাষায় ইংরেজি পুস্তকাদির অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা। [২৪] কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৮২৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ও আগ্রায় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে মিশনারীদের ভারতে প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়ায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে অতি দ্রুত। এই আইনের দ্বারা কোম্পানির কর্মচারী ও মিশনারীদের মধ্যে সম্প্রীতি পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এর প্রধান কারণ ছিল সেই সময়ে ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে এদেশের জন্য কল্যাণকর কিছু করার ধারণা জন্মে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এদেশীয়দের জন্য সরকারি চাকরির দ্বার উন্মোচিত করা । কিন্তু ব্যবস্থাটি কার্যকরী হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

গভর্নর জেনারেলের আইন বিষয়ক সদস্য ম্যাকলেকে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে ১৮১৩ সালের সনদ আইনের শিক্ষা বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেন- "A single shelf of a good European literature was worth the whole native literature of India and Arabia" অর্থাৎ ইউরোপীয় সাহিত্যের এক তাক বই সমগ্র ভারত ও আরবি সাহিত্যের চেয়েও মূল্যবান।"[২৫] তিনি আরো বলেন, আমাদের ভাষাতে যে সাহিত্য রয়েছে তার মূল্য তিনশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা একত্রে যে সাহিত্য ছিল তার চেয়েও বেশি। সংস্কৃত এবং আরবিমাধ্যমে শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ভুল ইতিহাস, ভুল জ্যোতির্বিদ্যা, ভুল চিকিৎসা শিক্ষা দিচ্ছি কারণ আমরা এ সবের সাথে ভুল ধর্মের সাহচর্য দেখতে পাই। ম্যাকলে বলেন, " আমরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ চাই যারা রক্তে এবং রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজ, মনন, নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।[২৬] ম্যাকলের বক্তব্য থেকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক শিক্ষা বিষয়ে নির্দেশনা দেন যে, ১। ব্রিটিশ সরকারের উচিত কাজটি হবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। ২। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্থানীয় কোন স্কুল বা কলেজ বন্ধ করা হবে না। তবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। সরকারি নীতির এই পরিবর্তনের ফলে ক্রমে বাংলায় বেশ কিছুসংখ্যক সরকার পরিচালিত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে উঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আসত বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ১৮৩৭ সালে সরকারি অফিস আদালতে ফার্সির বদলে ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা চালু এবং ১৮৪৫ সালে সরকারি চাকুরিতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় ইংরেজি স্কুল-কলেজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। [২৭]

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি শিক্ষা পরিচালনা সংস্থা কাউন্সিল অব এডুকেশনকে বাদ দিয়ে রেভেনিউ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। একশত ভার্নাকুলার স্কুলের মধ্যে বিয়াল্লিশটি পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলিতে বাংলাভাষার মাধ্যমে লিখন, পঠন, গণিত, ভূগোল ও ভারতের ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হতো। তবে সরকারি উদাসীনতার কারণে দশ বৎসরের মধ্যে ছাব্বিশটি স্কুল টিকে ছিল।[২৮] সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালার অভাবে এ পর্যন্ত শিক্ষার তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন নবায়নের পূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ১৮৫৪ সালে শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন। এতে প্রথমবারের মত সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও মাতৃভাষা স্বীকৃতি পায় এবং একটি জনশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা হয়। স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি অর্থের অপর্যাপ্ততার কারণে ডেসপ্যাচ প্রণেতারা গ্রান্ট-ইন-এইডের মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার কথা বলেন। [২৯]

১৮৫৪ সালে শিক্ষা পরিষদ কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করলে কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলী তা নাকচ করে দেন। কিন্তু ১৮৫৩ সালে দেখেন যে, ভারতীয়রা শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে এবং এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেচপ্যাচ কলকাতা ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাজ অথবা ভারতে যে কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে তবে শর্ত দেওয়া হয় যে সেখানে পরিমিত সংখ্যক শিক্ষায়তন ও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লাভের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী থাকতে হবে। এছাড়াও বলা হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রী প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডেচপ্যাচ আশা করেছিল যে এসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগ যেমন: আইন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, আরবি বিভাগ ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং ভাষা সাহিত্য বিষয় চালু করবে। ১৮৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩০]

চার্লস উডের ডেসপ্যাচের কিছুটা বাস্তবায়িত হবার ফলে বাংলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ সরকার নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে ১৮৮২

Dhaka University Institutional Repository

সালে হান্টার কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিতোকরে ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিছুটা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী দুই দশক কলেজিয়েট ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগে আরো ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের তেমন উন্নতি হয়নি। লর্ড কার্জন তার বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইনের মাধ্যমে এই ত্রুটি দূর করার প্রচেষ্টা চালান, যদিও কার্জনের এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ বিরোধী নাগরিক তৈরি করেছে। তবে কার্জনের গৃহীত ব্যবস্থা শিক্ষার গুণগত মানের তেমন উন্নতি ঘটায়নি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হবার জন্য এবং শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে সিমলায় একটি সম্মেলন আহবান করেন। এটি ছিল নিখিল ভারতের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন। পনের দিন আলোচনার পর একশত পঞ্চাশটি সিদ্ধান্তসহ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য এই সম্মেলনে কোন ভারতীয় ছিলেন না।

শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন ঐ বৎসরই তার রিপোর্ট পেশ করেন। এতে বলা হয়-

ক) প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে প্রথম ও প্রধান করণীয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কঠোর এবং নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বাবধানে মহাবিদ্যালয়সমূহকে অনুমোদন দিতে হবে এবং অনুমোদনের ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে।

গ) ছাত্ররা শর্তের অধীন থাকবে, তাদের পড়াশুনায় মনোযোগী হতে হবে এবং পর্যাপ্ত লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে বস্তুগত পরিবর্তন আনতে হবে এবং

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষাদান কার্যক্রম বর্ণিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে।[৩১]

সরকার ১৯০৪ সালে শিক্ষা সম্মেলনের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। এতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক প্রশাসন সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে-

ক) চেয়ারম্যান হিসেবে উপাচার্য থাকবেন।

খ) যে প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সেখানকার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন সদস্য হিসেবে থাকবে।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত ৭ জন বা ১৫ জনের বেশি নয় এমন সংখ্যক সাধারণ সদস্য।

ঘ) সিন্ডিকেটের সংখ্যাধিক্য সদস্যদের দ্বারা সদস্য নিযুক্ত হবেন, যিনি অনুমোদিত কোন মহাবিদ্যালয়ের প্রধান হবেন এবং মহাবিদ্যালয়গুলোকে সহকারি অনুমোদন পেতে হলে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) মহাবিদ্যালয়ে আশানুরূপ প্রশাসনিক সংগঠন;

খ) প্রয়োজনীয় শিক্ষকমণ্ডলী থাকতে হবে;

গ) মনোজ্ঞ গ্রন্থাগার ও

ঘ) চাহিদানুরূপ পরীক্ষাগার।[৩২]

শহর এবং গ্রামের জন্য আলাদা পাঠ্য তালিকার প্রস্তাব করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলা হয় সরকারি অনুমোদন ছাড়া বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ও ইংরেজি উভয়কে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য লর্ড কার্জন প্রত্যেক জেলায় একটি করে উন্নতমানের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, যে বিদ্যালয় বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঝে আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হবে। তিনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বেশি করে আর্থিক মঞ্জুরি দিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন এবং বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের পাঠদানের দায়িত্ব এবং এই উদ্দেশ্যে অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ পূর্ব বাংলার জনগণের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। বঙ্গ ভঙ্গের পর পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত চার লক্ষ টাকায় প্রাদেশিক গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। স্বায়ত্তশাসনমূলক জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০৭ সালে অর্থ বরাদ্দ করে। পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক এবং বেশি হলে একজন মনিটর নিয়োগ করা হয়। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। অল্প সময়ে প্রায় ৪৭০০টি পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন গঠিত হয়। বঙ্গ ভঙ্গ রদের সময় পূর্ববঙ্গীয় জেলা সমূহে ৩১১০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একটি করে পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কুল ছিল।[৩৩] ৪র্থ শ্রেণীর উপর যারা পড়বে না তারা যাতে উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেভাবে পাঠ্যক্রম গড়ে তোলা হয়। বঙ্গ ভঙ্গ রদের পরও এই ব্যবস্থা চালু ছিল তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচীকে জোরদার করে। লে.গ.বাম ফিল্ড ফুলার মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, জনশিক্ষা ও পরিষদ দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন, মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীতে সেকুল্যার বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা কারিকুলামের সংস্কার করেন।[৩৪] এর ফলে ভৌত সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষকদের গুণগত মানের উন্নতি ঘটে। বলা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশি দ্রব্য সামগ্রী বর্জনের সময় বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং বাংলার ছাত্ররাই প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়। স্বদেশি শিক্ষার দাবিতে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯০৫ সালের ৪ নভেম্বর রংপুরের জনসাধারণের ঘোষণাপত্র পাঠ সভায় যোগদান এবং রাজপথে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে সেখানকার স্কুলের শতাধিক ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পাঁচ টাকা হিসেবে জরিমানা ধার্য্য করা হয়। স্বদেশ সেবার জন্য এটি ছিল ছাত্রদের প্রথম দণ্ড।[৩৫]

বঙ্গ ভঙ্গ রদ হবার পর সরকার মুসলমান সমাজের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রশমনের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সরকার এটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এককেন্দ্রিক, আবাসিক ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সরাসরি শিক্ষাদানকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১২ সালে গঠিত নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে তবে কমিটির মতে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষক-কর্মচারী হবেন সরকারি চাকুরে।[৩৬]

সরকার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা গবেষণা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে রিপোর্টের ব্যাপক দায়িত্ব দিয়ে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে। এর চেয়ারম্যানের নামানুসারে এটি স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত। স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট বাংলার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও ব্যয়বহুল সংস্কারের সুপারিশ করে। বিদ্যমান উচ্চ শিক্ষা বিশ্লেষণ করে কমিশন বলে, কলেজগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ফলপ্রসূ সম্মিলন ঘটেনি, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুষ্ঠু সাংগঠনিক ভিত্তি এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্যাডলার কমিশন বাংলার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নুতন ব্যবস্থার সুপারিশ করে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির মধ্যে সম্পর্ক সুবিন্যস্ত হবে।[৩৭] স্যাডলার কমিশন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় স্বয়ংশাসিত কেন্দ্রীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করার সুপারিশ করে। অবশেষে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় Dhaka University Act-1920 গৃহীত হয়।[৩৮] এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলিম জনগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর দ্বার সব সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৯২৯ সালে স্যার হার্টোগ এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতির নামানুসারে এটি হার্টোগ কমিটি নামে পরিচিত। হার্টোগ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত আখ্যা দিয়ে মতামত ব্যক্ত করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানীতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় না হয় নীচু স্তর থেকে ছাত্রদের যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হবে। পর্যাপ্ত সুবিধা, অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাথার্থ নয় মন্তব্য করে কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন যথা- (১) মধ্যভার্নাকুলার স্কুলে বেশি ছেলেদের জায়গা করে দিয়ে পল্লীজীবন সংক্রান্ত কাজ কর্মের সঙ্গে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের প্রচলন করতে হবে যাতে তারা কর্ম বিমুখ না হয়। (২) মধ্যস্তরের লেখাপড়ার সমাপনান্তে ছেলেদের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিকল্প কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা যান্ত্রিক ও শিল্প বিষয়ক বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি লাভ করতে পারে। (৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও চাকুরির উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৯]

বাংলাদেশে সরকারিভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত শুরু হয়নি। এ সময় বাংলায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। এ সময় কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা প্রচলনের কথা চিন্তা করা হয়। সার্জেন্ট স্কীম গৃহীত হলে প্রচলিত প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রীক শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষাদান পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম ওয়ার্ধা শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়।[৪০] প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য গঠিত স্কুল বোর্ড সমূহে জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় স্কুল বোর্ডের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের কারণে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের একটি অংশ সহজে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার সংস্কার সাধন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্ন ও উচ্চ এই দুই স্তর উঠিয়ে দিয়ে ৪ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকাল ধরা হয় এবং শিক্ষক প্রতি অনধিক ৪০ জন ছাত্র স্থির করা হয়।[৪১] যুদ্ধের কারণে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নানা চাকুরির সুযোগ পায় ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরে আসে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় এবং নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা (১৯৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের সংবিধানে নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়) পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয় কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলিত, শোষিত কলকাতার পশ্চাদভূমি হিসেবে খ্যাত পূর্ব বাংলা দেশ বিভাগের ফলে প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান বিভাগগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠে। ফলে পূর্ব বাংলা হয়ে পড়ে সব কিছু থেকে বঞ্চিত এবং বিচ্ছিন্ন। স্বল্প পুঁজি নির্ভর পূর্ব বাংলায় অন্যান্য সমস্যার সাথে শিক্ষা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা

সংশোধিত (Revised) পাঠ্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স ছিল চার বছরের- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর সমন্বয়ে। এই কোর্স সমাপনান্তে কোন বিভাগীয় বহিপরীক্ষা (External) হতোনা, তবে প্রতি স্কুল থেকে নির্বাচিত কিছু শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হত।

পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রাথমিক শিক্ষা দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ছিল সরকার এবং স্থানীয় প্রতিনিধি (Local Bodies)। স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত থাকলেও এটি মূলত সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করত শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। সিলেটের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলা স্কুল বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং শহরাঞ্চলের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ (Municipalities) দায়িত্ব পালন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর লোকাল বডির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো বিদ্যালয়ের গ্রান্টস-ইন- এইড-এর শর্তানুসারে। এই অর্থ আংশিক সরকার থেকে আংশিক তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে আসত। জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হতো পদাধিকার বলে প্রধান কর্মকর্তা (Ex-Officio), নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে। আট বছর জেলা ম্যেজিস্ট্রেট (Ex-Officio) প্রেসিডেন্ট হবে এবং এরপর বোর্ড তার নিজস্ব প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। জেলা পরিদর্শক ছিলেন বোর্ডের পদাধিকারী সদস্য (Ex-Officio member) এবং সেক্রেটারি। সিলেট জেলার (পূর্বে আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে লোকাল বোর্ড, তবে মূলত এর কার্যাবলি সম্পাদন করে স্কুল বোর্ড। স্কুলের উপ-পরিদর্শক ছিলেন লোকাল বোর্ডের প্রধান (Ex-Officio) এবং বোর্ডের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত ডেপুটি কমিশনার প্রেসিডেন্ট (Ex-Officio) এবং জেলা স্কুল পরিদর্শক সেক্রেটারি হিসেবে। বেঙ্গল প্রাথমিক শিক্ষা এ্যাক্ট ১৯৩০-এর অধীনে কোন জেলা স্কুল বোর্ড গঠন করা হয়নি। তাই ঐ সময়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক তার প্রতিবেদনে পরামর্শ দেন যে, প্রদেশের অন্যান্য স্থানে জেলা বোর্ডের কাজ অসন্তোষজনক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এর কার্যাবলি জেলার

Dhaka University Institutional Repository

পরিদর্শন কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। তাই কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্কুলের অন্তত দুইজন স্কুল পরিদর্শক নিয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে একজন জেলা পরিদর্শক এবং একজন মহকুমা পরিদর্শক এবং দুইজন সহকারি স্কুল পরিদর্শক অর্থাৎ একজন উত্তর অঞ্চলের এবং অন্যজন দক্ষিণ অঞ্চলের- এদের সমন্বয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টিপেরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, রাজশাহী এই সব জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। এই বোর্ড সরাসরি প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থাপনা করে থাকে এবং মাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক শাখার বিষয়ে বিভাগীয় পরিদর্শন এজেন্সির সাধারণ পরিদর্শনে অনুদান দেয়। এই অনুদান আংশিক তাদের নিকট প্রেরিত তহবিল থেকে এবং আংশিক তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে সংকুলান করা হয়। জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ছাড়াও কিছু ইউনিয়ন বোর্ড ছিল যারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিজস্ব এলাকায় কিছু ফান্ড গ্রহণ করে। যেমন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কিছু সংখ্যক প্রাথমিক স্কুল নিয়ন্ত্রণ করে যেখানে রেলওয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সন্তানরা লেখাপড়া করত। [৪২]

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৪৮-৪৯ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যয়কৃত অর্থের চিত্র দেখান হলো। [৪৩]

সারণি-১

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৯,৩৫৭	২৯,৬৩৪	২৮,৯৭৯
২. শিক্ষার্থী নিবন্ধন	২০,৪৬,৩১১	২৪,৮৯,০৫৫	২৫,৩১,৪১৭
৩. ব্যয়	১,৫৯,১৮,৪২০	১,৬১,৫৯,৬১৩	১,৭১,৩৩,২৫৭ রুপি।

নিম্নে সারণিতে ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৪৮-৪৯ সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী কর্তৃপক্ষের তালিকা দেওয়া হলো। [৪৪]

সারণি-২

কর্তৃপক্ষ	১৯৪৬-৪৭ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা		১৯৪৭-৪৮ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা		১৯৪৮-৪৯ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	
	বালকদের	বালিকাদের	বালকদের	বালিকাদের	বালকদের	বালিকাদের
১. সরকার কর্তৃক	৩৯	×	৩৯	×	৩৭	×
২. জেলাস্কুল বোর্ড	১৭,৬৮০	৫০১	১৭,৭৮৯	৫০১	১৮,৩২১	৪৯৫
৩. মিউনিসিপ্যালিটি	১৩৮	৫৪	১৩৮	৫৪	১৪৫	৫৬
৪.বেসরকারি কিন্তু পাবলিক ফান্ড থেকে সাহায্য প্রাপ্ত	৫,৭২১	৩,২৫৫	৫,৯২৭	৩,২৫৫	৫,৬০২	২,৬৮১
৫.বেসরকারি কিন্তু পাবলিক ফান্ড থেকে সাহায্য প্রাপ্ত নয়	৯০১	৯৬৭	৯৬৩	৯৬৭	৬৮১	৯৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৬. প্রাথমিক পূর্ব	×	১	×	১	×	২
মোট-	২৪,৪৭৯	৪,৭৭৮	২৪,৮৫৬	৪,৭৭৮	২৪,৭৮৬,	[illegible]

উপরের তালিকায় দেখা যায় পূর্বের বছরগুলির তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ ছিল দূর্বল ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত অর্থের অভাব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র বেতন

১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক ছিলেন ৭৫,৬২৬ জন , এদের মধ্যে ২,৯২৩ জন মহিলা শিক্ষক। ১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ৭০,৪০৩ জন। এদের মধ্যে ২,৪৭১ জন মহিলা শিক্ষক। পর্যাপ্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ৩২,৪৩২ জন পুরুষ এবং ২৫২ জন মহিলা ছিলেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩১,৫০৪ জন পুরুষ এবং ২৩৩ জন মহিলা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেতন পেতেন জেলা স্কুল থেকে শুধু সিলেট অঞ্চলে লোকাল বোর্ড থেকে। স্কুলগুলির বেতনের তারতম্য ছিল। প্রবেশিকা পাশ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রতিমাসে বেতন পেতেন ৩৪/- রুপি ৮ আনা। সহকারি প্রধান শিক্ষক ২/- রুপি কম পেতেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিন্তু প্রবেশিকা পাশ নন তিনি বেতন পেতেন ২৪/- রুপি ৮ আনা। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ বিহীন কিন্তু তিনি যদি বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় (Intilligence Test) উত্তীর্ণ হতেন তাহলে ২০/- রুপি ৮ আনা বেতন পেতেন। প্রশিক্ষণ বিহীন এবং বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন এমন শিক্ষক বেতন পেতেন ১৫/- রুপি ৮ আনা। তবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল।[৪৫]

ছাত্র বেতন

জেলা স্কুল বোর্ড (সিলেট লোকাল বোর্ডসহ) অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের কোন বেতন ছিল না। অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বেতন ছিল যেমন ২ আনা থেকে ৪ আনা। মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শ্রেণীতে ফিসের পরিমাণ ছিল ১২ আনা থেকে ২/- রুপি পর্যন্ত।

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৮-৪৯ সময়ে যে সমস্ত উৎস থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হয় তা দেখান হলো :[৪৬]

সারণি-৩

বিবরণ	প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

		বালক	বালিকা
১. প্রাদেশিক রাজস্ব	৪,১৫৯/- রুপি	৯১,৪৯,৫৮৫/- রুপি	৪,১৮,৫৯১/- রুপি
২. জেলা বোর্ড	১২০/- রুপি	৬১,০৮,৭৭৫/- রুপি	৩,৫৪,৫৪৩/- রুপি
৩. মিউনিসিপ্যাল বোর্ড	১২০/- রুপি	১,৮৯,৫৬০/- রুপি	৬৬,১৪১/- রুপি
৪. ফিস	৬,৯৫৫/- রুপি	১,৯২,৩৩০/- রুপি	৪৯,৯১৬/- রুপি
৫. অন্যান্য উৎস থেকে	৬,১৩১/- রুপি	৩,৩৪,৮৪২/- রুপি	১,৫২,৪৪৪/- রুপি
মোট =	১৭,৪৮৫/- রুপি	১৬,০৭৪,০৯২ /-রুপি	১,০৪১,৬৮০/- রুপি

বৃত্তি ও পাঠ্যসূচী

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে দুটি গ্রেডে বৃত্তি দেওয়া হতো। প্রথম গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্তরা মাসে ৩/- রুপি এবং দ্বিতীয় গ্রেড প্রাপ্তরা ২/- রুপি পেত। অল্প সংখ্যক বালিকা এবং মুসলমানদের জন্য এই বৃত্তি সংরক্ষিত ছিল। পাঠ্যসূচীতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি বিভাগোত্তর সময়ে। যে বিষয়গুলি পরীক্ষার বিষয় হিসেবে চলমান ছিল তাহলো মাতৃভাষা লেখা ও পড়া, পাটিগণিত, ভূগোল এবং গ্রাম্য পৌরনীতি (Rural Civics)। পরীক্ষা বহির্ভূত বিষয় ছিল ধর্মীয় শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি। ইংরেজি উঠিয়ে দিয়ে এটিকে ঐচ্ছিক বিষয় (Optional) করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। মধ্য পর্যায় (Middle Stage) এবং উচ্চ পর্যায় (High Stage)।

মিডল স্কুল

মিডল স্কুল দুই ধরণের মিডল ইংলিশ ও মিডিল ভার্নাকুলার এবং এই মিডল স্কুল দুইটি শ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী। মিডল ইংলিশ স্কুলে ইংরেজি বাধ্যতামূলক এবং মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। উভয় স্কুলের পাঠ্যক্রম তৈরী, অনুমোদন প্রদান, অনুদান বরাদ্দ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত স্কুলকে জেলা বোর্ড বা পৌরসভা সাহায্য সহযোগিতা করে যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সেই সকল স্কুলের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের জন্য ম্যানেজিং কমিটিও তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকত। বালকদের মিডল স্কুলের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করতেন জেলা স্কুল পরিদর্শক (সিলেট জেলায় উপ-পরিদর্শক) এবং তাকে সাহায্য করতেন মহকুমা স্কুল পরিদর্শক। মেয়েদের মিডল স্কুলের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করতেন সহকারি স্কুল পরিদর্শিকা (Assistant Inspectresses)।[৪৮]

নিম্নের সারণিতে পূর্ব বাংলার মিডল স্কুলের সংখ্যা এবং ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৪৯ সময়ে যে ব্যয় করা হয় তা তুলে ধরা হলো : [৪৯]

সারণি-৪

বিবরণ	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
১. মিডল ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা	১৯৪৯	২১২৫	২১২১
২. মিডল ভার্নাকুলার স্কুল	৫০	৫০	৫১
৩. মিডল ইংলিশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা	১,৬৮,৩৩৩ জন	১৮৯৪৪	১৮৯৭৭১
৪. মিডল ভার্নাকুলার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা	৫,৬০১	৫,৫০৫	৫৪২৩
৫. মিডল ইংলিশ স্কুলের ব্যয়	৩৬,৭১,১৬৯/- রুপি	৩৯,৮৩,২৫৫/-রুপি	৪৩১৫৮৮৭/-রুপি
৬. মিডল ভার্নাকুলার স্কুলের ব্যয়	৭৯,৯৫২/- রুপি	৮১,৫৩১/- রুপি	১,০০,৬৩৮/-রুপি

নিম্নের সারণিতে ব্যবস্থাপনা (According to Management) অনুযায়ী মিডল স্কুলের সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণি-৫

	১৯৪৬-৪৭				১৯৪৭-৪৮			
	M.E. School		M.V. School		M.E. School		M.V. School	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
১. সরকারি	২	৩	৩	×	২	৩	৩	×
২. জেলা বোর্ড (সিলেট লোকাল বোর্ডসহ)	২	×	১৭	৩	২	×	১৭	৩
৩. পৌরসভা	৫	১	২	×	৫	১	২	×
৪. অনুদান প্রাপ্ত (Aided)	১,৩৪০	১৪৮	২২	৩	১,৪৭১	১৬৪	২২	৩
৫. অনুদান বিহীন (Unaided)	৩৯১	২৯	×	×	৪৪০	৩৩	×	×
মোট	১৭৪০	১৮১	৪৪	৬	১৯২০	২০৫	৪৪	৬

শিক্ষকদের বেতন, যোগ্যতা এবং চাকরির শর্তাবলি

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মিডল স্কুলে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১০১৫৬ জন, এদের মধ্যে ৩০৫ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং মোট শিক্ষকের ৯৬৪৪ জন পুরুষ এবং ৫১২ জন মহিলো। । ১৯৪৮-৪৯ সালে মিডল স্কুলের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৯৪৬৫ জন। এদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

২৬৪৮ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। মোট শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৮৯৮৫ জন এবং মহিলো। শিক্ষক ৪৮০ জন। মিডল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল আই.এ বা আই.এস.সি. এবং সহকারি শিক্ষকের জন্য ন্যূনতম প্রবেশিকা পাশ। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অনেক সময় এই যোগ্যতা শিথিল করা হয়। অনুদান প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অনুদান বিহীন স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় বেশি ছিল। তবে মিডল গার্লস স্কুলের শিক্ষকের বেতন মিডল বালক স্কুলের তুলনায় বেশি ছিল। মিডল স্কুলের শিক্ষকগণ শর্ত সাপেক্ষে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন এবং তাদের অনুমোদন দিতেন শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষকদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত উভয় ক্ষেত্রেই মহকুমা কর্মকর্তাকে অবহিতোকরা হয়। মিডল স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ছিল ১৫ থেকে ৩০ রুপি। শিক্ষক প্রতিমাসে ৫ রুপি মহার্ঘ্য ভাতা পেতেন। শিক্ষকদের এই বেতন ছিল অপর্যাপ্ত ফলে তাদের দূর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়।[৫১]

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও বেতন

৩১ মার্চ ১৯৪৯ সালে মিডল স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭৪৩২২ জন বালক এবং ১৫৩০৯ জন বালিকা। ১৯৪৭-৪৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭২৩২৬ জন বালক এবং ১৭১১৫ জন বালিকা। ছাত্র বেতন ছিল ৮ আনা থেকে ২ রুপি পর্যন্ত। নিম্নের সারণিতে ১৯৪৮-৪৯ সালে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো।[৫২]

সারণি-৬

বিবরণ	মিডল ইংরেজি স্কুল		মিডল ভার্নাকুলার স্কুল	
	বালকদের (রুপি)	বালিকাদের (রুপি)	বালকদের (রুপি)	বালিকাদের (রুপি)
সরকারি	৮২৯০১৫/-	২৬০০১৯	৫৫১৩৫/-	৮৫৬৮/-
জেলা বোর্ড (সিলেট লোকাল বোর্ডসহ)	৪৪০৪২১/-	১৭৩৩৩/-	১৩০৭৯/-	১৫০৭/-
পৌরসভা	৮৩৩২/-	৬২২৯/-	১৬২৪/-	২৮/-
ডফস	১৭৭৬৮৮১/-	১২৫২৫৭/-	৪৩১৪/-	১৫৫৮/-
অন্যান্য উৎস	৭৩৫০১৭/-	১১৭৩৮৩/-	৯৩২৩/-	৫৫০৪/-
মোট-	৩৭৮৯৬৬৬/-	৫২৬২২১/-	৮৩৪৭৫/-	১৭১৬৩/-

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যসূচী

অনুমোদনপ্রাপ্ত মিডল স্কুলের জন্য বিভাগীয় পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়। পার্থক্য ছিল স্কুল পরিদর্শকের জ্ঞাতার্থে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার জন্য মেয়েদের স্কুলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সংগীত, সেলাই, অংকন এবং রান্নার কোর্স পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে মিডল স্কুলগুলির পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তন করা হয়। হাই ইংলিশ ও মিডল ইংলিশ স্কুলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজি বাদ দেওয়া হয়। তবে সিলেট জেলার মিডল স্কুলে পূর্বের পাঠ্যসূচী বহাল ছিল। সিলেটসহ প্রদেশের সকল মিডল স্কুলে একই পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল

উপরের চারটি শ্রেণী নিয়ে উচ্চ বিদ্যালয় গঠিত। ৯ম ও ১০ম এই দুইটি শ্রেণী শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতঃ অন্যদিকে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শ্রেণীর জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা। মূলত উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারণত ১০টি শ্রেণী থাকে। নিম্নের ছয়টি মিডল ও প্রাথমিক শিক্ষা, উপরের চারটি উচ্চ মাধ্যমিক। প্রাদেশিক সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তিনটি মাধ্যমে যথা-কার্য নির্বাহক কর্মকর্তা (Executive Officers), শিক্ষা বিভাগ (Education Department), এবং পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (East Bengal Secondary Education Board) । উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুদান দেওয়া এবং না দেওয়ার ক্ষমতা ছিল পূর্ব বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। এছাড়া ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ, পাঠ্যসূচী নির্বাচন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। ১ম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে পাঠ্যপুস্তক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগ নির্দেশ দিতেন। শিক্ষা বিভাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন, গ্রান্ট-ইন-এইড ছাড়াও ছাত্রদের ভর্তি এবং বদলি, বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করত। বালকদের উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক। জেলা পরিদর্শককে মাঝে মাঝে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করা হতো। বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চালু ছিল। পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সরকারি পরিদর্শকদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় অধিভুক্তকরণ ও অনুমোদন দান করতেন।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৮-৪৯ পর্যন্ত হাইস্কুলের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা ও পরিচালনা ব্যয় দেখান হলো :[৫৪]

সারণি-৭

বিবরণ	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
১. হাইস্কুলের সংখ্যা	১১৮২	১৩০৬	১৩৭৯
২. ছাত্র সংখ্যা	৩০৫৪১৪	৩৩১০৭৪	৩৫৩৫৬২
৩. পরিচালনা ব্যয়	১৮১৪৯৯৫/- রুপি	২০১৩৮৯৫/- রুপি	১৫৪০১৮৩৬/- রুপি

মোট হাইস্কুলের মধ্যে ১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল ৩৩টি, ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট সরকারি ছিল ৩৪টি, পৌরসভার অধীনে ২টি, অনুদান প্রাপ্ত হাইস্কুলের সংখ্যা ৭৮০ এবং অনুদান বিহীন ছিল ৫৬৪টি। ১৯৪৮-৪৯ সময়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিলো ১৫১৩২ জন এদের মধ্যে ১৪৬৬০ জন পুরুষ এবং ৪৭২ জন মহিলো ।। এদের মধ্যে ২২২৫ জন ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পূর্বের বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ১৪২০৬ জন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোর্ড শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করে। শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদের মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করত তবে অনেক সময় স্কুল কর্তৃপক্ষের তহবিল থেকেও এই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকদের এই বেতন অপর্যাপ্ত ছিল। হাইস্কুল শিক্ষার অসন্তুষ্টির প্রধার কারণ ছিল যোগ্য শিক্ষকের অভাব। স্বল্প বেতনের কারণে অনেক যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় আসতেন না। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা আরো খারাপ ছিল। ৯ম-১০ম শ্রেণীর ছাত্র বেতন ছিল ৩/- রুপি ৮ আনা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ৩ রুপি, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২ রুপি এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১ রুপি ৮ আনা।

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সময়ের বিভিন্ন উৎস থেকে শিক্ষার্থীর ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হলো : [৫৫]

সারণি-৮

উৎস	১৯৪৭-৪৮		১৯৪৮-৪৯	
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
১. প্রাদেশিক রাজস্ব	২৪৩৬৪৩৯	৪১৮৯৫৩	২৫৮৯১৪৬	৪৪৮১৯৮
২. জেলা তহবিল	৩২৮৯২	৪৪৪৭	৬৬৫৮৩	৬৫৭০
৩. পৌরসভা তহবিল	২৫৫	১১৭৪৫	৬২৫	১৪৯৮১
৪. ফিস	৯৬৩০৩৫২	৩৮৪৮৬১	১০২৮৮৪১৯	৩৩১৫৯১
৫. অন্যান্য উৎস	১৪২৩৮১৯	১০৭১৪৩	১৫৩২৮৯৮	১২২৮২৯
মোট	১৩৫২৩৭৫৭	৯২৭১৪৯	১৪৪৭৭৬৬৭	৯২৪১৬৯

E:\Anis\Anis-2011\11-5 doc 13-11-12 doc

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠ্যক্রম

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত পরিমার্জিত (Revised) এবং একক পাঠ্যসূচী জানুয়ারি ১৯৩১ সালে অবিভক্ত বাংলার হাইস্কুলে প্রবর্তন করা হয়েছিল, ১৯৪৯ সালেও একই বিষয় অনুসরণ করা হয়। বিভাগীয় পাঠ্যক্রম ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত পাঠ্যসূচী ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে অনুসরণ করা হয়। পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুসারে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা বিজ্ঞান ও অন্যান্য ম্যানুয়েল বিষয়ের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অগ্রগতি সাধিত হয়। বেশির ভাগ হাইস্কুলে কোন পেশাভিত্তিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯৪৮-৪৯ সালে।[৫৬] পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ স্কুলঘরগুলি পুরাতন দালানে এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। আসবাপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিও অপর্যাপ্ত ছিল। বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি সরবরাহ ছিল নিতান্তই কম এবং কোন কোন স্কুলে এসব যন্ত্রপাতি একেবারেই ছিল না। এই দিক দিয়ে সরকারি হাইস্কুলের অবস্থা কিছুটা উন্নত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষা

দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহর ছাড়া সমস্ত বাংলার মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ রহিতোকরা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র আবাসিক ও শিক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় বিধায় অধিভুক্তকরণের ক্ষমতা না থাকায় সরকার পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৪৭ নামে একটি আদেশ জারি করে (East Bengal Education Ordinance. Ordinance No-1, 1947). এই অধ্যাদেশ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি করণের ক্ষমতা লাভ করে। এই অধ্যাদেশের দ্বারা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি শিক্ষাবোর্ডের স্থলে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের উপর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের বহু কলেজ, টেকনিক্যাল ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ১৩০০ স্কুল পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের আওতায় আসে। এই অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপর আঘাত হানা হয় এবং কাউন্সিলকে সরকারি প্রভাবে নিয়ে আসা হয়। প্রাসঙ্গিক সংশোধনীটির বক্তব্য ছিল- (5a) The executive council of the University of Dacca shall, with the Promulgation of this ordinance, stand dissolved forth with and shall be reconstituted by the Government of East Bengal in the Manner Prescribed true under vig:-

i) The V.C of the University of Dacca shall be President Ex-Officio of the said council, which shall consist of the following of the members, namely:

Dhaka University Institutional Repository

ii) The D P I East Bengal.
iii) Ten representatives of the University of Dacca.
iv) 3representatives of the Governtment colleges.
v) 3 representatives of the Non-Governtment colleges.
vi) 7 representatives of the other interest.

এভাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট সরকারি পর্যবেক্ষণের বাইরে ছিল কিন্তু এই অর্ডিন্যান্সের ১৯নং ধারা বলে তা সরকারের গোচরে আনা বাধ্যতামূলক করা হয়।

এছাড়াও তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের ২৩ তারিখে The Dacca University Amendment ordincance (1947 B Ordincance No XIX of 1948) দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকারি পদের বহু ব্যক্তিকে পদাধিকারী সদস্য হিসেবে কোর্টে মনোনয়ন দান করে। সরকার ৫০ জন ব্যক্তিকে সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ফলে কোর্ট একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ জারির সাথে সাথে ৫৫টি প্রথম এবং দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজকে অনুমোদন দান এবং নিয়ন্ত্রণভার এবং বিভিন্ন ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন পর্যায়ের পরীক্ষা পরিচালনা করতে হয়, যথা-

ক) উচ্চ মাধ্যমিক উত্তর-এর নিজস্ব পাঠ্যক্রমের অধীনে,

খ) উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অধীনে,

গ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অবলুপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এল.সি.ই. পরীক্ষা, সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রামের দিবা কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা পুরাতন মাদ্রাসা পরীক্ষা, জরীপ পরীক্ষা এবং ভ্যাটেনারি কোর্স পরীক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০৯২ জন, ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৬২০ জন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯৮৫ জন।[৫৭]

কলেজ:

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৪৮-৪৯ সময়ে পূর্ব বাংলায় মোট আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৫২টি এবং এর মধ্যে ৫টি মহিলো । কলেজ ও একটি প্রাচ্য (Oriental) কলেজ। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২১৪৮৬ জন যা ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ১৪২৯১ জন। এদের মধ্যে ৩৬৫ জন ছাত্র ছিল ওরিয়েন্টাল কলেজের। ৫২টি কলেজের মধ্যে ৯টি কলেজ (দুইটি মহিলা ও দুটি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজসহ) সরকারি অর্থায়নে এবং অন্য ৩৫টি কলেজ সরকারি অনুদান প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৮-৪৯ সময়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের ছাত্র সংখ্যা ও তাদের ব্যয়ের তালিকা দেওয়া হলো : [৫৮]

সারণি-৯

কলেজের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	মোট খরচ রুপি	প্রতিমাসে গড়ে খরচ হয় প্রতি রুপি ছাত্রের	গড়ে বার্ষিক ব্যয় প্রতি রুপি ছাত্রের
সরকারি কলেজ ৭টি (ছেলেদের)	২৮৯২	৯৮৩৫৭৪/-	২৮.৩	৩৪০.১
সরকারি কলেজ ২টি (মেয়েদের)	১৬৫	৮১৩৬৭১/-	৪১.০	৪৯৩.১
বেসরকারি কলেজ ৪০টি (ছেলেদের)	১৬৪৯৯ + ২১১২	২৩৩৮৩৩৮/-	১০.৪	১২৫.৬
বেসরকারি কলেজ ০৩টি (মেয়েদের)	১৮৩	৩৮৩৭৪/-	১৭.৪	২০৯.৬

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় একটি মাত্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছিল। ৬৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ৬৫ জন পরুষ এবং ৪ জন মহিলো।। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ৭৯ জন। ৬৭ জন B.T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ৬৬ জন উত্তীর্ণ হয়। ১৯৪৮-৪৯ সময়ে ময়মনসিংহে আরও একটি ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। ছেলেদের জন্য ৩টি নর্মাল বা প্রথম গ্রেডের ট্রেনিং স্কুল ছিল পূর্ব বাংলায়। এগুলি পরিচালিত হতোসরকারিভাবে। এগুলি জুনিয়র স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিত। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ স্কুল এবং প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অর্থ একই প্রতিষ্ঠান বোঝায় যার কাজ ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই ধরণের ৮৬টি প্রশিক্ষণ স্কুল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল যার প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৬৪ জন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রতিমাসে বৃত্তি পেতেন ১০ রুপি করে। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ স্কুল বা কেন্দ্রে একই রকম পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা হয়। কোর্সের সময়কাল ছিল এক বৎসর। ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে বিরিসিরি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ স্কুল (The Birisiri Primary Training School) অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক পরিচালিত হতোএবং গ্রামীণ এলাকার কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতোপাশাপাশি শিক্ষা বিভাগের নির্দেশও অনুসরণ করা হতো। মেয়েদের জন্য সরকারিভাবে কোন প্রশিক্ষণ কলেজ ছিল না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন ঢাকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে।[৫৯]

এ্যাংলো পাকিস্তান এবং ইউরোপীয় স্কুল

পূর্ব পাকিস্তানে এ্যালো পাকিস্তান এবং ইউরোপীয়ন স্কুলের সংখ্যা ছিল ২টি। এই স্কুলের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ছিলেন পূর্ব বাংলার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন। ১৯৪৮-৪৯ সময়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭২৬ জন যার মধ্যে ৫৬৩ জন বালক এবং ১৬৩ জন বালিকা। [৬০]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা শিক্ষা

ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য দুটি মাদ্রাসা ছিল পূর্ব বাংলায় তার একটি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা এবং অপরটি সিলেট সরকারি মাদ্রাসা। এছাড়াও ৭টি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, মাগুরা, পশ্চিমগাঁ (Tippera Paschimgaon) এবং নাসিরাবাদ (ময়মনসিংহ)-এ ছিল। দুই ধরণের মাদ্রাসা প্রচলিত ছিল- ওল্ড টাইপ ও রিফর্ম টাইপ। হাই মাদ্রাসা ছিল রিফর্মড টাইপের এবং ইংলিশ হাইস্কুলের ন্যায়। জুনিয়র রিফর্মড মাদ্রাসা মিডল ইংলিশ স্কুলের ন্যায় ছিল। হাই মাদ্রাসার কারিকুলাম, পরীক্ষা পরিচালনা করে পূর্ব বাংলা সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড এবং জুনিয়র মাদ্রাসা পরিচালনা করত শিক্ষা বিভাগ। ওল্ড টাইপের মাদ্রাসা শিক্ষাকোর্স, পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭ সালের ইস্টবেঙ্গল এডুকেশন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী। নিম্নের সারণিতে ১৯৪৮-৪৯ সময়ে দুই ধরণের মাদ্রাসার সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা ও ব্যয় দেখানো হলো :[৬১]

সারণি-১০

মাদ্রাসার ধরণ	টাইপ	মাদ্রাসার সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	ব্যয় (পাবলিক ফান্ড থেকে)
ক) হাই মাদ্রাসা খ) জুনিয়র মাদ্রাসা	রিফর্মড টাইপ	৬৪ ৮৯৬	১২১৯৫ ৪৩৩০৪	৩২৯৩৮৫/- রুপি ৮২৭১১৩/- রুপি
ক) সিনিয়র মাদ্রাসা খ) জুনিয়র মাদ্রাসা	ওল্ড টাইপ	২৩২ ১৬৮	২৮৯৮৬ ১০৩৮৭	৩৭৯৫৫৬/- রুপি ২২১০৮/- রুপি
মোট-		১৩৬০	১৩৪৮৭২	১৫৫৮১২৬/- রুপি

১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলন

১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচীতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রত্যাশা এবং আদর্শের আলোকে ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী প্রকাশ করা।[৬২] যেসব আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, সেগুলির প্রতি পূর্ণশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সম্মেলন মনে করে যে, ' ইসলামের প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা আবর্তিত হওয়া উচিত।[৬৩] এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামি আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং উক্ত আদর্শের বৈশিষ্ট্যসমূহের ভেতর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা এবং ন্যায় বিচার বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করবে।[৬৪] শিক্ষার ভবিষ্যৎ নীতিমালা ও কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহঃ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের মাধ্যমে মিয়া আফজাল হোসেনকে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ ও সহযোগিতা সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আত্মনিয়ন্ত্রিত একটি কমিটি বা Self Governing Body গঠন করার বিষয়ে অনুমোদন দান করে যার নাম দেওয়া হয় পাকিস্তান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (Inter University Board of Pakistan)। বোর্ড গঠিত হবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ জন করে সদস্য, একজন উপাচার্য, অন্য দুইজন সিন্ডিকেট মনোনীত অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য নিয়ে। এই দুইজন সদস্যকে হয় কোন অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষ বা কোন বিভাগের প্রধান হতে হবে। বোর্ড-এ উপাচার্যগণের সমন্বয়ে গঠিত Standing Committee থাকবে যার সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকবে। উপাচার্যগণ যেহেতু বোর্ড-এর Ex-Officeo সদস্য, অন্যরা প্রতিবছর নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে অবসর গ্রহণ করবেন। বোর্ড এর সভা কোথায় এবং কতদিন পর পর অনুষ্ঠিত হবে তা Standing কমিটি নির্ধারণ করবে।

বোর্ড কী কী কাজ করবে তা নিম্নোক্তরূপে কমিটি অনুমোদন করে–

১। পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে মতামত ও তথ্য বিনিময়;

২। পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে বিদেশিবিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন;

৩। ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার সাম্য প্রতিষ্ঠা;

৪। কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;

৬। পরীক্ষা ও শিক্ষার মান বজায় রাখা;

৭। গবেষণার সমন্বয় সাধন;

৮। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করা। [৬৫]

অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত

বোর্ড এর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যেমন– সভায় ও অন্যান্য ব্যয় সমাধা করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কমিটির সিদ্ধান্ত যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর ১৫০০ রুপি চাঁদা দেবে এবং পাকিস্তান সরকার প্রতি বছর ৫৫০০ রুপি গ্রান্ট প্রদান করবেন। [৬৬]

কমিটি নিম্নোক্ত সম্পূরক কর্মসূচী অনুমোদন করে–

১। পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে;

২। স্কুল ও কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। এই সুযোগ সুবিধা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সমস্ত পর্যায়ের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।[৬৭]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট

উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শামসল উলেমা আবু নাছের আহমেদ। কমিটি নিম্নোক্ত কর্মসূচী ও নীতিমালা গ্রহণ করে– কমিটি অত্যাবশ্যক মনে করে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রয়োজন মতো অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল হওয়া উচিত ৮ বছর। এর ব্যয় অত্যন্ত বেশি হবে বিধায় প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বছর মেয়াদী হওয়া উচিত এবং সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ বৃদ্ধির সাথে সাথে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে এর মেয়াদ ৮ বছর করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে এটিকে ৬ বছরের স্থলে ৫ বছর করা হয়। এর ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বিশেষ করারোপ সরকারের বিবেচনা করা উচিভ।

প্রাথমিক পূর্ব শিক্ষা

৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের বিশেষ স্কুলে পড়াশুনার জন্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কমিটি স্কুলের কোর্স সমূহের জন্য ১ বছর করে সময় বাড়িয়ে দেন যেমন–

প্রাথমিক পূর্ব	৩ থেকে ৬ বছর।
প্রাথমিক	৬ থেকে ১১ বছর।
মধ্যম	১১ থেকে ১৪ বছর।
মাধ্যমিক	১৪ থেকে ১৭ বছর।[৬৮]

শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ বা নীতিমালা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত

১। মানুষ মানুষের ভাই-এই ইসলামি আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হওয়া উচিত। এর সাথে যুক্ত করা হয় সামাজিক গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় বিচার।

২। সব ধর্মের মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা করা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।

৩। শিক্ষায় আত্মিক, সামাজিক ও ভোকেশনাল বিষয়াদির সমাবেশ থাকবে।

শিক্ষার মাধ্যম

কমিটি মনে করেন নবজাতি পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সাধারণ ভাষা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে কমিটি উর্দু ভাষাকে সাধারণ ভাষা হিসেবে নির্বাচনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। কিছু সদস্য মনে করেন উর্দু শুধু পাকিস্তানের সাধারণ ভাষাই হবে না, প্রতিটি প্রদেশের শিক্ষার মাধ্যম হবে। অনেক সদস্য মনে করেন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন ভাষাকে নির্বাচন করা হবে তা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু উর্দু বিদ্যালয়সমূহে দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কমিটি দ্বিতীয় মত সমর্থন করে। D P I পূর্ববঙ্গে উর্দু দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা নয়, পছন্দমত যে কোন একটি হবে। কমিটি ইংরেজি বিষয়টিও বিবেচনা করে এবং উপদেশ প্রদান করে যে, পরিবর্তে হিসেবে এটাকে স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে রাখা হবে।[৬৯]

বয়স্ক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট

২৮ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে ১১-৩০ মিঃ গণপরিষদ কমিটির কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. কুদরত ই খোদাকে সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক ভাষাকে এই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কলেজ ছাত্রদেরকে এই বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহিতোকরার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করা হয় । চলমান স্কুলভবনে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং স্টাফ দিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়।[৭০]

নারী শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট

বেগম সায়েদা ফাতিমা রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। কমিটির সভা ২৮ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে গণপরিষদ ভবনের ২৮নং কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণের জন্য কমিটি অনুমোদন করে-

১। পাকিস্তানের সকল প্রদেশে নারী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমান সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে তদন্ত ও সত্যিকার পরিসংখ্যান, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হয়।

২। স্থানীয় প্রয়োজন মতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সহশিক্ষা বা অন্যমতে করা হবে।

৩। মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে আলাদা স্কুলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং গার্হস্থ্য সেবাকে কারিকুলামে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪। প্রাথমিক সেবা ও গার্হস্থ্য সেবাকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় বাধ্যতামূলক করা হবে।

৫। মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬। দুইটি মহিলো। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় একটি পূর্ব অপরটি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭। মেয়েদের জন্য বৃত্তি, আবাসন সুবিধা এবং যাতায়াতের সুবিধাসহ অন্যান্য শিক্ষা সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রদেশ সমূহকে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষায় ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের পর উর্দুকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে।

৯। সকল প্রদেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং জমিদারদের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে, নারী শ্রমিকদের বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও এতে অর্থ ব্যয় করতে হবে।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের সম্মেলনের সুপারিশক্রমে An Advisory Board of Education for Pakistan গঠিত হয়। সরকারি নির্দেশ ও সুপারিশক্রমে বোর্ড প্রায় প্রতি বছরের সভায় ১৯৪৭ সালের সম্মেলনের গৃহীত ভাবাদর্শের আলোকে পাকিস্তানের শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। An Advisory Board of Education for Pakistan এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে ৭-৯ জুন করাচীতে। এই সভায় আলোচ্যসূচী ছিল: বেসরকারি স্কুলগুলোতে সরকারি সুবিধাদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।[৭২] ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত ঐতিহাসিক শিক্ষা ভাবাদর্শের আলোকে বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল পর্যায়ে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং অন্যান্য কমিউনিটিভুক্ত কেউ ইচ্ছা করলে এটি পড়তে পারবে।[৭৩]

বোর্ডের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে ঢাকায়। শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত 'ইসলামি ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মনে করেন, অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় শিক্ষার্থীগণকে ইসলামের নবীর জীবনী এবং পবিত্র কোরআনের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করা উচিত। যাতে করে মুসলিম এমনকি অমুসলিম শিক্ষার্থীগণও ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে কর্তব্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা অর্জনে সক্ষম হবে।[৭৪] তিনি পাকিস্তানে বসবাসকারী অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এই ভাবে বলছি না যে, অমুসলিম শিক্ষার্থীরা আরবীতে কোরআন শিক্ষা করবে। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে তাদের (অমুসলিম শিক্ষার্থী) ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে পড়াশুনা করা উচিত, যার উপর আমরা আমাদের শিক্ষার আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছি।[৭৫] কারণ অমুসলিম যারা পাকিস্তানকে নিজেদের রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা ঐ জ্ঞান দিয়েই তা করেছে যার দ্বারা মুসলমানরা নিজেদের জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে (ইসলামি আদর্শ) এবং তারা ঐ আদর্শের ভিত্তিতে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলবে।[৭৬] এভাবে অমুসলিম নাগরিকদের ইসলামি মৌলনীতিগুলির অধ্যয়ন করার উপদেশ প্রদান করেন।

১৯৫০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৪র্থ সভায় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার কারিকুলাম ও আদর্শবিষয়ক সিদ্ধান্ত ছাড়া শিক্ষার ভাবাদর্শগত নতুন কোন চিন্তার বিষয় সন্নিবেশিত হয়নি। ড. মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে বোর্ডের পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয় ভাওয়ালপুরে ১৯৫৩ সালের ৪-৫ মার্চ। উদ্বোধনী ভাষণে ভাওয়ালপুরের হযরত আমীর-এ-আলা ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, জ্ঞান ও অগ্রগতির অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে মানবিকতা ও নৈতিকতা অর্জন করতে হবে। যথোপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা কোন ব্যক্তিকে ন্যায় ও অন্যায় বিভাজন করতে শেখায়। এটি ব্যাপকভাবে ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষার মাধ্যমে মানবতাবাদের শিক্ষা দান করে।[৭৭] সভাপতির ভাষণে ড. মাহমুদ হাসান সকলকে Islamic

Way of thingking as the basis of our Education এর উপর গুরুত্ব উপলব্ধি করার আহ্বান জানান। তিনি এ কথা সকলকে উপলব্ধি করতে বলেন যে, 'আমরা ইসলামের দূর্বোধ্যতার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবো যা আমাদেরকে অগ্রগামীর পরিবর্তে পশ্চাদ্‌গামী করে তুলতে পারে। [৭৮]

পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যাবস্থা পুনর্গঠন কমিটি ১৯৪৯-১৯৫১

ব্যাপক গণদাবির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অসমন্বিত এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নতুন দাবি সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিধায় কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানকে। শিক্ষার সকল স্তর ও পর্যায় ইত্যাদি বিষয়, কমিটির কর্মপরিধি, বিষয়বস্তুর আলোকে প্রায় এক হাজার কপি বিস্তারিত প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবি, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ও সমাজপতিদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। নির্ধারিত দিনের মধ্যে ২৮০টি পুরণকৃত প্রশ্নমালা কমিটির নিকট জমা পড়ে। এর ভেতর জমিয়ত-উল-মুদারেসিন (Jamiat-ul-Mudarrisin)৭৮টি পেপার তৈরি করে যা তাদের বিশেষ উত্তরকে একটি উত্তর হিসেবে ধরা হয়। ২০২ জনের মধ্যে ১৩৫ জন মুসলমান ৪৪ জন হিন্দু এবং ২৩ জন খ্রিষ্টান। [৭৯] মূল কমিটিকে সাহায্যের জন্য নতুন সদস্য ও উপদেষ্টাদের নিয়ে ৭টি সাব-কমিটি গঠিত হয়। যেমন খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন সাব কমিটি, প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সাব-কমিটি, মাধ্যমিক শিক্ষা সাব-কমিটি, মাদ্রাসা শিক্ষা সাব-কমিটি, নারী শিক্ষা সাব-কমিটি, সংখ্যালঘু শিক্ষা সাব-কমিটি, পরীক্ষা সাব-কমিটি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি কমিটি তাদের সুপারিশ পেশ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সুপারিশমালা

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, পরিকল্পনার কৃতকার্যতা যেহেতু প্রধানত শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে তাই শিক্ষকদের বুনিয়াদি শিক্ষা ছাড়াও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যেমন শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাদের সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে, শিক্ষকদের একটা উন্নতমানের সমতুল্য ও পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায়, বি.এ-ইন-এডুকেশন নামে একটি স্নাতক শিক্ষাক্রম প্রচলন এবং পরবর্তী বছর ডিপ্লোমার পর উচ্চতর ডিপ্লোমার জন্য এম.এ.- ইন-এডুকেশন কোর্সের প্রবর্তন করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। একটি মহিলো া প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং প্রতি জেলায় একটি করে মহিলো া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অতিসত্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৮০]

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটির সুপারিশ

পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ৬ বছর এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দুইভাবে যেমন ষষ্ঠ থেকে ৮ম পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক এবং ৯ম থেকে একাদশ পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ কিন্তু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে রাষ্ট্রভাষার একটা সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত উর্দু অথবা আরবি শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ধর্ম শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং সকলের জন্য শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারকে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন এবং ৫০% খরচ সরকারকে বহন করতে হবে। এছাড়াও ছাত্র বেতন দ্বিগুণসহ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধাসহ বহু সুপারিশ পেশ করা হয়।[৮১]

মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট

বিশেষ বিশেষ ইসলামিক বিষয় সমূহের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সকল গ্রুপের জন্য একান্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ পুনর্গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, পুরাতন স্কীমের মাদ্রাসার স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশসহ বহু সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু সরকার আকরাম খান কমিটির সুপারিশের মাত্র কিছু কিছু বাস্তবায়ন করেন। সুপারিশের সংস্কার প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়নি।

১৯৫১ সালে পাঠ্যতালিকা সংশোধনী আইন

পূর্ব বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব এবং মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার প্রাথমিক শ্রেণী সমূহের জন্য সরকার ১৯৫১ সালে ১২-১৫ সেপ্টেম্বর ২৭৮৩নং এডুকেশন বিজ্ঞাপন দ্বারা মঞ্জুরিপ্রাপ্ত সংশোধিত পাঠ্য তালিকা প্রকাশ করে। এই আইন দ্বারা পূর্ব বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব সমূহের পাঠ্য তালিকা সংক্রান্ত ১৯৩৮ সালের ১০ জুন তারিখের ৬৮নং এডুকেশন বিজ্ঞপ্তি রহিতোহয়। এই আইনে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৪ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর হবে এবং এই পঞ্চবার্ষিক কোর্স ১৯৫২ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হবে। ৬ থেকে ১১ বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়বে। এই পরিবর্তন প্রদেশের গ্রামাঞ্চল ও মিউনিসিপ্যাল এলাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[৮২] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হবে না। বিদ্যালয়ের কাজ দুই শিফ্‌টে করতে হবে। একটি শিফটে ছাত্র সংখ্যা ১২৫ এর বেশি হবে না। তিনজন শিক্ষক তাদের শিক্ষা দিবেন। ছাত্র সংখ্যা এর

Dhaka University Institutional Repository

অধিক হলে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন নিয়ে প্রতি ৮৩ জন অথবা এই সংখ্যার অন্তত অর্ধেক অতিরিক্ত ছাত্রের জন্য একজন করে অতিরিক্ত শিক্ষক রাখা যাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দুই শিফটে ছয় ঘণ্টা কাজ করবেন। ৮.৩০-১১.৩০ পর্যন্ত এবং ১.৩০- ৪.৩০ পর্যন্ত অথবা ১ ঘণ্টা পর আধা ঘণ্টা বিরতিসহ সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। [৮৩]

এই আইনের দ্বারা আরও বলা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব এবং মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার প্রাথমিক শ্রেণী সমূহের পাঠ্যতালিকা একই হবে। পূর্বের মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় ৩য় হতে পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বতন স্বতন্ত্র পাঠ্যতালিকা বাতিল হবে। প্রাথমিক পাঠ্য তালিকা হবে:

১.পঠন (মাতৃভাষা), ২. লিখন (মাতৃভাষা), ৩. পাটিগণিত, ৪. সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাথমিক শাসন পদ্ধতি), ৫. প্রাথমিক বিজ্ঞান (প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসহ), ৬. কারিগরি শিক্ষা ও হাতের কাজ, ৭. শারীরিক ব্যায়াম (খেলাধুলা ও সংগীত), ৮. ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা, ৯. উর্দু। বাধ্যতামুলক এলাকায় ৪র্থ শ্রেণী হতে উর্দু আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে হবে এবং অন্যান্য এলাকায় ঐ একই শ্রেণী হতে ইহা ইচ্ছাধীন হিসেবে পড়তে হবে। [৮৪]

এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ১০ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পের অধীনে অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন আইন অনুসারে নির্বাচিত কয়েকটি ইউনিয়নে পাঁচ হাজার স্কুলে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় কিন্তু এই ব্যবস্থা দুই বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। [৮৫]

উর্দুভাষা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তি

পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ নং ২৮ টি.বি.-১৪ মার্চ/১৯৫২, নং ১০ টি.বি., তারিখ ১৮ জুন/১৯৫২, নং ১৩ টি. বি. তারিখ: ২৫ আগস্ট/১৯৫২ এবং নং ২৫ টি.বি., তাং ১৩ জানুয়ারি /১৯৫৩ প্রজ্ঞাপন দ্বারা লেখক ও প্রকাশকগণকে নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে যা সচিব, পূর্ববঙ্গ টেক্সট বুক কমিটি, পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর পরিচালক, পূর্ববঙ্গ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য গৃহীত হবে–

১. মাতৃভাষা (বেঙ্গলি ও উর্দু) প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ সংকলন	১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য।
২. উর্দু পাঠ সংকলন (উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য)	৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য।
৩. উর্দু ব্যকরণ (উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্মিলিত)	৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য।
৪. পাটিগণিত (বাংলা ও উর্দু ভাষায়)	১ম ও ২য় এবং ৫ম শ্রেণীর জন্য।
৫. ধর্ম শিক্ষা ৬. বিজ্ঞান বিষয় (স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ)	৫ম শ্রেণীর জন্য বাংলায় এবং উর্দু ভাষায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ভূগোল এবং পৌরনীতি বিষয়ক	৪র্থ শ্রেণীর জন্য।
৮. উর্দু মানচিত্র (শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য)	
৯. আরবি বর্ণমালা (শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য)	১ম শ্রেণীর জন্য।
১০. শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক হ্যান্ডবুক/ নির্দেশ পুস্তক	প্রাথমিক স্তরের জন্য।
১১. আদর্শ লিপি (হাতের লেখার জন্য)	বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজিতে বাংলা ও উর্দু ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য। [৮৬]

পূর্ব বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ নং ১ টি, বি-৫ জানুয়ারি/১৯৫২ তারিখের নির্দেশক্রমে অ-উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য উর্দুকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা হয় এবং এই মর্মে অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে। স্মারক নং ১০৩ পি,ই, এস. তাং ২০/১০/১৯৫১ এর প্রজ্ঞাপন দ্বারা ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠসূচী প্রকাশ করা হয়। ৫ম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত উর্দু পাঠসংকলন অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং ২২, টি. বি. তাং ১২ জানুয়ারি/১৯৫১ এবং নং ২৪ টি. বি. তাং ১৫ ডিসেম্বর / ১৯৫১, ৫ম এবং ৪র্থ শ্রেণীতে অনুসরণ করা হবে। প্রদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এটি ১৯৫২ সাল থেকে অনুসরণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে উক্ত সংকলনের প্রথম থেকে ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুসরণ করা হবে।

নং ৫ টি. বি. ৫ মার্চ/১৯৫২, পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা অধিদপ্তরের চলমান প্রজ্ঞাপন নং ৩৪ টি.বি. তাং ১৫ ডিসেম্বর /১৯৫১ মোতাবেক পাবলিক ইন্সট্রাকশন পূর্ববঙ্গ-এর পরিচালক কর্তৃক ১৯৫২ সালের অন্ত র্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নিম্নোক্ত টেক্সট বই এর অনুমোদন দান করা হয়। এটি পূর্ববঙ্গের মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৭ম শ্রেণীর জন্য

১. উর্দু পাঠ সংকলন- পাঠ ৩য়, আব্দুল গফুর নাঘভি;
২. সওগাত- মাওলানা সামসুদ্দিন আহমেদ।
৩. বাঘ-ই-উর্দু- আবু মোহাম্মদ হোসাইন।
৪. ইসলামিয়া উর্দু-কী- টিমরী কিতাব- তাহের রেজা।
৫. বুসতান উর্দু পাঠ-২য়, মোঃ আলী আকবর

১৮ জুন/১৯৫১, পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন পূর্ববঙ্গ থেকে সচিব পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগকে লিখিত পত্রে জানান যে, সম্প্রতি উর্দুকে প্রাথমিক স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ৪র্থ শ্রেণী থেকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের আদেশ নং ৭৯১ ইডিএন তারিখ ২৩ মার্চ ১৯৫১ বলে জানুয়ারি ১৯৫২ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে ৫ম শ্রেণীকে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে আনা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে যার অর্থ দাড়ায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো । প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে উর্দু পাঠের যৌক্তিকতা বিচার বিশ্লেষণ না করে (এই বিষয়টি শিক্ষাপদ্ধতি পুনর্গঠন কমিটি অনুমোদন দান করেনি) নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এই বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয় সমূহে উর্দু বিষয়টি শিক্ষাদান সম্ভব নয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ৩০,০০০ শিক্ষককে উর্দু শেখানোর জন্য নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে উর্দু শিক্ষার প্রশ্নটি উঠতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে সরকারকে এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে, সরকার বিষয়টি থেকে নিবৃত্ত হবেন এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে এটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে যা সরকারের নিয়োজিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে অনুমোদিত। এ ব্যাপারে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য নির্দেশ আবশ্যক।[৮৭]

উল্লেখ্য, সচিব পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা থেকে বোর্ডের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ (স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসহ)কে ২১ এপ্রিল ১৯৪৯ সনে জানান হয় যে, পূর্ববর্তী সকল নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অন্যান্য সকল ভাষার সাথে উর্দুও ক্লাসিক্যাল ভাষার সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই *নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং কোন শিক্ষার্থী উর্দুকে প্রধান দেশীয় ভাষা বা বিপরীতক্রমে* নির্বাচন করতে পারবে না।[৮৮] উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই জনসাধারণের মাতৃভাষা ছিল না। ভারত থেকে যে সকল মুসলমান পাকিস্তানে চলে আসে তাদের অধিকাংশের ভাষা উর্দু। উর্দুর কোন প্রাদেশিক মর্যাদা না থাকলেও দু'টো কারণে উর্দুর বেশ প্রভাব ছিল। প্রথমত যে সব শহরে ভারতীয় উর্দু ভাষীরা বসবাস শুরু করে তাদের অধিকাংশই উর্দুভাষী পূরাতন বনেদী পরিবার। তারা ভারত থেকে আগত উর্দুভাষীদের সঙ্গে মিশে শহর এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উর্দুভাষীদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুর কোন স্বভূমি না থাকলেও যে সব অঞ্চলে উর্দু ভাষীরা বসবার করত সেখানে তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় উর্দুর প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।[৮৯]

ভাষার ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের শতকরা হার নিম্নের সারণিতে দেখান হলো :[৯০]

সারণী-১১

ভাষা	পূর্ব পাকিস্তান (১৯৫১-১৯৬১)		পশ্চিম পাকিস্তান (১৯৫১-১৯৬১)		পাকিস্তান (১৯৫১-১৯৬১)	
বাঙালি	৯৮.১৬	৯৮.৪২	০.০২	০.১১	৫৬.৪০	৫৫.৪৮
পাঞ্জাবি	০.০২	০.০২	৬৭.০৮	৬৬.৩৯	২৮.৫৫	২৮.০২
পুশতু	-	০.০১	৮.১৬	৮.৪৭	৩.৪৮	৩.৭০
সিন্ধী	০.০১	০.০১	১২.৮৫	১২.৫৯	৫.৪৭	৫.৫১
উর্দু	০.৬৪	০.৬১	৭.০৫	৭.৫৭	৩.৩৭	৩.৬৫
ইংরেজি	০.০১	০.০১	০.০৩	০.০৪	০.০২	০.০২
বেলুচী	-	-	৩.০৪	২.৪৯	১.২৯	১.০৯

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সচিব, পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা ও নিবন্ধন বিভাগ, শিক্ষা শাখা, ঢাকাকে লিখিত একপত্রে জানান হয় যে, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে দেশীয় ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এ. (পাস) পর্যন্ত অনুমোদন বর্ধিতকরণ ও মানোন্নয়ন সংক্রান্ত আবেদন পত্রটি একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হয় ২০/০৪/১৯৪৯ তারিখে যা কাউন্সিল কর্তৃক বিষয়টি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডের নির্বাহী কাউন্সিল ২৩/০৪/১৯৪৯ তারিখে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:-

১৯৪৮-৪৯ সেশনে এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনাতে উর্দুকে দেশীয় এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি.এ. (পাস) কোর্সের জন্য অনুমোদন দান করে। এই প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সরকারের সুবিবেচনা ও স্বীকৃতির জন্য পেশ করে।[৯১]

অধ্যক্ষ, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা থেকে পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন, পূর্ববঙ্গ ঢাকা, তাং-১৭ মার্চ ১৯৪৯ এ লিখিত এক পত্রে জানান হয় যে, (আপনার) ডাক মেমো নং-৮৬১ সি, তাং ১৪ মার্চ ১৯৪৯ মোতাবেক অত্র কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুতে ছাত্র ভর্তি করা হয় এবং ১৯৪৮-৪৯ সেশনে যেন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু পড়তে পারে তার অনুমোদন কামনা করা হয়। এর জবাবে রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে সচিব পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগকে জানান হয় যে, উর্দুকে দেশীয় এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অনুমোদন দান বিষয়ে পরিচালক, পাবলিক ইন্সট্রাকশন-এর নিকট থেকে আবেদন করা হয় এবং উপাচার্য মহোদয় কলেজটি পরিদর্শনের জন্য ড. ডব্লিউ এইচ সাদানীকে নিয়োগ দান করেছিলেন এবং তার রিপোর্টটি ০৮/০১/১৯৪৯ তারিখে নির্বাহী কাউন্সিল (Executive Council) এর সভায় ১৫-১৫-৪৯ তারিখে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হয় যা ১৯৪৮-৪৯ সেশন থেকে নিম্নোক্তভাবে কার্যকর হবে-

১. উর্দু শিক্ষার ব্যাপারে পৃথকভাবে দুই জন শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হবে। (উর্দু দেশীয় এবং একইভাবে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের জন্য)।
২. কলেজে উর্দু সংশ্লিষ্ট বইপত্র দ্রুত ক্রয়ের জন্য ১০০ রুপি অনুদান পাবে।[৯২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতক (পাস) পর্যন্ত ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, পালি, অর্থনীতি, দর্শন, সংস্কৃত, ইতিহাস, গণিত ও আরবি চালু করার সিদ্ধান্ত, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নং-৭৭ জি, থেকে সচিব পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগ, ঢাকাকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে জানান হয় যে, ৫ জুন ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলে সাময়িকভাবে উপরোক্ত বিষয়ে অনুমোদন দান করা হয়। এই অনুমোদন ১৯৪৯-৫০ (৩ বছর মেয়াদে) নিম্নোক্ত শর্তাধীনে দেয়া হয়:-

Dhaka University Institutional Repository

১. দীর্ঘ ব্যবস্থাপনা পরিষদকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র (বর্তমান কমিটির মেয়াদান্তে) সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কারণ বিষয়টির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

২. উর্দুর জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আরবি শিক্ষার ব্যাপারে আরো মনোযোগ দিতে হবে যা অসন্তোষজনক মনে হয়েছে। অর্থনীতি ও ইতিহাসের প্রভাষককে মানসম্মত হতে হবে।

৩. খণ্ডকালীন শিক্ষকের পরিবর্তে গণিতের জন্য সার্বক্ষণিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৪. শরীরচর্চা বিষয়েও নিয়ম চালু করতে হবে। খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নাই। খেলাধুলার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ৩০০০০/- রুপি বাবু চন্দ্রকান্ত দাস-এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কলেজের নামে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

৬. স্টাফদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে এই অর্থ অন্য কোন অর্থের সাথে মিশে না যায়। এই সঞ্চিত অর্থের হিসাব কলেজ হিসাব থেকে পৃথক রাখতে হবে।

৭. জরুরী ভিত্তিতে একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে, যাতে থাকবে লেকচার রুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, কমনরুম ইত্যাদি।

৮. লাইব্রেরি নিম্নমানের, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০ জুলাই ১৯৪৮ সালে অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিতোকরেন যে, আরোপিত শর্তাবলি মানতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্মত আছে। রেজিস্ট্রার বিষয়টি সচিব, পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের কাছে অনুরোধ করেন যে, বিষয়টির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পক্ষে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। অধ্যক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, দিনাজপুর থেকে ০২-০৬-১৯৪৯ সালে রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান হয় যে, পত্র নং ১৬৩৬৭, তাং ১৮-০৫-১৯৪৯ মোতাবেক কলেজের সঞ্চয়ী হিসাব সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া লিঃ, দিনাজপুর শাখায় যথাসময়ে ৩০০০০/- রুপি জমা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশ অনুসারে কলেজ স্টাফ বাড়ানো হয়েছে এবং গভর্নিং বডিকে এই মেয়াদ পূর্ণ হবার পর পুনর্বিন্যাস করা হয়। উপাচার্যের কলেজে আগমনের পর থেকে কলেজ ৯০০/- রুপি করে সরকারের কাছ থেকে অনুদান পায়।[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে ইংরেজি শিক্ষা বাতিল

পরিচালক, পাবলিক ইন্সট্রাকশন, পূর্ববঙ্গ শিক্ষা বিভাগ থেকে বরাবর সচিব, পূর্ববঙ্গ সরকার, শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ৩ মার্চ ১৯৪৮ সালে এক পত্রে জানান হয় যে, ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় (মাধ্যমিক স্কুলসহ) এবং মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যবাধকতা বহির্ভুত করা হয়েছে। যা পরবর্তী একাডেমিক সেশন থেকে কার্যকর হবে।[১৪]

বোর্ড অধীনস্থ বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদের টিউশন ফি বৃদ্ধি করে শিক্ষক বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

টাঙ্গাইলের শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি এবং কিছু প্রধান শিক্ষক তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাবোর্ডের কাছে অনুরোধ জানান। বোর্ড অধীনস্থ স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র বেতন বৃদ্ধি যথাক্রমে- ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ৫/-রুপি, ৭ম-৮ম শ্রেণীর জন্য ৪/- রুপি এবং ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ৩/- রুপি বৃদ্ধির সুপারিশ করে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে সকাল ৮.৩০ মিনিটে বোর্ড অফিসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বোর্ড কর্তৃক টিউশন ফি বৃদ্ধির অনুমোদন দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সচিব, পূর্ব বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা থেকে সহকারি সচিব, পূর্ববাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে সহকারি সচিব, পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগকে তাং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮ এ বিষয়টি অবগত করা হয়। এই পত্রের জবাবে এম.এ. করিম, সচিব পূর্ববঙ্গ সরকার, ঢাকা থেকে সভাপতি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকাকে জানান হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারের উপর নির্ভরশীল। নীতি নির্ধারণের বিষয়টি সরকারের সাথে সম্পৃক্ত। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বেতন/ফি বৃদ্ধির বিষয়টি বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে সরকারকে অবহিতোকরা উচিত। সরকার বিব্রতবোধ করে এমন কোন বিষয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে করা উচিত নয়। প্রদেশের সর্বত্র টিউশন ফি বৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি সরকারের নীতি নির্ধারণীর সাথে জড়িত বিধায় এ ব্যাপারে সরকারকে দায়ি করা হবে। এ বিষয়ে বোর্ড সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে বোর্ড কোন নির্দেশ দান করতে পারবে না।[১৫]

নারী শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ

পূর্ববঙ্গের গভর্নর ১ মার্চ ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ২৬০০/- রুপি অনুদান মঞ্জুর করেন। এই অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও অনুদানের পরিমাণ নিম্নরূপ।[১৬]

অঞ্চল	বিদ্যালয়ের নাম	অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ
ময়মনসিংহ	১। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	২। ঢুকুরিয়া গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
ফরিদপুর	১। গোপালগঞ্জ বিনাপানি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি

Dhaka University Institutional Repository

বাখেরগঞ্জ	১। ঝালকাঠি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	২। কীর্তিপাশা গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৩। ঢেরগতি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৪। ভোলা গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
অঞ্চল	বিদ্যালয়ের নাম	অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ
চট্টগ্রাম	১। ফতেহবাদ মহাকালি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	২। সীতাকুণ্ডু গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৩। চৌপল্লী জয়তারা গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৪। রসুনগীরি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৫। ভাটিখিনি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
রাজশাহী	১। নাটোর গার্লস হাইস্কুল	৫০/- রুপি
পাবনা	১। মহাখালী পাঠশালা	৫০/- রুপি
বগুড়া	১। আদমদীঘি গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
দিনাজপুর	১। কালিগঞ্জ গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	২। পার্বতীপুর গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৩। রায়গঞ্জ গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
রংপুর	১। হরিপুর সখিনা মজিদ গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	২। উলিপুর গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	৩। রংপুর গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
যশোর	১। ঝিনাইদহ গার্লস স্কুল	৫০/- রুপি
	মোট=	২৬০০/- রুপি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ভারতে অভিবাসন

বিভাগকালীন সময়ে এদেশ থেকে বহু হিন্দু ছাত্র, শিক্ষক এবং পৃষ্ঠপোষক ভারতে চলে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, স্টাফ এবং অর্থ নিয়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ঢাকা পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় শহর। দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকায় ৫৮.৫%

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ছিল হিন্দু। ১৭ জন নির্বাচিত কমিশনারের মধ্যে ১০ জন ছিলেন হিন্দু এবং বাকী ০৭ জন মুসলমান। এই শহরের সম্পদের মধ্যে ইমরাত, দোকান, বাজার এর ৮৫% ভাগ মালিক ছিলেন হিন্দুগণ। নিম্নের সারণিতে এই সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।[৯৭]

সারণী-১২

অমুসলিম হোল্ডিং(শুধুমাত্র হিন্দু এলাকা)

স্থানের নাম	বিভাগের পূর্বে	ডবভাগোত্তর সময়ে		মোট হিন্দু হোল্ডিংস
		পরিবারসহ	পরিবার ছাড়া	
১. টিকাটুলি ও গোপিবাগ	৪৩০	৬	২১	২৭
২. গ্যান্ডারিয়া	৭৩১	১২	২২	৩৪
৩. আরমানিটোলা ও নালগোলা	৭৭৩	৬	১২	১৮
৪. নবাবপুর	২৭৪	৮	৪	১২
৫. বনগ্রাম	২৭২	৫৮	২১	১৯
৬. লালবাগ মুকিম লেইন	৭৪	-	৮	৮
৭. ঠাটারিবাজার	১৩৩	-	১৫	১৫
৮. জোগিনগর	৯১	-	১৪	১৪
৯. মালিটোলা ও পুরানা মোগলটুলি	২৫১	-	-	-
১০. দক্ষিণ মাইনসুনদি	১৮২	১৪	১২	২৬
১১. স্বামীবাগ	৭৭	-	-	-
১২. ওয়ারী	৪৫০	১২	২৫	৩৭
১৩. পুরানা পল্টন ও সেগুন বাগিচা	২৫২	১	৭	৮
১৪. কুলুতোলিয়া	১১০	৫২	১২	৬৪
১৫. বানিয়ানগর	৩৬০	৪২	২৬	৬৮
১৬. লালবাগ এলাকা	৫৮০	৮০	২৬	১০৬
১৭. বৈরাগীতলা	২১৪	২৯	২৫	৫৪
১৮. প্যারীদাস রোড	৯৭	১৬	১৫	৩১
১৯. গোয়ালনগর	৮৩	৩৫	৬	৪১
২০. তাতিবাজার এলাকা	৫৭৩	১০৮	৫০	১৫৮
২১. সানগটোলা	৪৯	৩	৬	৯
২২. সিংতোলা	৬৮	২৫	-	২৫
২৩. দ্বিগবাজার	৩৫	৩	২	৫

Dhaka University Institutional Repository

২৪. লক্ষীবাজার এলাকা	৭৮	৯	১	১০
২৫. শংকরবাড়ী বাজার	৯৩৬	৫৪	১৭	৭১
মোট	৭১৭৫	৫৭৩	৩৪৭	৯২০

ঢাকার প্রায় ৯০% হিন্দু ভারতে অভিবাসন গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারির দাঙ্গার পর ঢাকার কোন কোন বাড়ীতে দুই /একজন বয়স্ক নারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেহ ছিলেন না। এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হিন্দু ছাত্ররা অধিকাংশ ভারতে চলে যায়। নিচের সারণিতে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:-[৭৮]

সারণি-১৩

ক- বিদ্যালয় (বালক)

বিদ্যালয়ের নাম	বিভাগ পূর্ব সময়			পূর্ব সময়ে (১৯৫০ জানু)			বর্তমানে (ডিসেম্বর-১৯৫০)		
	মোট	হিন্দু	মুসলিম	মোট	হিন্দু	মুসলিম	মোট	হিন্দু	মুসলিম
প্রিয়নাথ	৫২৮	৪৭২	৫৬	৩০৩	১৮৭	১০৬	১২৫	৯	১১৪
পোগোজ	৮৭০	৭২৮	১৪২	৭২০	৫৮০	১৪০	২২৪	৫০	১৭৪
জুবিলী	৭২৬	৬১৬	৮০	৮০৪	৭১৯	৮৫	১৮৩	৫২	১৩১
গ্যান্ডারিয়া	৩৮০	৩৭০	১০	৩৩৫	২৪৫	৯০	২৩০	১০	২২০
পূর্ববাংলা	৩৫৭	৩৫৭		২৯৪	২০৪	৯০	১০১	১৬	৮৫
নবকুমার	৩৮৭	৩১৬	৭১	১৬৯	৫১	১১৮	১৪১	৫	১৪৬
মোট =	৩২৪০	২৮৮৯	৩৫৯	২৬৩৫	১৯৯৬	৬৩১	১০১৪	১৪২	৮৭০

[৭৭]

খ- বালিকা বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের নাম	বিভাগ পূর্ব সময়(জানু:- ১৯৪৭)			বিভাগোত্তর কিন্তু ফেব্রুয়ারির দাঙ্গা পূর্ব সময় (জানু:- ১৯৫০)			বর্তমানে (ডিসেম্বর-১৯৫০)		
	মোট	হিন্দু	মুসলিম	মোট	হিন্দু	এুসলিম	মোট	হিন্দু	মুসলিম
নারী শিক্ষা	৬০০	৫৯৭	৩	৩৯৪	২৭৫	১১৯	৮২	৮	৭৪
বাংলাবাজার	৭৫১	৭২২	২৯	৬৮৪	৬০৬	৭৮	৪৬	২	৪৪
আনন্দময়ী	৩৫০	৩২০	৩০	১৮০	৭৫	১০৫	১২০	৫	১১৫
গেন্ডারিয়া	৪৫০	২০৭৪	১৫	২৫৭	২২৭	৩০	১২৫	১০	১১৫
মোট-	২১৫১		৭৭	১৫১৪	১১৮৩	৩৩২	৩৭৩	২৫	৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

গ- জগন্নাথ কলেজ

কলেজের নাম	বিভাগ পূর্ব সময়(জানু:- ১৯৪৭)			বিভাগোত্তর কিন্তু ফেব্রুয়ারির দাঙ্গা পূর্ব সময় (জানু:- ১৯৫০)			বর্তমানে (ডিসেম্বর-১৯৫০)		
	মোট	হিন্দু	মুসলিম	মোট	হিন্দু	মুসলিম	মোট	হিন্দু	মুসলিম
জগন্নাথ কলেজ	১০৯১	৮৩৫	১৫৬	১৪৪১	৪০৩	১০৩৮	৯০৫	৪১	৮০৪

উপরের তালিকায় দেখা যায় জানুয়ারি ১৯৪৭ সালে হিন্দু বেসরকারি স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ২৮৮৯ যেখানে মোট ছাত্র ৩২৪০। ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে মোট ১০১৪ জন ছাত্রের মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৪২ জন অর্থাৎ মাত্র ৪.৪% শিক্ষার্থী পূর্ববঙ্গে রয়ে যায়। ছাত্রীদের মধ্যে ১৯৪৭ সালে মোট ২১৫১ জনের মধ্যে ২০৭৪ জন ছিলেন হিন্দু। কিন্তু ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে এই সংখ্যা দাড়ায় ২৫ জন অর্থাৎ ছাত্রীর হার ১.২%। ১৯৪৭ সালে জগন্নাথ কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৯১ জনের মধ্যে ৮৩৫ জন হিন্দু কিন্তু ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই সংখ্যা দাড়ায় ৪১ জন বা ৩.৬%। আবার হিন্দু শিক্ষার্থীরা অনেকে পরীক্ষার কারণে রয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২৫৭ জন তার মধ্যে হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৬২ অর্থাৎ ৭.১%। ১৯৪৭ সালের পূর্বে হিন্দু শিক্ষার হার ছিল ৬৫%। দেশের মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল ও কলেজের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায়। [৯৯]

পূর্ব বঙ্গের ৪/৫টি ছোট শহর ব্যতীত ৪৫টি বড় শহরে হিন্দু অধিবাসী ছিল সংখ্যালগিষ্ঠ। সারা পূর্ববঙ্গে এদের সংখ্যা ছিল ৩০%। তিন বছর পাকিস্তানিশাসন এবং ফেব্রুয়ারির দাঙ্গার পর উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এছাড়া নেতৃস্থানীয়, সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনে কর্মরত, শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা, করণিক, শিল্প, ব্যবসা, কামার-কুমার শ্রেণীর অধিকাংশ ভারতে অভিবাসন গ্রহণ করে। প্রায় ৫০ লক্ষ অমুসলিম ভারতে চলে যায়। গ্রামের ধনী হিন্দু যারা রয়ে যায় তারা নিরাপত্তার জন্য শহরে বসবাস করে। অমুসলিম শিক্ষকদের অভিবাসনের ফলে পূর্ববঙ্গের ১৪০০ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ৪৮০টি ছাড়া অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায়। আইন ব্যাবসার ৭০% থেকে ৮৫% এবং চিকিৎসকদের প্রায় ৮০% ভারতে চলে যায়। পূর্ববঙ্গের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দুরা গড়ে তুলেছিলেন। অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ববঙ্গে বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ৬৮টি বালিকা বিদ্যালয়সহ ১২৯০টি হাইস্কুল এবং ৪৭টি কলেজ ছিল। ৯০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থায়নকৃত। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের ৯০% ছিলেন হিন্দু। ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট এবং রাজশাহীতে অনেক সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র ছিল। [১০০]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ধরণ:

ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হয়। চলমান শিক্ষার ধরণকে নিম্নোক্ত শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। যেমন-

১. প্রাথমিক-মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা;

২. স্নাতকোত্তর শিক্ষা;

৩. কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা;

৪. ইসলামি শিক্ষা

৫. মাদ্রাসা শিক্ষা।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলবী মোয়েজউদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন নামক একজন আলেম কলকাতায় তশরীফ আনেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে তথাকার কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংকে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দান করতে অনুরোধ জানান। তাঁদের সাথে একমত হয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বলেন: সরকারি কাজ বিশেষ করে ফৌজদারি ও আদালতের কাজ আমলাদের শিক্ষাদানের জন্যও এই শ্রেণীর একটি বিদ্যালয়ের যথেষ্ট আবশ্যকতা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মওলবী মোয়েজউদ্দীনকে উক্ত কাজের ভার দেওয়া হয়। তিনি ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা শহরের শিলাইদহ অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহাই কলকাতা মাদ্রাসা নামে পরিচিত। কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে মওলবী মোয়েজ উদ্দীন ওরফে মোল্লা মদনের মুর্তি অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতা মাদ্রাসার যাবতীয় সাজ সরঞ্জামসহ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। প্রদেশের যাবতীয় মাদ্রাসা পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে হলেও মূলত উহা আলিয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। সিলেট গভর্নমেন্ট মাদ্রাসা ভারত বিভক্তির পর আসাম সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে আসে। যুক্ত বাংলায় ঢাকা, হুগলী, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চারটি সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত মাদ্রাসা ছিল। ১৯১৭ সালের পর এগুলি নিউ স্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়, যা ইসলামিক ও ইংরেজি শিক্ষার সংমিশ্রণে গঠিত হয়, যার মান হয় প্রবেশিকার সমপরিমাণ।[১০১]

১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলায় আলেম, ফাজেল ১২৫টি, কামেল ২টি মোট ১২৭টি মাদ্রাসা এবং উক্ত সনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজার। ১৯৫৭ সালে দাখিল, আলেম, ফাজেল ও কামেল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজারের মতো। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি দেওবন্দের আদর্শে পরিচালিত বহু মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

এবতেদায়ি (প্রাথমিক) ৪ বছর: এই চার বৎসরে পর্যায়ক্রমে কায়েদা, দীনিয়াত, বাংলা, অংক, কোরআন মজীদ, ভূগোল, বিজ্ঞান, ব্যায়াম, ইতিহাস, আরবিসাহিত্য ও উর্দু শিক্ষা দেয়া হয়।

দাখেল ৪ বছর: আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ, বাংলা, উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি, ফিকাহ ও তাজবীদ, ভুগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, কোরআন অংক ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ।

আলেম ৪ বছর: বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি ছিল: কোরআনের অর্থ, আরবি সাহিত্য, ফিকাহ, ইসলামের ইতিহাস, মনতেক, মনাজেরা (তর্কশাস্ত্র), বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ও হাদিস। ইচ্ছাধীন বিষয় ছিল এর যে কোন একটি পড়তে হত-ফারসি, ইংরেজি, বাংলা, শিল্প, সাবান তৈরি, সেলাই, কেতাব বা কম্পোজিং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

ফাজেল ২ বছর: তাফসীর উসুল ই তফসীর, হাদিস, আরবি সাহিত্য, হিকমত, ইসলামের ইতিহাস ও উর্দু। ইচ্ছাধীন বিষয় সমূহ-এর যে কোন একটি পড়তে হবে- মনতেক, তাসাওফ, ফারসি, ইংরেজি, বাংলা ও অর্থনীতি।

কামেল (টাইটেল) ২ বছর: সাহিত্য ও তফসীর বিষয়ে কামেলের সুপারিশ থাকলেও কার্যত হাদিস ও ফিকাহ এই দুই বিষয়ে কামেলে শিক্ষা দেয়া হয়। এই বিষয়ে দুই বছরে বোখারী, মুসলিম, নাসমী, তেরমোজা, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সেহাই সিত্তাব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।[১০২]

পুনর্গঠিত মাদ্রাসা

এই মাদ্রাসা ব্যবস্থা ১৯১৬ সালে চালু হয় যা ইসলামিক ও ইংরেজি শিক্ষার সংমিশ্রণে গঠিত এর মান হবে প্রবেশিকার সমপরিমাণ।

পুরাতন মডেলের মাদ্রাসা

এটি একটি ব্যতিক্রমী গোঁড়া শিক্ষা ব্যবস্থা। এর প্রধান ধাপ এবতেদায়ি দাখিল, আলিম, ফাজিল হিসেবে পরিচিত যা কমবেশি প্রাথমিক, হাফিজিয়া ও ফুরকানিয়া।

হাফিজিয়া ও ফুরকানিয়া

এখানে কোরআন এবং কোরআনের প্রাথমিক পর্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

সংস্কৃত শিক্ষা

এ শিক্ষা হিন্দু সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কৃত শিক্ষা ১০ থেকে ১২ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য।

শিক্ষাদান পর্যায়

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদান নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক শিক্ষাপূর্বস্তর : ২ বছরের জন্য । ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রাথমিক শিক্ষান্তর: পাঁচ বছরের কোর্স–প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুদের জন্য।

মাধ্যমিক স্তর

ক. জুনিয়র হাই স্কুল : ৩ বছরের কোর্স–৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

খ. হাইস্কুল পর্যায়: ২ বছরের কোর্স–৯ম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত।

গ. ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়: কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ের জন্য ২ বছরের কোর্স।

ঘ. স্নাতক পর্যায়: বি.এ., বি.এসসি, বি.কম. পাস কোর্সের জন্য ২ বছর, অনার্স কোর্সের জন্য ৩ বছর।

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ

সার্বিক নিয়ন্ত্রক শিক্ষামন্ত্রী,তার সাথে সচিবালয়, অধিদপ্তর (শিক্ষা), পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও যারা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২১

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩

৩. পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড–হাইস্কুল ও হাই মাদ্রাসা সংক্রান্ত অনুমোদন, পুস্তক নির্বাচন, পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের বিষয় নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট।

৪. জেলা স্কুল বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত মিউনিসিপ্যালিটি।

৫. শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ (বাণিজ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং) শিক্ষামন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল।

৬. মেডিকেল, কৃষি এবং শিল্প সংক্রান্ত বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৭. মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুরাতন নিয়মের মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রাদেশিক বাজেট:

১৯৪৭-৪৮ অর্থ বছরের শিক্ষাবাজেট ১,৩৪,৫৮,০০০ রুপি থেকে ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরের জন্য বৃদ্ধি করে ৪০৫৪৮০০০ রুপিতে বৃদ্ধি করা হয়। বাজেটে সর্বমোট ব্যয় ও শিক্ষা খাতে নিম্নোক্ত অর্থ বছরের ব্যয়সমূহ সারণিতে দেখান হলো : [১০৩]

সারণি-১৪

অর্থ বছর	শিক্ষাখাতে ব্যয়	মোট বাজেট
১৯৪৭-৪৮	১৩৪৫৮০০.০০	৮৮৪৪০০০০.০০
১৯৪৮-৪৯	২৩১০৮০০০.০০	১৫৯৯৮৮০০০.০০
১৯৪৯-৫০	২৭৪৮৯০০০.০০	১৭০৯৬৫০০০.০০
১৯৫০-৫১	২৬৫৫৪০০০.০০	১৮২৩৫৭০০০.০০
১৯৫১-৫২	৩০৮৮০০০০.০০	২২২৫৬০০০০.০০
১৯৫২-৫৩	৪০৫৪৮০০০.০০	২৮০৭৪৭০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিম্নে সারণি দেখানো হলো।[১০৪]

সারণি-১৫

প্রতিষ্ঠান	অর্থবছর				
	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২
কলেজ আর্টস ও ভকেশনালসহ	৫৬	৬১	৬৭	৭৪	৭৬
হাইস্কুল	১৩০৬	১৩৭৯	১৪২৯	১৪৫৪	১৪৬৭
জুনিয়র হাই ও মিডল স্কুল	২১৭৫	২১৭২	২১২১	২০৫৩	১৮৭১
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৬৩৩	২৮৯৭৭	২৬৯৮৯	২৬৩৫২	২৬১৫৬

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

১৬ আগষ্ট ১৯৫১ সালে প্রদেশের সমস্ত গ্রামীণ অঞ্চলে, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এই ধারা মোতাবেক প্রতিবছর প্রত্যেক থানায় একটি করে ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় এবং এর নিয়ন্ত্রণ করে জেলা স্কুল বোর্ড যা শিক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হয়। ২৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৮৫টি স্কুলকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ২ ব্যাচে আনা হয়। অনেক স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৪৭ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯৬৩৩টি কিন্তু ১৯৫৩ সালে তা কমিয়ে ২৬১৫৬টিতে আনা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী নিবন্ধন বৃদ্ধি পায়। যেমন- ১৯৪৭ সালে ২৪৮৯ লক্ষ। ১৯৫৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭৯২ লক্ষে।

শিক্ষা ব্যয়

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় প্রাদেশিক রেভিনিউ থেকে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৭৪ লক্ষ রুপি এবং ১৯৫২-৫৩তে ১৬৭০ লক্ষ রুপি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় ২২২৪২১২৯.০০ রুপি, যার মধ্যে সরকার ৭৫% সরবরাহ কওে, যা শিক্ষা খাতের সর্বমোট বাজেটের ৪১% যা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়।[১০৫]

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

বিভাগোত্তর সময় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯২৩ জন নারী শিক্ষকসহ মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭৫৬২৬ জন যার মধ্যে ৫০% প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। অবশ্য এদের মধ্যে পুরাতন মডেলে শিক্ষকতায় অভ্যস্ত Guru Training School এর মান

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল না। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে উন্নত করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থী হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ধরা হয় প্রবেশিকা। এই প্রকল্প ১৯৫১ সালে চালু করা হয় এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ২৬টি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ইনস্টিটিউটে প্রতি বছরের রিকারিং ৬৫০০০ রুপি এবং নন-রিকারিং ৪৮০০০ রুপি ব্যয় ধরা হয়। [১০৬]

মাধ্যমিক শিক্ষা

১৯৪৭ সালে হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩০৬টি এবং ১৯৫৩ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৪৭৩টিতে। ছাত্র-ছাত্রী নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩০৬৪১৫ থেকে ৩১৭০১৩ জনে। মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বেশিরভাগই স্থানীয় জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল ছিল যা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হতো। কিছু সংখ্যক হাইস্কুল কমিটির দ্বারা পরিচালিত হত। কিছু সংখ্যক হাইস্কুলকে সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেমন-প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা স্কুলসহ ঢাকা ও চিটাগাং-এ একাধিক এই ধরণের স্কুল স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে ৫৪% স্কুলকে সরকার ভর্তুকি দিত এবং ৪৪% স্কুল ছিল ভর্তুকীবিহীন। [১০৭]

শিক্ষার মাধ্যম

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে অনুমোদন দেয়া হয়।

ব্যয়: সরকার ১৯৪৭-৪৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করে ১৪৪৫০৯০৬ রুপি এবং ১৯৫২-৫৩ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পায় ১৯৩২১৫১৫ রুপিতে যা সমস্ত উৎস থেকে অর্জিত আয়ের মাত্র ২০%। [১০৮]

কলেজ শিক্ষা

১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৭৩টি। এর মধ্যে ৬৫টি ছিল আর্ট কলেজ ও ৮টি ছিল প্রফেশনাল কলেজ, যার ছাত্র নিবন্ধন ছিল যথাক্রমে ১৮১৬৫ ও ১৫৮৯ জন। উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিতে বেসরকারি কলেজের কার্যক্রম ছিল অসন্তোষজনক। এর প্রধান ত্রুটি ছিল অযোগ্য স্টাফ, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির অভাব, শিক্ষার্থীদের জন্য অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা ও ক্লাশ রুমের অভাব। অন্যদিকে সরকারি কলেজের অবস্থা সার্বিকভাবে সন্তোষজনক ছিল। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩টি বেসরকারি কলেজের জন্য ব্যয় করা হয় ১.৫ লক্ষ রুপি অন্যদিকে ৩টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয় ১০ লক্ষ রুপি। [১০৯]

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

শুরুতে উপমহাদেশে শিক্ষক শিক্ষণ বলতে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান না বুঝিয়ে বরং সাধারণ বিষয় যেমন- বীজগণিত, জ্যামিতি, জোতির্বিদ্যা ও ইতিহাসে জ্ঞান লাভ বুঝাত। ১৮৫৪ সালে উডের

Dhaka University Institutional Repository

ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৯ ও ১৮৮২ সালে যথাক্রমে কুমিল্লা ও রংপুরে আরও দু'টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। কুমিল্লাস্থ নর্মাল স্কুলটি ১৮৮৫ সালে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য গ্রাজুয়েটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করে। ১৯০৯ সালে ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা ও শিক্ষা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তৈরির জন্য দু'প্রকারের শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠান ছিল যথা- প্রাইমারি ট্রেনিং স্কুল ও প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার। এদেরকে পূর্বে বলা হতো গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মোয়াল্লেম ট্রেনিং স্কুল। প্রাইমারি শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য ১৯৫১ সালে পরীক্ষামুলক চারটি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় প্রবেশিকা পাশ। [১১০] এর মেয়াদ ছিল দুই বছর। ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নর্মাল স্কুলগুলিতে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজে রূপান্তর করা হয়। তবে কোর্সের মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির ন্যায়ই পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল এবং এদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলা হতো "উচ্চতর শিক্ষা সার্টিফিকেট"। ১৯৬৭ সাল থেকে উক্ত কলেজগুলির পরীক্ষা পরিচালনার ভার শিক্ষাবোর্ডগুলির উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সার্টিফিকেটের নতুন নামকরণ করা হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট"[১১১]। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে বহিঃপরীক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাগত বৈশিষ্ট্যও বহুলাংশে হ্রাস পায়।

১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলা সংশোধনী আইন

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই অগণতান্ত্রিক ধারা পাশ করা হয় । এই আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কোন শিক্ষক নির্বাচনী প্রচারণা বা নির্বাচনে নিজে প্রার্থী হতে পারবেন না। এই আইনের বিরুদ্ধে সংসদে শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন," It is a Police act, it is worse than the Rowlatt Act. It is blacker than the Rowlatt Act." [১১২] ১৯৫৩ সালের আইনের অন্য একটি ধারায় বলা হয়, " He shall not take part in or subscribe in aid of or assist in any way any political movement or any activities tending directly or indirectly to excite disaffection against the Government as by law established or to promote, fellings of hatred or enmity between different classes of Pakistani subjects or to disturb the public peace"[১১৩] বলা যেতে পারে ব্রিটিশ আমলেও এমন নিয়ম-কানুন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ যে স্বাধীনতা ভোগ করত কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার আইন করে অন্যায়ভাবে তাদের সেই স্বাধীনতাটুকু হরণ করে।

সেকশন-৩১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পূর্ববঙ্গ সংশোধনী) আইন ১৯৫৩-৪৫এ (।) বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের যে কোন কর্মচারি চাকুরি বিধির নিম্নোক্ত শর্তাদি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। যেমন–

১. তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাহায্য দান, অংশগ্রহণ করা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার বিরোধী কোন হিংসাত্মক ক্র্যিকলাপ বা প্রতিষ্ঠিত আইন পরিপন্থী কোন কাজ যা পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে বা শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কাজে জড়িত হতে পারবেন না।
২. তিনি কোন ভোট প্রার্থনা, নিজের প্রভাব বিস্তার বা পাকিস্তানের আইন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
৩. সাব সেকশন-১এ বর্ণিত নির্বাচনে কোন ব্যক্তি বিরোধিতা করলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বা তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশে কেউ অসন্তোস হলে তিনি সাব-সেকশন এর অধীনে আচার্যের নিকট আবেদন করতে পারেন এবং আচার্য যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটিই চূড়ান্ত হবে।
৫. আচার্য প্রয়োজনবোধে নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত কলেজ গভর্নিং বডির মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাব সেকশন-২-এর অধীনে যে কোন নির্দেশ দান করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে না যদি অপরাধী আচার্যের নিকট কৃতকর্মের কারণ ব্যাখ্যা করেন।
৬. আচার্য বা গভর্নিং বডির নির্বাহী কাউন্সিল সাব-সেকশন-২ এর অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[১১৪]

এই আইনের স্বপক্ষে সরকারি পক্ষ থেকে যুক্তি দেখান হয় যে, অধ্যাপনা ব্রত উপেক্ষা করে অধ্যাপকরা যাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেন সেই উদ্দেশ্যে এই আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই আইনের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের ধারণা সামনে নির্বাচন অধ্যাপকরা যাতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে না পারে এই জন্য সরকার আইনটি প্রবর্তন করে। ১ জুলাই ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্ষেত্রেও একই আইন করা হয়।[১১৫]

১৯৫৭ সালের পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার

পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল এবং পুনর্গঠনের সুপারিশ পেশ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৭ সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন নির্ধারিত অল্প সময়ে একটি রিপোর্ট পেশ করতে সমর্থ হয়। পরিশিষ্টে

Dhaka University Institutional Repository

তিনজন সদস্য তাদের ব্যক্তিগত সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ মন্ত্রীসভা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি কমিশনের প্রথম বৈঠক উদ্বোধন করে সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান দেশ ও জাতির পুনর্গঠনে ও উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সবাইকে আহবান জানান এবং বলেন, " The system must be based on equal opportunities for all, must not encourage an exclusive type of education based on class distinction or class value" [১১৬] মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্মূল্যায়ন করে সাহসী মন্তব্য প্রকাশ করলেও '৪৭ সালে শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত ভাবাদর্শের বিষয়ে চুপ থাকেন। তবে তিনি ধর্মশিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার পার্থক্য অনুভব করে সবাইকে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষার আহবান জানান এবং উচ্চস্তরে "ধর্মতত্ত্ব বিভাগ" স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা প্রকৃতির শিক্ষা ব্যক্তি বা সমাজ কোনটার জন্যই কল্যাণ বহন করে না। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, মাদ্রাসা শিক্ষা একেবারেই মূল্যহীন। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মাঝে একটা পার্থক্য রয়েছে। সকল সামর্থ দিয়ে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করবো। ধর্ম শিক্ষা বর্তমান অপাংতেয় এবং সেকেলে শিক্ষা ব্যতীত গ্রহণ করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাসিক্যাল বিষয়গুলিকে শিক্ষা দিতে হবে। যথা- আরবি ও পার্সী। যেমন- গ্রিক ও ল্যাটিন শিক্ষা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দেওয়া হয়। [১১৭] কমিশনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তিনজন সদস্যের পৃথকভাবে লিখিত ব্যাখ্যামূলক মতামত দেয়ায় সিদ্ধান্তগুলি কতটা সর্বসম্মত ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কারণ তিনজন সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় তিনটি ভিন্নমত প্রকাশ পায়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ত্রুটির উল্লেখ করেন এবং সবার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন এবং দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। কিন্তু তিনি প্রশ্ন তোলেন, " আমাদের প্রয়োজন কি? What really are our requriments? Some people say that in a Muslim state the education should give a chance to the country to become and live the necessity of making the country religious through education and thus the much expected improvement will come" [১১৮] তিনি ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি শিক্ষা ধারার প্রস্তাব করেন। সেখানে তিনি ধর্ম শিক্ষাকে অস্বীকার করেননি বরং যারা ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের সে স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি প্রথম থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার একটি আলাদা ধারা সৃষ্টির প্রস্তাব করেন। সেখানে তাঁরা ধর্মতত্ত্বে এম.এ. এমনকি পিএইচ.ডি পর্যায়ে গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারবেন। ধর্ম শিক্ষার নামে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে আরবিও উর্দুর প্রচলন সম্পর্কে তিনি দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বলেন, 'A severe blow to primary education was delt a few years ago, by introducing Arabic and Urdu as a compulsory subjects in primary schools.' [১১৯] অনেকে আরবি অক্ষরের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্মের একটা সমান্তরাল সম্পর্ক স্থাপন করে মাতৃভাষার চাইতে আরবি ও উর্দু ভাষার প্রতি বেশি অনুরাগ প্রকাশ করে থাকেন। ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে প্রথম থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়নে একটি বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য ছিল।

১৯৫৭ সালের ১৮ আগষ্ট প্রাদেশিক সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং এই আইনের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ড থেকে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । এ সময় স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে। নির্বাচিত স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বাতিল করে নির্বাচিত কিছু স্কুলকে মডেল বা আদর্শ প্রাইমারি স্কুল হিসেবে চালু করা হয়। [১২০] ১৯৫৫-৫৬ সালে অনুষ্ঠিত 'মাদ্রাসা এডুকেশন এডভাইজরি কমিটি' ও ১৯৫২ সালে 'এডুকেশন সিস্টেমস রিকনস্ট্রাকশন কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে আরবি ও উর্দু উভয় বিষয়ই বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় চালু করা হয়। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি, বাংলা ও গণিত একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসর্ভুক্ত করা হয় যাতে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং সবার জন্য সুনির্দিষ্ট একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে উঠিয়ে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তনসহ ব্যাপক সংস্কারের সুপারিশ করে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭ সালে। [১২১]

১৯৫৭ সালের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

প্রাথমিক পূর্ব শিক্ষা

প্রাথমিক পূর্ব শিক্ষা বলতে নার্সারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনকে বোঝান হয়েছে যা প্রদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লক্ষ্যে যেসব শহরাঞ্চলে শিশুর সংখ্যা বেশি সেখানে পৃথক নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যত্র নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে নার্সারী ক্লাশ সংযুক্ত হবে। শিল্প এলাকার জন্য পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্ডারগার্টেন এবং নার্সারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সমস্ত স্কুলের মহিলো । শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু শিক্ষায় অভিজ্ঞ একজন নারী কর্মকর্তা শিক্ষা অধিদপ্তরে থাকবেন। এই শিক্ষিকা স্ট্যান্ডিং কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবেন। প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন এবং নার্সারী স্কুল প্রতিটি জেলা সদরে বিশেষ করে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে নন-রিকারিং ফান্ড হবে ২৭২০০০/-রুপি এবং রিকারিং ফান্ড হবে ২৯৪০০০/- রুপি। নারীদের জন্য ৬টি প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট ৬টি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল পূর্ব শিক্ষার উপর বিশেষ কোর্স থাকবে । এ ক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয় নন রিকারিং ১০০০০০০/- রুপি এবং রিকারিং ২২৫০০০/-রুপি। [১২২]

প্রাথমিক শিক্ষা

১৫ বৎসরের মধ্যে ৬ থেকে ১৫ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং ফ্রি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ৬ থেকে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্য ফ্রি প্রাথমিক শিক্ষা চলমান থাকবে। প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত সহ শিক্ষা থাকবে, বিশেষ ব্যতিক্রমী কোন অবস্থার উদ্ভব না হলে মেয়েদের জন্য আলাদা কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে না। প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত সবার জন্য একই রকম শিক্ষা পদ্ধতি চালু থাকবে। [১২৩]

কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচী

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হবে (ক) শারীরিক উৎকর্ষ (খ) মানষিক এবং ভাবোদ্দীপক বৃদ্ধি, (গ) সামাজিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং (ঘ) প্রাথমিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি। পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ক) মাতৃভাষা পঠন, (খ) মাতৃভাষা লিখন (গ) পাটিগণিত (ঘ) ইতিহাস, ভূগোল এবং পৌরনীতির বিষয়াবলি যা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুখে মুখে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে আংশিক মৌখিক ও আংশিক সাধারণ পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। (ঙ) কারিগরী এবং হস্তশিল্প সম্পূর্ণটাই হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে। (চ) শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা এবং সংগীত হাতে কলমে। (ছ) দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রধানত মুখে মুখে এবং হাতে কলমে দিতে হবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বই-এর সাহায্য নিতে হবে। এছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং মৌখিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে অবহিতোকরতে হবে এবং সংখ্যালঘুদের তাদের নিজ নিজ ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষকদের জন্য হ্যান্ডবুক তৈরি ও প্রকাশ করবে শিক্ষা অধিদপ্তর। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র, পরীক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সরকারি খরচে প্রকাশ করা হবে। বার্ষিক কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় কোর্স সমাপনান্তে একটি বিদায়ি সনদপত্র দেওয়া হবে। এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণের বিষয়টি বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সমূহ সুপারভাইজারের দায়িত্বে অনুষ্ঠিত হবে। [১২৪]

নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয়:

প্রাথমিক শিক্ষা শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক দায়িত্ব সরকারের উপর এবং জেলা স্কুল বোর্ডকে বিলুপ্ত করা হয় যার স্থলাভিষিক্ত হয় সাব ডিভিশনাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড অব প্রাইমারি এডুকেশন। স্কুল

Dhaka University Institutional Repository

ভবন, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (Social upleft Scheme) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এগুলিকে মডেল স্কুলে উন্নীত করা হবে এবং এর জন্য ব্যয় ধরা হয় রিকারিং ২৫৫০০০০/-রুপি এবং নন রিকারিং ৭৮০০০০০০/- রুপি। শিক্ষকদের বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা সুবিধার জন্য বার্ষিক ১৫০৪৩০০০ রুপি বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার উন্নত তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক থানায় একজন করে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর, ক্লার্ক ও পিয়ন থাকবে। এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হয় ১০১৬৫০০০/- রুপি। E.P.S.E.S.ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ইন্সপেক্টর হিসেবে থাকবেন এবং তার কাজ হবে শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যাপারে সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। এর জন্য ব্যয় ধরা হয় বার্ষিক ১৫০০০/- রুপি। বর্তমানের সংশোধিত প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচী ১৯৬০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।[১২৫]

মাধ্যমিক শিক্ষা

পাঁচ বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল হবে ছয় বৎসর। বর্তমান কলেজ শিক্ষায় ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলুপ্ত হবে এবং ডিগ্রী কোর্স হবে তিন বছরের। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম তিন বৎসর জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী তিন বৎসর সিনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষা দেওয়া হবে। মাধ্যমিক স্কুলকে ৪ স্তরে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হয় যথা- (ক) ১১ ক্লাশ সংবলিত মাধ্যমিক স্কুল (প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) অথবা (খ) ৬ ক্লাশ সংবলিত হাইস্কুল (৬ষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) অথবা (গ) ৮ ক্লাশ সংবলিত জুনিয়র হাইস্কুল (প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) অথবা (ঘ) তিন ক্লাশ সংবলিত সিনিয়র হাইস্কুল (৯ম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিম্নোক্তরূপে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১. জনসংখ্যার ভিত্তিতে (ক) ৫০০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সিনিয়র হাইস্কুল এবং (খ) ২৫০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি জুনিয়র হাইস্কুল।
২. অঞ্চল ভিত্তিক যেমন (ক) ৫ থেকে ৬ মাইল এলাকার মধ্যে একটি সিনিয়র হাইস্কুল। (খ) ৩ থেকে ৪ মাইল এলাকার মধ্যে ১টি জুনিয়র হাইস্কুল থাকবে।
৩. জেলা স্কুল পরিদর্শক, মহকুমা অফিসার এবং সিনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়ে প্রতি জেলায় একটি শিক্ষা সার্ভে কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি স্কুলের সংখ্যা, স্থান, সিনিয়র, জুনিয়র স্কুল নির্ধারণ করবে, যার অনুমোদন দান ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর পরিচালকের হাতে।
৪. রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ম-কানুন দ্বারা সমর্থিত নয় এমন স্কুল থাকতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ভর্তুকিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলের ফিসের হার নিম্নোক্তরূপে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী থাকবে যেমন একাদশ, দশম এবং নবম শ্রেণীর জন্য ৪ রুপি, অষ্টম ও ৭ম শ্রেণীর জন্য ৩ রুপি, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ২ রুপি। তবে শহরাঞ্চলে এই হার একটু বেশি হবে।

৬. মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সহশিক্ষা থাকবে। গার্হস্থ্য অর্থনীতি পাঠের জন্য সকল বালিকা বিদ্যালয় ও সহশিক্ষার সুযোগ থাকবে।

৭. জুনিয়র এবং সিনিয়র বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের জন্য তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে যেমন- এ,বি, সি, এবং শর্তের ভিত্তি নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন না করা পর্যন্ত সিনিয়র হাইস্কুলে প্রবেশ সীমাবদ্ধ থাকবে । সেইসব শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে, যারা প্রদত্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।[১২৬]

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম

১. মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রদেশের শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করবে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।
২. জুনিয়র হাইস্কুল পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থীকে দুইটি ভাষা শিখতে হবে। ইংরেজি এবং রাষ্ট্রভাষা শিখতে হবে। দুইটি ভাষা একই বছরে শিখবে।
৩. মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হবে একমাত্র আবশ্যিক ভাষা।

যেসব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর কারিগরী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবে তাদেরকে ঐচ্ছিক হিসেবে ইংরেজি পড়তে হবে।[১২৭]

পাঠ্যসূচী

জুনিয়র স্কুল কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-
(ক) ভাষা, (খ) সমাজ পাঠ (গ) সাধারণ বিজ্ঞান (ঘ) গণিত (ঙ) মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্ম অথবা নীতি বিজ্ঞানের উপর সাধারণ কোর্স থাকবে। (চ) কলা ও সংগীত (ছ) হস্তশিল্প (জ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (ঝ) মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বীনীয়াত এবং আরবি মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে হবে।

সিনিয়র স্কুল কারিকুলামে থাকবে (ক) মানবিক (খ) বিজ্ঞান (গ) কারিগরি বিষয় (ঘ) বাণিজ্যিক বিষয় (ঙ) কৃষিবিষয় (চ) শিল্প কলা (ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ঝ) ইসলামি শিক্ষা। শিক্ষাবিদ, হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিসে কর্মরত, উপাচার্য, প্রধান শিক্ষক-এর মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষা বিভাগের পরিচালককে নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড স্বাধীন স্বত্তা হিসেবে কাজ করবে।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন জুনিয়র হাইস্কুল পর্যায়

প্রাথমিক বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা কোন ভর্তি পরীক্ষা ব্যতীত জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হবে এবং তাদের কোন বেতন দিতে হবে না। তিন বছর মেয়াদী জুনিয়র হাইস্কুল সমাপনান্তে প্রদেশ ভিত্তিক একটি বিভাগীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৮ম শ্রেণীতে সব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবে। জুনিয়র হাইস্কুল পরীক্ষার ভিত্তিতে ১০০০ জন ছাত্রের বৃত্তি সংরক্ষিত করা হয় এবং এই বৃত্তিকে দুটি গ্রেডে বিভক্ত করা হয়। গ্রেড-১ প্রাপ্তরা মাসিক ৩০ রুপি পাবে এবং গ্রেড-২ প্রাপ্তরা মাসিক ২৫ রুপি পাবে। এছাড়াও মেয়েদের জন্য কিছু বৃত্তি সংরক্ষিত রাখা হয়। জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্তদের পরীক্ষা ছাড়াই সিনিয়র স্কুলে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মেধা, অভিভাবকের ইচ্ছা ও স্কুলের স্থান সংকুলানের সামর্থের উপর ভিত্তি করে ভর্তি হবে। সিনিয়র স্কুল চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দুই গ্রেডে বৃত্তি পাবে যথা গ্রেড-১, ৫০ রুপি এবং গ্রেড-২, ৪০ রুপি।[১২৯]

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক:

শিক্ষা বিভাগ ও অধিদপ্তরের কার্যালয় একই হবে। প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার সাধারণ প্রশাসনের জন্য শিক্ষা পরিচালক সরাসরি দায়ি থাকবেন। তিনিই শিক্ষা সচিব হবেন। অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য অর্থনৈতিক বিভাগে সহকারি সচিব হবেন। পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশনের পদ পরিবর্তিত হয়ে তার পদ হবে শিক্ষা পরিচালক। প্রাদেশিক হেড কোর্য়াটারে বর্তমান পরিচালকের পরিবর্তে শিক্ষা বিভাগের একজন উপ-পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের একজন সহকারি পরিচালক থাকবেন। সংখ্যালঘুদের শিক্ষার জন্য একজন সহকারি পরিচালক থাকবেন। একজন আর্কিটেক্ট থাকবেন যিনি স্কুল ভবনের নক্শা এবং যন্ত্রপাতির বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে। এছাড়াও অধিদপ্তরে কিছু বিশেষ পদ সৃষ্টি করে সেখানে পরিকল্পনা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও কারিগরি এবং বাণিজ্যিক শিক্ষা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করবেন।[১৩০]

উচ্চ শিক্ষা

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৪৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র দুটি। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭১টি কলেজ অথচ একই জনসংখ্যার দেশ যুক্তরাজ্যে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছিল। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৮৫৫টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এগুলির মধ্যে ৭৩২টি ব্যাচেলর ডিগ্রী, ৪১৫টি মাস্টার্স ডিগ্রী, ১৮০টি ডক্টর অব ফিলসফির জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩০০-এর বেশি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এগুলির

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ৩০টির বেশি বিশ্ববিদ্যলয়। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা কম হলেও সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক দিয়েও পূর্ব পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে ছিল যেমন পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০০০ জন, যুক্তরাজ্যে ৮৪০০০ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ২৭২০০০০ জন । পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয় শতকরা ১% এর বেশি নয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে বহুগুণ। যুক্তরাষ্ট্র যেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় করে ২৮৮৩৫০.০০০/-পাউন্ড সেখানে পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ৭২৭৩৩৭৬৬ রুপি মাত্র। [১৩১]

উচ্চ শিক্ষায় সংস্কার কমিশনের সুপারিশ সমূহ

শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে অবলুপ্ত করে স্কুল কোর্সের একবছর এবং ডিগ্রী কোর্সের সাথে এক বছর যুক্ত করা হয়। ডিগ্রী ও অনার্স কোর্স একইভাবে তিন বছর মেয়াদী করা হয়। ঢাকা ও রাজশাহী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আর একটি অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বীমা সুবিধা দেওয়া হয়। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় বিলুপ্তির প্রেক্ষিতে বেশিরভাগ কলেজকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করতে হবে। জেলা সদরে অবস্থিত কলেজগুলিকে প্রথম শ্রেণিভূক্ত করা হবে এবং ব্যাপক সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। সকল ডিগ্রী কলেজে বিজ্ঞান শাখা এবং প্রয়োজনীয় ল্যাব সুবিধা থাকবে। সকল ডিগ্রী কলেজে অনার্স কোর্স চালু হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সরকারি ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষকের বেতনস্কেল বাস্তবসম্মত উপায়ে সরকারি কলেজের অনুরূপ হবে। কলেজ শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ, কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ, খেলার মাঠ, ল্যাব সুবিধা ও টিউটোরিয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা থাকবে। কলেজের ৫০% শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত স্কলারশীপের সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিদপ্তর সম্মিলিত ভাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য জার্নাল প্রকাশ এবং কলেজ শিক্ষকদের প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিতোকরবে। কলেজ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা এবং ইংরেজি প্রচলিত থাকবে। যতদিন দাপ্তরিকভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে কলেজ শিক্ষা রূপান্তরিত হচ্ছে ততদিন মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া যাবে এবং মাতৃভাষার লিখিত বই অনুমোদন করতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি থাকবে ততদিন ইংরেজি সাহিত্য ব্যতীত এই ভাষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। [১৩২]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, স্কুল গৃহ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে।[১৩৫]

শিক্ষক

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্কুলের প্রথম তিনটি শ্রেণীর জন্য মহিলো া শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষকদের বেতনস্কেল জীবনযাত্রার মানের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বীমা, অবসর গ্রহণকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরের সামনে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।[১৩৬]

অর্থ সংস্থান

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও অর্থের পরিমাণ এত বেশি যে, এই সংস্থানের জন্য সরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণকে জমি, গৃহ, আসবাবপত্র ও শিক্ষাদানের উপকরণাদি সরবরাহ এবং শিক্ষকদের জন্য গৃহ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সরকার বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত অঞ্চলের স্থানীয় জনসাধাণরকে আর্থিক সাহায্য দান করবে। পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য পশ্চিম প্যাকিস্তানে জেলা ভিত্তিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে মহকুমা ভিত্তিতে একটি বিশেষ কর ধার্যের মাধ্যমে শতকরা ৫০% অর্থ সংস্থান করতে হবে। প্রাদেশিক সরকারের সাধারণ রাজস্ব আয় হতে অবশিষ্ট শতকরা ৫০% অর্থের সংস্থান করতে হবে। জেলা ও মহকুমা সমূহের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন বিবেচনা এবং পশ্চাদপদ ও দরিদ্র অঞ্চল সমূহের প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযোগ্য গুরুত্বদানের পর প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার জন্য আর্থিক মঞ্জুরি বা বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।[১৩৭]

পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ব্যবস্থা স্থানীয় কমিটি বা সংস্থা সমূহের উপর ন্যস্ত রাখা উচিত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জেলা ভিত্তিতে ও পূর্ব পাকিস্তানে মহকুমা ভিত্তিতে প্রাদেশিক শিক্ষা কমিটি সমুহের মাধ্যমে ইহার পরিচালন ব্যবস্থা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রত্যেক কমিটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে মহকুমার অফিসার কিংবা মনোনীত কোন প্রতিনিধি চেয়ারম্যান থাকবে। ইহা ছাড়া কমিটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জেলা অফিসার ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে মহকুমা শিক্ষা অফিসারসহ আরও চারজন সদস্য থাকবেন। জেলা বা মহকুমাকে দশ হতে পনের হাজার লোকের বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিটে একটি আঞ্চলিক বা ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি থাকবে। ডেপুটি কমিশনার বা মহকুমা অফিসার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। শিক্ষকদের বদলি করার ক্ষমতার অনুরূপ কিছু ক্ষমতা এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ সমূহের দায়িত্ব হলো পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং শিক্ষকদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করা। [১৩৮]

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বোঝান হয় কিন্তু ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর যথা– ষষ্ঠ থেকে অষ্টম (অন্তবর্তী), নবম হতে দশম শ্রেণী (মাধ্যমিক), একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক)।

পাঠ্যক্রম

মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম দুটি নীতির উপর নির্ভর করে তৈরি করতে হবে। প্রথমত: উহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি বর্ধিষ্ণু সমাজে যোগ্য ও সুষ্ঠু জীবন-যাপন উপযোগী জ্ঞান আহরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল বিষয়সমূহ শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে। দ্বিতীয়ত: উহাতে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্ররা জীবনের সুনির্দিষ্ট বৃত্তি ও জীবিকার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পাঠদানের সময় অনুসারে বিষয়গুলির গুরুত্বের তারতম্য করা হবে এবং বিভিন্ন বৎসরের বিভিন্ন স্তরে বিষয়গুলি পাঠ শুরু ও শেষ করতে হবে। হাইস্কুল শিক্ষা সমাপন কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী মোটামুটি দশ হতে বারটি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে। জাতীয় ভাষা, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হবে। সাহিত্যের চেয়ে একটি কার্যকরী বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়াতে হবে। ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পরবর্তী স্তরে ইচ্ছাধীন হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হস্তচালিত যন্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে। মাধ্যমিক স্কুলে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং ইহার মধ্যে ধাতব, শিল্প, কাঠ শিল্প, কৃষি বাগান তৈরি, টাইপ রাইটিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কারু ও নকসা শিল্প থাকবে। [১৩৯]

অর্থসংস্থান

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তের বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও ছাত্র বেতন, সরকারি সাহায্য ও বেসরকারি অনুদান পূর্বের ন্যায়ই ছিল। ফলে যথাযোগ্য শিক্ষক ও সাজ-সরঞ্জামের অভাবে শিক্ষার মান নীচে নেমে যায়। এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার অবসানের

E:\...\...05-402-2011\1-5 doc 13-411-12 doc

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তিনটি উপায়ে স্কুলের আয়বৃদ্ধি করতে হবে। (ক) ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, (খ) পরিচালক মণ্ডলীর দেয়া চাঁদা এবং (গ) সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে। আয়ের অনুপাত হতে হবে যথা- ছাত্রদের বেতন শতকরা ষাট ভাগ, পরিচালক মণ্ডলীর চাঁদা বিশ ভাগ এবং বাকী বিশ ভাগ সরকারি সাহায্য থেকে। শর্ত থাকে যে, যেসব স্কুলে প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষক, গৃহ ও সাজ সরঞ্জামসহ বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে শুধু সেইসব স্কুলের মোট ব্যয়ের শতকরা বিশ ভাগ সরকারি সাহায্য পাবে। শিক্ষক ও সরঞ্জামাদি যেসব স্কুলে উন্নতমানের সেগুলিকে বিশেষ স্কুল বলে গণ্য করা হবে এবং সেই ভিত্তিতেই সরকারি সাহায্য পাবে। আবাসিক স্কুল সমূহে ছাত্রবেতন হ্রাস করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। বেসরকারি স্কুলগুলির পরিচালনার ব্যাপারে পরিচালক মণ্ডলীর বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা হতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণকে অর্থ প্রদানে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপর স্কুলের জন্য ভূমি সংরক্ষণ ও গৃহ নির্মাণ বাধ্যতামূলক করে উক্ত ব্যয় উন্নয়ন খাত হতে বরাদ্দের নির্দেশ সম্বলিত প্রয়োজনীয় সরকারি আইন প্রণয়ন করতে হবে। জনবহুল এলাকায় আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ স্কুলগৃহ সুসজ্জিত ও নুতন স্কুলগৃহ নির্মাণ করবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে বিশেষ কর ধার্য করবে।[১৪০]

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে। বোর্ডের কর্তৃত্বের আওতা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আওতার অনুরূপ হবে। নতুন বোর্ড স্থাপন এবং করাচী ও ঢাকাস্থ বোর্ডের সম্প্রসারণ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উহার আওতাধীন করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের সর্বশেষ কর্তৃত্ব একজন নিয়ন্ত্রণকর্তার উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রাদেশিক গভর্নর এবং ফেডারেল এলাকার ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী হবেন নিয়ন্ত্রণকর্তা। একজন চেয়ারম্যানসহ দশ হতে বারজন সদস্য সমবায়ে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে বোর্ডগুলি সংগঠন করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকর্তা কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান বোর্ডের সার্বক্ষণিক অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হবে। বোর্ডে শিক্ষা দফতর, স্কুল কলেজ এবং শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহশীল এক বা দুইজন স্থানীয় প্রতিনিধি থাকবেন শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য।[১৪১]

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষায় তিনটি পর্যায় প্রচলিত। এগুলি হচ্ছে-স্নাতক পূর্ব পর্যায় (Under Graduate), প্রাথমিক স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (Early Post Graduate), এবং প্রান্তিক স্নাতকোত্তর (Advanced Post Graduate) পর্যায়। প্রথমোক্ত পর্যায়ে ছাত্র শিক্ষার একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ে সে এই ক্ষেত্রে অংশ বিশেষের উপর অধিকার লাভ করে এবং তৃতীয়োক্ত পর্যায়ে স্বাধীন

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন ও মৌখিক গবেষণার মাধ্যমে সে একটি নতুন অগ্রবর্তী জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করবে। এই ভাবে ছাত্র স্নাতক ডিগ্রী লাভের জন্য কাজ শুরু করে বিশেষজ্ঞ মহাস্নাতক ডিগ্রী লাভের জন্য এগিয়ে যায় এবং সুদক্ষ গবেষক নিজের বিদ্যাভিসারী সাধনার ফলে ডক্টর (আচার্য) ডিগ্রী লাভ করে। [১৪২]

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হতে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে স্থানান্তর করা এবং যে অঞ্চলে এইরূপ বোর্ড নাই সেখানে অবিলম্বে বোর্ড স্থাপন করতে হবে। কলা ও বিজ্ঞানে ব্যাচেলর্স ডিগ্রীর জন্য দুই বৎসরের কোর্সের পরিবর্তে তিন বৎসরের কোর্স হবে। মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়নের কোর্স দুই বৎসর মেয়াদী হবে। ডক্টরস ডিগ্রীর জন্য ন্যূনতম পক্ষে দুই বৎসরের কোর্স থাকতে হবে এবং কেবলমাত্র তাদেরকে এই কোর্সে ভর্তি করা উচিত যারা মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। [১৪৩]

অধ্যয়নের বিষয়

ইংরেজি কোর্সসমূহ সাহিত্য ধর্মীয় বিধায় এইগুলির সাহিত্য প্রকৃতি পরিবর্তন করে ব্যবহারিক করে তুলতে হবে। তবে যেসব ছাত্র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে অনুশীলন করে তাদের জন্য ইংরেজি কোর্স পরিবর্তন করার প্রয়োজন নাই। জাতীয় ভাষা শিক্ষালাভ এবং এগুলির বিশেষ অনুশীলন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রধান প্রধান সকল আধুনিক ভাষা অধ্যয়নের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এই ব্যাপারে ফার্সি ও আরবি ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ফার্সি ও আরবিভাষার বিশেষ তাৎপর্য থাকায় কথ্য ও প্রচলিত ভাষা হিসেবে এই দুটি ভাষা শিক্ষাদান করা উচিত। উচ্চ পর্যায়ের ভাষাবিদগণকে বিশেষ ট্রেনিংদানের জন্য একটি ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ স্থাপন করতে হবে। ইহা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের প্রয়োজন মেটাবে। এছাড়াও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শাসননীতি, ব্যবসা পরিচালনা, সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজকর্মের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামি বিষয় সমূহের উন্নয়ন ও সংহতি সাধন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে পাশ কোর্স ও অনার্স কোর্স নামক দুই ধরণের কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। সাধরণত যেসব ছাত্র স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে প্রবেশ করার যোগ্যতা নাই তাদের জন্য পাশ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশ কোর্সে তিনটি বিষয়ের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি শিক্ষা বৎসরের শেষে একটি করে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। অনার্স কোর্সে একটি মুখ্য বিষয় এবং অথবা দুটি গৌণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশ কোর্স ও অনার্স কোর্স উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্রদের জন্য মানবতাবাদী বিষয় এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয় ও কলা বিভাগীয় ছাত্রদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং সকল ছাত্রের জন্য ইংরেজি ভাষার সাধারণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [১৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র কল্যাণ ও শৃঙ্খলা

ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দান এবং পথ প্রদর্শন করার জন্য একটি সুসংহতোপরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিক্ষক একটি ক্ষুদ্র ছাত্রদলের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ছাত্রগণ যাতে সঠিক পথে চলতে পারে এই উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, নাটক, বিতর্ক, সংগীত এবং গৃহাভ্যন্তরে খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র স্থাপন এবং বিরতির সময় ও ছুটির পরে অধ্যয়নের জন্য পাঠাগারে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা থাকবে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বল্পমূল্যে খাবার গ্রহণ করার জন্য "ক্যাফেটেরিয়া'র ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহের পবিত্রতা বজায় রাখা উচিত। এগুলিকে দলীয় রাজনীতিবিদদের ক্রীড়াস্থল হতে দেয়া যাবে না। ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অবাঞ্চনীয় এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা শিক্ষা কর্মসূচী বিরোধী দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা ছাত্রদের অনুচিত। [১৪৫]

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন

প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অথবা কোর্ট ১৫০ হতে ২০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদসহ বহু সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য থাকেন। ফলে সিনেট শীঘ্রই রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং সিনেট তাড়াতাড়ি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করে একাডেমিক কাউন্সিলের সম্প্রসারণ করতে হবে এবং ইহাতে কেবলমাত্র শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত না করে বাহির থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী মূল্যবান সহায়তা দিতে পারে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এতে সিনেট বা কোর্টের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। যেহেতু শিক্ষাদান এবং গবেষণামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য তাই একাডেমিক কাউন্সিল ও বোর্ড অব স্ট্যডিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রচলিত আইনে চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা সঠিকভাবে নির্ধারিত নয় বিধায় তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে। চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ক্ষুদ্রাকার সিন্ডিকেট গঠন করা হবে এবং এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন। কতকগুলি বিশেষ কমিটি গঠন করে উহাদের উপর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষকদের কাজের মূল্য নিরূপনের ভার দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিচালন বিভাগসমূহ পৃথক করা এবং এই দুই বিভাগের কর্তৃত্ব দুইজন পৃথক অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকবে। তাহারা সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলরের অধীনে কাজ করবেন। উচ্চ শিক্ষাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে একটি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন গঠন করতে হবে। তবে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য শিক্ষা দফতর কর্তৃক নিযুক্ত একটি এড্হক অ্যাডভাইজারি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই কমিটিতে সমস্ত ভাইসচ্যান্সেলর থাকবেন এবং একদল বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ইহার কাজ পরিচালিত হবে।[১৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ সম্পর্কিত কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট তাদের রিপোর্ট জমা দেন। এই রিপোর্টের সুপারিশমালা ১৯৬০ সালের ৬ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার অনুমোদন করে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার শুরু করে। অন্যদিকে কমিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে অধ্যাদেশ আকারে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। এক বছরের মধ্যে ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে সংস্কার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী ছাত্ররা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সংস্কার কমিশনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে উঠে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে হরতাল পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন জোরদার হয়। এই আন্দোলন ক্রমে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সরকার বাধ্য হয়ে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স বাতিল করে। কিন্তু ছাত্র আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিসেস ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করে। ঢাকা, করাচী, লাহোর ও পেশোয়ারে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৪ সালের ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ছাত্র-পুলিশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দেশের এই সংকটময় মূহুর্তে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের সমস্যা নিরসনের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করেন।[১৪৭]

ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ সম্পর্কিত কমিশন গঠন

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং এফ ৭-৩/৬৪-ই,ই-১, তারিখ; ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ সালে ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কিত শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের সদস্যবৃন্দ হলেন–

ক্র: নং	নাম	পদবী
১.	মি. জাস্টিস হামুদুর রহমান, বিচারক, সুপ্রীম কোর্ট, পাকিস্তান	চেয়ারম্যান
২.	মি. জাস্টিস এস.এ. মাহমুদ, বিচারক, হাই কোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান	সদস্য
৩.	কাজী আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
৪.	মি. নাসির আহমদ, চেয়ারম্যান, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের কর্মপরিধি

১. বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা।

২. শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে তা খতিয়ে দেখা এবং প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে থেকে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য যেসব চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা আছে তার অপর্যাপ্ততা খতিয়ে দেখতে হবে এবং সামর্থের আওতায় যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. ছাত্র জীবনকে ব্যহতোকরে এমনসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।[১৪৮]

কমিশন ১৯৬৫ সালের ৮ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করে। এই সময়ে কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। মোট ২২৭ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। কমিশন সিলেট এবং চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেনি। কারণ ওই সমস্ত জায়গায় ছাত্ররা কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কমিশন ২৩ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই ১৯৬৫ পর্যন্ত চট্টগ্রামে ৭৮ জনের স্বাক্ষাৎকার এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। কমিশন ২৮ জুলাই ঢাকায় ফিরে আসে এবং ২৯ জুলাই ও ৩০ জুলাই ১৯৬৫ সালে শারীরিক শিক্ষা কলেজ, সমাজকর্ম ও আর্ট কলেজ পরিদর্শন করে এবং কলেজের প্রিন্সিপাল ও স্টাফদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। কমিশন ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট সিলেট পরিদর্শন করে এবং সেখানে ৮১ জনকে সাক্ষাৎকার ও ৪টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। এরই ভিত্তিতে কমিশন সুপারিশ পেশ করে।[১৪৯]

কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ

প্রাথমিক শিক্ষা

সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হলেও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় হয়েছে বলে কমিশন মনে করে না। ট্রেনিংহীন নন-মেট্রিক ব্যক্তিদের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করা উচিত নয়। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার সমান হওয়া উচিত। ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রবেশিকা পাশ শিক্ষকদের একশত টাকা ও ট্রেনিংহীন প্রবেশিকা পাশ শিক্ষকদের পঁচাত্তর টাকার কম বেতন হওয়া উচিত নয়। প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন, খ্রিষ্টান মিশনারী ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল বিলোপের দাবি যুক্তিসংগত নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আর কোন সুপিরিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয় এবং এরূপ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু রয়েছে তাতে সকল উপযুক্ত ছাত্রের

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৬৫-৭০) পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ১০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ হাজার নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক কৃষি কোর্স প্রবর্তনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা ত্বরান্বিত করা উচিত। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরবি বর্ণমালা ও কায়দা পড়ান শুরু করা উচিত। এই পর্যায়ে শিশুদের নামাজে সাধারণত ব্যবহার হয় এমন ছোট ছোট সূরা ও কালেমা মুখস্থ করা উচিত এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের পরিচয় দান করা উচিত। পবিত্র কোরআন হতে গল্প, উপকথা এবং মহানবীর জীবন ও মুসলিম মহামানবদের জীবনী আলোচনার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা উচিত। সত্যবাদিতা, সততা ও ন্যায়নীতির মনোভাব গড়ে তোলার জন্য শিশুদের সময় সময় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং শিশুদের জাতীয় সঙ্গীত, কিছু সূরা ও ইকবাল, নজরুল ইসলামের ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করা উচিত। প্রথম দুই বৎসরে এই সব ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিগত শিক্ষা অর্থপূর্ণ গল্প ও কিংবদন্তীর মাধ্যমে প্রদান করা উচিত।[১৫০]

মাধ্যমিক পর্যায়

পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কোর্স প্রবর্তনের প্রতি আরও মনোযোগ দেয়া উচিত। প্রতি মহকুমায় অন্তত একটি করে উন্নত মালটি লেটারাল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের বিবেচনা করা উচিত। এই স্কুলটি হবে অংশত আবাসিক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যপকভিত্তিক। এখানে সম্ভাব্য সকল প্রকার বিষয় গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। মালটি লেটারাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞান, গণিত ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতা দেয়া যেতে পারে। কারিগরি বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে। ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। যথাযথ সিলেবাস প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। সরকারি কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের ছাত্র বেতন হ্রাস করার কোন যুক্তি নাই। শিক্ষাক্ষেত্র হতে ব্যবসায়িক মনোভাব সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে হবে। শিক্ষা ডিরেক্টরকে বেসরকারি স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র বেতনের তারতম্য হ্রাস করতে হবে। বেসরকারি স্কুলের সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ উহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে দিতে হবে। কোন স্কুলে সরকারি সাহায্য দানের প্রশ্নে এরূপ শর্ত থাকতে হবে যেন উহার শিক্ষকগণ সরকারি স্কুলের সাথে তুলনীয় বেতন ও অন্যান্য চাকুরির সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে স্টাইপেন্ড ও স্কলারশীপের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ছেলেমেয়েকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। প্রতি মহকুমায় একটি হাইস্কুল থাকতে হবে। যেখানে বিভিন্নমুখী কোর্স ও পর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে। অষ্টম শ্রেণীর বেশি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব নয় কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে এই পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক করতে হবে। অষ্টম শ্রেণীতে একটি বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।[১৫১]

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়

চলমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা উচিত নয়। কিন্তু এই সমস্ত কলেজে বিভিন্নমুখী কারিকুলামের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন নব্র প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সেকশন থাকা উচিত নয়। ১৯৭৫ সালের মধ্যে মহকুমা পর্যায়ে পুরুষদের কলেজ ও জেলা পর্যায়ে মেয়েদের কলেজের বিভক্তিকরণ সমাপ্ত করা উচিত। এই বিভক্তিকরণ কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য প্রতি বৎসর দুইটি বেসরকারি কলেজকে সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। কলেজের ছাত্রসংখ্যা সর্বোচ্চ ১৫শতের বেশি হওয়া উচিত নয়। কয়েকটি বড় বড় শহরে ছাত্রদের কেন্দ্রীয়করণ রোধের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে পর্যাপ্ত উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ ও আবাসিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের ডিগ্রী কলেজের সমপর্যায়ে শিক্ষকদের সমান যোগ্যতা পদবী ও বেতনের হার থাকতে হবে এবং অধ্যক্ষের বেতনের হার বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারদের সমান হতে হবে।[১৫২]

ডিগ্রী কলেজ

ইন্টারমিডিয়েট সেকশনকে পৃথকীকরণের স্কীম গৃহীত হলে বর্তমানে চালু ডিগ্রী কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত হবে। ছাত্র সংসদ তহবিলের অর্থ অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করার রীতিকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে। সরকারি কলেজ পরিচালনার জন্য প্রদত্ত সাহায্য ইহার অনুমোদিত প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে। বেসরকারি কলেজে সাহায্য দানের ব্যাপারে অনুমোদিত প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এই প্রশ্নে সর্বত্র একই নীতি অনুসরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না করলে কোন কলেজকে সান্ধ্য ক্লাশ পরিচালনার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। শিক্ষাগত দিক দিয়ে সান্ধ্য ক্লাশ খুব উপকারী বা বাঞ্ছনীয় নয় তবে বহিরাগত ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাশরূপে সান্ধ্য ক্লাশ চলতে পারে। প্রতি জেলায় পুরুষদের জন্য একটি সরকারি ডিগ্রী কলেজ থাকা আবশ্যক। সরকারি কলেজের প্রদত্ত বর্তমান সুযোগ সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা উচিত। সকল বেসরকারি কলেজের ছাত্র বেতনের হার সমান হওয়া উচিত এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সকল বেসরকারি কলেজকে ছাত্রদের নিকট হতে নির্দিষ্ট হারে বেতন আদায় ও এই তহবিলের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। কোন সেকশন বা ক্লাশে ৫০ জনের বেশি ছাত্র থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে প্রাকটিক্যাল গ্রুপের ছাত্র সংখ্যা ৩০ জনের অধিক হবে না। ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সুবিধা আরও উন্নত করতে হবে এবং আরও অধিক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের সাথে ছাত্রাবাস সংশ্লিষ্ট সেই প্রতিষ্ঠানকে ছাত্রাবাস পরিচ্ছন্ন রাখা ও ছাত্রাবাসের ডাইনিং হলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারিদের ব্যবস্থা করতে হেবে। শিশু শিক্ষা হতে শুরু করে স্নাতক পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ধর্মীয়, নৈতিক ও আদর্শগত বিষয়কে শিক্ষার অবিভাজ্য ও বাধ্যতামূলক অংশে পরিণত করতে হবে। ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় ও আদর্শগত শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত একটি স্কীম প্রণয়ন করতে হবে এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই স্কীমের অনুসরণ করতে হবে। অমুসলিমদের জন্য অনুরূপ একটি উদার সংশোধিত স্কীম প্রণয়ন করতে হবে। প্রচলিত সিলেবাস ও শিক্ষা কোর্স পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবে। প্রয়োজন হলে এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও জাতীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সিলেবাস ও কোর্স পুনর্বিন্যাস করবে। সাধারণভাবে কোন একটি শিক্ষা কোর্স বা পাঠ্যপুস্তককে অন্তত ৩ বৎসর অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং এক বৎসরের অগ্রিম নোটিশ ব্যতীত উহা পরিবর্তন করা চলবে না। দক্ষতা, শৃঙ্খলা অর্ডিন্যান্সের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অনভিপ্রেত প্রভাবে দ্ব্যার্থহীন সংজ্ঞা থাকতে হবে। শিক্ষকদের পেশাগত আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা গঠন করতে হবে এবং এইরূপ প্রণীত বিধি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের এইরূপ বাধ্যতামূলক নৈতিক দায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিত যে, তার দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমন বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে যাতে সত্যিকারে অভিযোগ অসার প্রতিপন্ন হয়। কোন স্বল্পায়তন এলাকায় ৫ বা ততোধিক উচ্চমানের কলেজ থাকলে এইগুলির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।[১৫৩]

বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ শিক্ষায় সকল প্রকার অপচয়মূলক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে চ্যান্সেলরগণকে পরামর্শদানের জন্য হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান ও পাঁচজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে সদস্য করে উভয় প্রদেশে একটি করে কমিটি গঠন করতে হবে। মেধাবী তরুণদের গবেষণামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি ও শিক্ষকতার ট্রেনিংদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কিছু কিছু ফেলোশীপ প্রবর্তন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে অবশ্যই নির্বাচনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং এরূপ শিক্ষায় যারা লাভবান হবে কেবলমাত্র তাদের ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভর্তি কমিটি থাকতে হবে এবং যথাযথ শিক্ষাকোর্স বেছে নিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা

Dhaka University Institutional Repository

কলেজে অধ্যয়ন করতে পারবে না এবং একাডেমিক কাউন্সিলের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কেহ দ্বিতীয় কোন স্নাতকোত্তর কোর্সে পুনরায় ভর্তি হতে পারবে না। স্কলারশীপ স্টাইপেন্ডের বিশেষ ফান্ড অনুযায়ী ইহা বন্টনের ব্যাপারে সুষম উদার স্কীম গ্রহণ করতে হবে। মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষাকোর্স ও পাঠ্যপুস্তককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বাধুনিক অগ্রগতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের কমিটি কর্তৃক অপর একটি কমিটি গঠন করতে হবে যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে একই মান সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পুনর্বিবেচনা করা উচিত। [১৫৪]

পরীক্ষা

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে এবং এই সব পরীক্ষার সামগ্রিক ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দিতে হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ইহা ২ ভাগে বিভক্ত হয় এবং এক অংশে বিশেষভাবে এমনসব প্রশ্ন সন্নিবেশ করতে হবে যাতে ছাত্রদের গুছিয়ে লেখা ও সমালোচনা করার শক্তি যাচাই করা যায়। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পর প্রতি শিক্ষা বৎসরের শেষে বাধ্যতামূলক পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যেন যে প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ঐ কেন্দ্রের ইনভিজিলেটর বা সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে। [১৫৫]

শিক্ষার মাধ্যম

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র দাবি করলে জাতীয় ভাষার যে কোন একটির মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী (পাস) পর্যায়ে কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষাদানের প্রশ্নে ছাত্রদের যে কোন একটি ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় ভাষা যার মাধ্যম নয় তাকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষা দিতে হবে। [১৫৬]

ছাত্র সংগঠন

সাধারণ ছাত্রদের কর্মতৎপরতা শিক্ষামূলক হওয়া উচিত এবং ইহা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। দাবি-দাওয়া আদায় ও ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ দরকষাকষির প্রবণতা হতে ছাত্র সংগঠনকে বিরত থাকতে হবে। একাডেমিক সম্পর্ক সাধারণ কর্মচারিদের সম্পর্কের মতো নয়। দাবি যত ন্যায্যই হউক

Dhaka University Institutional Repository

উহা আদায়ের জন্য ধর্মঘট পালনকে ন্যায্য মাধ্যম বলে গণ্য করা যায় না। দেশে ছাত্র সংসদগুলির মধ্যে কাঠামোগত বহু পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান ছাত্র সংসদগুলির পরিবর্তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ছাড়াও একই ধরণের কর্মতৎপরতা বিশিষ্ট এতগুলি প্রতিযোগিতামূলক হলো ইউনিয়নের ব্যবস্থা রাখা অপ্রয়োজনীয়। ইহাতে অনেক সময়ের অপচয় ঘটে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ মারাত্মক শৃঙ্খলা সমস্যার সৃষ্টি করে। হলো কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়। হলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ আবাসিক ছাত্রদের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের ছাত্র সংগঠনগুলি পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্যকরী করার প্রশ্ন বিবেচনা করবে। যেখানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপই ছাত্র সংগঠনের মূল লক্ষ্য সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কোন সংগঠনের কোন স্থান থাকতে পারে না। [১৫৭]

রাজনীতি

রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছায় ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ হতে বিরত রাখা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে ছাত্রগণ যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অপ্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সাথে দেন দরবার না করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্ররা যাতে যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে সেই জন্য প্রত্যেকের উচিত তাদের সকল প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত করা। ছাত্রদের সাথে রাজনীতিবিদদের যোগাযোগ রক্ষাকে অপরাধ বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন তা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা কম। সংবাদপত্রকে ছাত্রদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ ও ছাত্রদের পক্ষে অন্যান্য প্রচারণা হতে বিরত থাকতে হবে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ যোগ্যতা সম্পন্ন আইনজীবী দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। যদি দেখা যায় যে, প্রমাণাদির ভিত্তি দূর্বল তাহলে তাদের শাস্তি ও শৃঙ্খলা নিদর্শন স্বরূপ এই সব মামলা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আর যদি স্বাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বিচারকার্য অব্যাহতোরাখা দরকার তাহলে দীর্ঘসূত্রিতা না করে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা উচিত। [১৫৮]

পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব, ১৯৬৯

পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খানের নির্দেশনায় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই ভাগে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রথমভাগে প্রচলিত শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করে তা পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

মনে করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। তাই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কমিটি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টির নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন-

১. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।

২. জাতীয় নীতিমালা জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মাঝে ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক মান আশাতীতভাবে নিম্নগামী এবং

৫. সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[১৫৯]

নতুন শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য

নতুন শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত-

১. ইসলামের ভাবধারার উপর নির্ভর করে সাধারণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

২. একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা।

৩. বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা।

৪. দেশের উৎকৃষ্ট মেধাবীদের শিক্ষা পেশায় আকৃষ্ট করা।

৫. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা।[১৬০]

কমিটির কার্যপরিধি

প্রচলিত শিক্ষানীতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করতঃ এর ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সুপারিশ পেশ করা হয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানত তিনটি মূল প্রতিবন্ধকতার জন্য সুষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে না উঠায় এই শিক্ষানীতি প্রচলিত বাঁধাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে এগুলো দূর করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত উপায় বের করার সুপারিশ করবে যাতে দেশের জাতীয় অখণ্ডতা, ঐকমত্য রক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়।

কাঠামোগত পরিবর্তনের সুপারিশ

১. মাদ্রাসাগুলিকে সাধারণ স্কুলের সাথে একীভূত করতে হবে তবে ইসলামি ভাবধারা ও চাহিদার নিরিখেই হতে হবে।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একীভূত করে Elementary স্কুলে রূপান্তর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করে ব্যাপকভাবে কারিগরী ও ভকেশনাল ট্রেনিং-এর আওতায় আনতে হবে।
৪. শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
৫. শিক্ষক বেতন ভাতা বাড়াতে হবে এবং এই বেতন কাঠামো অন্যান্য চাকুরি ও পেশায় নিয়োজিতদের বেতনের সমকক্ষ হয়।
৬. শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন বেতন স্কেল দিতে হবে এবং শিক্ষকদের ভিন্ন যোগ্যতা অভিজ্ঞতা এবং সামর্থ অনুযায়ী হবে।
৭. সাধারণ সরকারি চাকরিজীবীদের মতো শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে বিরতি দিতে হবে।
৮. বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং প্রদেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষকদের তাদের সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজের পরিচালনা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। সকল প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের শূন্যপদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং চূড়ান্ত নির্বাচন দিবে কর্তৃপক্ষ। সকল শিক্ষকের নিয়োগ দেবে গভর্নিং বডি। এই গভর্নিং বডি শিক্ষকদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি এবং অনুমোদিত গ্রান্ট এর বিপরীতে ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। স্কুল পরিদর্শকদের স্কুলের উপর কর্তৃত্ব বন্ধ করতে হবে। পরিদর্শন কর্মকর্তা মাঝে মাঝে স্কুল পরিদর্শন শেষে জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে।[১৬১]

শিক্ষার মাধ্যম

স্কুল পর্যায়ে সকল শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হবে উর্দু। ষষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে হবে। পাকিস্তানের উভয় অংশে ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করতে হবে। শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মাধ্যম হবে ইংরেজি। ১৯৭৪ সাল নাগাদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। ১৯৭৫ সাল থেকে কেন্দ্রেও এই দাপ্তরিক ভাষা থাকবে।[১৬২]

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে পাকিস্তানে মোট ৫০০টি কলেজ যার পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫টি। পূর্ব পাকিস্তানে ৯০% কলেজ বেসরকারি অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি বেসরকারি কলেজের সংখ্যা অনুপাত ৫০:৫০। উভয় পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২টি। সাধারণ প্রকৃতির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, হায়দ্রাবাদ, পেশোয়ার এবং লাহোরে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ প্রকৃতির তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে অবস্থিত। সমগ্র পাকিস্তানের দুইটি

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঢাকায় অন্যটি ল্যাহোরে। দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ময়মনসিংহে এবং অপরটি লয়ালপুরে। দ্বাদশ বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামাবাদে অবস্থিত এটি স্নাতকোত্তর পাঠদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন চলমান থাকবে এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি যে উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে তা বিলুপ্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সরকারি ফান্ড বিলুপ্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজন নিশ্চিত করবে। নিয়ন্ত্রিত ফান্ড থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ অনুমোদন করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ অথবা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এই ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দিতে পারবে।[১৬৩]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরিকমিশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯

কমিশনের সুপারিশের পরিশিষ্টে বলা হয় প্রাদেশিক সরকারের দাপ্তরিক গেজেট প্রকাশের তারিখ থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিশন হবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে। এই কমিশন হবে স্বতন্ত্র এবং একই সীলমোহর থাকবে এবং একই নামে কাজ করবে।[১৬৪]

বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট-১৯৬৯

১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করার জন্য একটি খসড়াবিল পাশ করা হয় এবং এটি পরিবর্তন করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং xxiv-১৯৬২, xxx ১৯৬২,১৯৬৬, ১,১৯৬৬-এর ৫.১৯৬৭-এর ৩ এর স্থলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স কার্যকর হবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে সকল উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু, মূল্যবোধ ও আদর্শের সূতিকাগার হয়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়ে যাহা সঠিক মনে করবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিতে পারবে, গবেষণার জন্য নিয়মাবলি তৈরি ও যে কোন অগ্রগতির বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারবে। কলেজের অনুমোদন দান এবং তা বাতিল করতে পারবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠান, মঞ্জুরি প্রদান, সনদ প্রদান, ডিপ্লোমা, স্নাতক প্রভৃতির সনদ প্রদান করবে। প্রতি তিনবছরের জন্য একজন খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি উপাচার্য নিযুক্ত হবে। তিনি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা, সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা। উপাচার্য হবে Ex-Officeo সদস্য এবং সিন্ডিকেটের এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোন জরুরি অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার নোটিশে যে কোন তাৎক্ষণিক সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক নিয়োগ এবং কারো বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।[১৬৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও এটি মূলত সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেশির ভাগই ছিলেন প্রশিক্ষণবিহীন এবং স্বল্প বেতনের কারণে যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় আসতেন না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতো কার্যনির্বাহক কর্মকর্তা, শিক্ষা বিভাগ এবং পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বেশিরভাগ ছিলেন প্রশিক্ষণবিহীন। তবে আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি।

তথ্যসূত্র

১. E.F. Keay, *Indian Education in Ancient and Later times; An Enquiry into its origin, Development and Ideals,* New Delhi, 1938, p.3.

২. John Mathai, *Village Government in British India*, p.80.

৩. কল্যাণী কার্লেকর, *ভারতের শিক্ষা জিজ্ঞাসা*, কলকাতা-মাঘ ১৩৫১, পৃ. ১২০

৪. অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, *আমাদের শিক্ষা সমস্যা*, কলকাতা: শিক্ষা প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃ.৫

৫. *ঐ*, পৃ. ৬

৬. কল্যাণী কার্লেকর, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭-১৮

৭. অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬

৮. বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানচর্চার একটি ধারা চলে আসছিল এবং ভারতীয় অধিবাসীদের উপর এর স্থায়ী এবং কার্যকর প্রভাব ছিল। Tomas, F.W., *The History and Prospects of British Education in India*, Cambridge 1981, P.1. Sharp, H. Selections from Educational Records (1781-1839)Part-1. Calcutta, Superintendent Government Printing 1920. pp.1-2.অনাথ নাথ বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, কলকাতা, ১৩৫১, পৃ.৫.

৯. Education Commission: *Report by the Bengal Provincial Committee and with Evidence taken before the committee Memorial Addressed to the Education*

Dhaka University Institutional Repository

Commission Calcutta. 1884. p. 69. M. Mohar Ali. *History of the Muslims of Bengal*. Vol. IB. Riyadh 1985.p. 827.

১০. M. Mohar Ali, *History of the Muslims*, p. 838. E.F. Keay, *Indian Education in Ancient and Later Times*, New Delhi, 1938, pp.178-180.

১১. Long. J. Adams Report. pp.40-42

১২. Education commission: *Report by the Bengle Provincial Committee*. 1884, P.3, Syed Mahmod, *A History of English Education in Indian* (1781 to 1893) Aligarh, 1895, p.2.

১৩. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Reprinted from the First Edition, Lahore.1964. p. 143.

১৪. Long. J. Adams Report. pp.210-211. Abdul Karim, *Mahammadan Eduation in Bengla*, Calcutta, 1900, pp. 6-7.

১৫. Long. J. Adams Report. pp.102-103

১৬. Ibid, pp.18-19

১৭. মোঃ আজহার আলী, *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ.১৩

১৮. Long. J. Adams Reports. p.212

১৯. Syed Mahmod, *A History of Englsih Education* p.2

২০. ড. বসন্ত কুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা, স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ.৭

২১. শহীদুল ইসলাম, 'আমাদের শিক্ষানীতির অতীত ও বর্তমান' বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ২৫,২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও পরিকল্পনা সেমিনারে গঠিত প্রবন্ধমালা সংকলন, পৃ.৮৭

২২. Buchanan. C. *The College of Fort William in Bengal*. London, 1805, p. 239.

২৩. B.D. Bhatt. J.C. Aggarwal, *Education Documents in India* (1813-1968), New Delhi.1969. p.1

২৪. Ibid, p.2

২৫. Ibid, p.2

২৬. Ibid, p.3

২৭. জাহেদা আহমদ, 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা' *বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১) ৩য় খণ্ড*, দ্রষ্টব্য, সম্পাদনা- সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২, পৃ.১০২

২৮. মোহাম্মদ আজহার, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ.৪০

Dhaka University Institutional Repository

২৯. জাহেদা আহমদ, 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা', পূর্বোক্ত, পৃ.১০৩

৩০. মোহাম্মদ আজহার আলী,পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩-৪৬

৩১. B.D. Bhatt. J.C. Aggarwal. Ibid. p.23

৩২. মোহাম্মদ আজহার, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪

৩৩. মোহাম্মদ আজহার, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫-৮৭

৩৪. জাহেদা আহমদ, পৃ.১০৮

৩৫. মোহাম্মদ আজহার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫১

৩৬. অজয় রায়, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালে কালে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩

৩৭. জাহেদা আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১২

৩৮. অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৪

৩৯. মোহাম্মদ আজহার, পূর্বোক্ত, পৃ.৯২-৯৪

৪০. মৃত্যুঞ্জয় বকসী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, পৃ.১৬৭-৬৮

৪১. ঐ, পৃ.১৭১

৪২. *Report on Public Instruction in East Bengal for the Period from August* 15, 1947 to March, 31, 1948. pp.10-11.

৪৩. *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1948-49, p.8.

৪৪. Ibid.p.9.

৪৫. Ibid.p.9.

৪৬. Ibid.p.10

৪৭. Ibid.p.11

৪৮. *Report on Public Instruction in East Bengal for the Period from August* 15, 1947 to March. 31. 1948. pp.13-14.

৪৯. Ibid.p.14 and *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1948-49, p.12.

৫০. Ibid.p.14

৫১. Ibid.pp.14-15

৫২. *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1948-49, pp. 13-14.

৫৩. Ibd.p15

৫৪. *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1947-48, and 1948-49. pp. 18 and pp.-17.

৫৫. *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1948-49. pp.17

৫৬. IBid.P.19

৫৭. *Report on Public Instruction in East Bengal for the Period from August* 15, 1947 to March, 31, 1948. pp.20-21

৫৮. *Report on Public Instruction in East Bengal for the year* 1948-49, P20.

৫৯. Ibid.pp.21-22.

৬০. Ibid.p.24

৬১. Ibid.p.25.

৬২. *Proceedings of the First Meeting of the Advisory Board of Education Division,* Government of Pakistan,in 1949. p.II

৬৩. Ibid.p.II

৬৪. Ibid.p.II

৬৫. *Proceedings of the Pakistan Educational Conference held* at Karachi from 27th November to 1st Deccember 1947, p.27.

৬৬. Ibid.p.27

৬৭. Ibid.p.29

৬৮. Ibid.p.32

৬৯. Ibid.p.35

৭০. Ibid.p.35

৭১. Ibid.p.37

৭২. Proceedings of the First Meeting of the advisory Board of Education Division p-2

৭৩. Ibid.p.47

৭৪. *Proceedings of the Third Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan,* held at Dhaka 14th-16th December. 1949, Government of Pakistan, P.10

৭৫. Ibid.p.10

৭৬. Ibid.p.9

৭৭. *Proceedings of the 5th Meeting of the advisory Board of Education for Pakistan.* Govt of Pakistan 1954. p.4.

৭৮. Ibid.p.6

৭৯. *Report of the East Bengal Education System Reconstruction Committee,* Government of East Bengal, 1952, Appendix-A. p. 167.

Dhaka University Institutional Repository

৮০. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী. *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ.২৬৭-৭৭.

৮১. ঐ. পৃ.২৭৮-২৮০

৮২. পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ বিজ্ঞাপন নং ১০৩, পি.ই.এস. ২৪ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ.১.

৮৩. ঐ, পৃ.১

৮৪. ঐ, পৃ.২

৮৫. শফিউল আজম, মমতাজ জাহান, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত *শিক্ষাকোষ*, ঢাকা: সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো: ২০০৩, পৃ.৩০

৮৬. Government of East Bengal. *B-Proceedings Education File No.* 3T-1950. Procudings No. 577-588.

৮৭. Ibid.

৮৮. Government of East Bengal. *B-Proceedings Education File No.* 8B-25. Proceedings No. 225-232, Bundle No. 85

৮৯. *সওগাত*, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ.২৮৫-২৮৮

৯০. *Population Census of Pakistan 1961*, Volume-1, Part-IV, Statement-5.3.

৯১. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education File No.* 6A-13/1949, Proceedings 341 and 342, Bundle No. 95

৯২. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education File No.* 6A-1949, Proceedings 317-318, Bundle No. 94

৯৩. Government of East Bengal. *B-Proceedings Education File No.* 6A-1948, Proceedings 737-741. Bundle No. 90

৯৪. Government of East Bengal. *B-Proceedings Education File* No. 3-12,1948, Proceedings 197-207.December 1948. Bundle No. 84

৯৫. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education File No.* IF-9,1948, Proceedings 634-637,March, 1953, Bundle No. 91

৯৬. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education, File No.* IG-13 of 1948, Proceedings 103-120,March, 1953, Bundle No. 96

৯৭. Samor Guha, *Non-Muslims behind the Curtain of East Bengal*, Calcutta-1951, p.8

৯৮. Ibid.p.10

৯৯. Ibid.pp.7-19

Dhaka University Institutional Repository

১০০. Ibid.pp.16-34

১০১. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮.

১০২. ঐ, ১৯, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮.

১০৩. *Proceedings of the Sixth Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan Government of Pakistan*, Ministry of Education, Held at Peshawar 2nd to 5th March 1954, p.53.

১০৪. *Proceedings of the sixth Meeting of theAdvisory Board of Education for Pakistan Government of Pakistan*, Ministry of Education, Held at Peshawar 2nd to 5th March 1954, p-53.

১০৫. Ibid.p.56

১০৬. Ibid.p.57

১০৭. *Report of the East Bengal Education Reconstruction Committee*, 1952, pp.73-75.

১০৮. *Proceedings of the Sixth Meeting*, Ibid.p.58

১০৯. Ibid.P.259

১১০. *বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*-১৯৭৪, পৃ.৬০

১১১. ঐ, পৃ.৬১

১১২. *Assembly Proceedings Official Report*, East Pakistan Assembly, First Session 1957, 1st to 3rd April 1957, p- 121.

১১৩. Ibid.p.122

১১৪. Ibid.p.125

১১৫. আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,ঢাকা,* ইউ.পি.এল-১৯৯৬, পৃ.২

১১৬. *Report of the Educaton Reforms Commission*, East Pakistan,Published by East Pakistan, Govt. 1957,pp.3-7

১১৭. Ibid.p.35

১১৮. Ibid.p.87

১১৯. Ibid.p.88

১২০. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার* উত্তরণ, ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.২৮৯, *শিক্ষাকোষ*, শফিউল আজম, মমতাজ জাহান, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত, ঢাকা: সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো., ২০০৩, পৃ.৩০.

Dhaka University Institutional Repository

১২১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৯

১২২. *Report of the Educaton Reforms Commission*, East Pakistan 1957, pp 7-8.

১২৩. Ibid.p.9

১২৪. Ibid.p.10-13

১২৫. Ibid.pp.16-17

১২৬. Ibid.pp -19-21

১২৭. *Report of the Educatoh Reforms Commission. East Pakistan* 1957,p.21

১২৮. Ibid.p.21-22

১২৯. Ibid.pp.21-26

১৩০. Ibid.p.31

১৩১. *Report of the Educaton Reforms Commission*, East Pakistan 1957, P.38

১৩২. Ibid.p.39-43

১৩৩. *জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ.২০৯-২১০.

১৩৪. *ঐ*, পৃ.২২৪-২২৫

১৩৫. *ঐ*, পৃ.২২৫

১৩৬. *ঐ*, পৃ.২২৫

১৩৭. *ঐ*, পৃ.২২৫-২২৬

১৩৮. *ঐ*, পৃ.২২৩-২২৬

১৩৯. *ঐ*, পৃ.১৭৬-১৭৭

১৪০. *ঐ*, পৃ.১৮০-১৮১

১৪১. *জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ.১৭৯-১৮৯

১৪২. *ঐ*, পৃ.২৪

১৪৩. *ঐ*, পৃ.৭০

১৪৪. *ঐ*, পৃ.২৫-২৭

১৪৫. *ঐ*, পৃ.৭৫

১৪৬. *জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ.১৭৯-১৮৯

১৪৭. *The Commission on Student Problem and Welfare Commission* 1966, p.6.

১৪৮. Ibid.p.1

১৪৯. Ibid.p.4

১৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫১. *ঐ*, ৬ এপ্রিল ১৯৬৬.

Dhaka University Institutional Repository

১৫২. ঐ. ৬ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৩. ঐ. ৭ ও ৯এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৪. ঐ, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৫. ঐ, ১০ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৬. ঐ, ১১ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৭. ঐ, ১১ এপ্রিল ১৯৬৬.

১৫৮. *The Commission on Students Problem and Welfare Commission* 1966. pp.189-191.

১৫৯. *Proposal for a New Education Policy,* Ministry of Education and Scientific Research, Islamabad, July 1969, page. 11.

১৬০. Ibid.9

১৬১. Ibid.p.9

১৬২. Ibid.pp.13-17

১৬৩. Ibid.pp31-33

১৬৪. Ibid.pp.47-48

১৬৫. *Proposal for a New Education Policy* Ministry of Education and Scientific Research, Islamabad, July, Appendix-C, pp.66-71

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)

রাজনৈতিক অবস্থা

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের ক্রমোন্নতির জন্য জাতি গঠনের শর্ত সম্বন্ধে Joseph. R. Strayer বলেছেন, ".....those which correspond closely to old political units; those where the experienc of living together for many generation within a continuing political framework has given the people.... some sense of identiy; those where the political units concide roughly with a distinct cultural area and those where there are indigenous institutions and habits of political thinking that can be connected to forms borrowed from outside"[১] জাতি গঠনের উপরোক্ত পূর্বশর্ত সমূহের আলোকে বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন স্বাভাবিক ছিল না। Rupert Emerson উল্লেখ করেন যে, " by the accepted criteria of nationhood there was in fact no such thing as a Pakistani nation." [২]

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল খুবই দূর্বল। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন সেটির অভাব ছিল পাকিস্তানের। রাজনৈতিক পরিবেশ ও নেতৃত্বদানকারী বা দিক নির্দেশনাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভিন্ন। পাকিস্তান গঠনতন্ত্রে সংবিধান তৈরির ধারণাটি ছিল অস্পষ্ট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এর রাষ্ট্রীয় কাঠামো আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র না চিরাচরিত রূপ লাভ করবে এমন কোন স্বচ্ছ ধারণা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দানকারীদের ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পরই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে সংমিশ্রণ করলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তিনি হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিয়েছিলেন তারা পাকিস্তানের মুসলিম নাগরিকের মত সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করবে। জনসাধারণের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরের কোন প্রয়োজন নাই। পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল জিন্নাহ তা নাকচ করে দেন। তিনি স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেন, পাকিস্তান একটি আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে সেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক থাকবে। তিনি বলেন– "And we will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religion sense, because that is the personal faith of every individual but in the political sense as citizens of the state"[৩] পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে

Dhaka University Institutional Repository
রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে, না হলে রাজনীতির সাথে জড়ালে এর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে বলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধারণা ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে তার মৃত্যু ধর্মনিরপেক্ষতার গতি ধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। নবজাতক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্তরসূরিগণ উপযুক্ত প্রমাণিত হয়নি। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে বিশেষত ভারতের সীমান্তসহ প্রদেশ সমূহ হতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসতে শুরু করে। এদের পুনর্বাসন একটি বড় সমস্যা ছিল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ন হওয়ায় গঠনমূলক চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দেশ গড়ার কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হন তখন ধর্মীয় নেতা বা উলেমারা তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু মুসলমানদের আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তাই এটিকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই হবে যুক্তিসঙ্গত। লাহোর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে তারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য উলেমাদের সাথে আপোস করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাবে পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্ররূপে উল্লেখ করা হয়, যেখানে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও অনুশাসন অনুসারে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করা হবে।[৪]

পূর্ববাংলা পাকিস্তান আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হলেও মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে ভারত ও পাঞ্জাবের ভূস্বামী, উঠতি মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও আমলাদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। ভারত বিভক্তির পর এই শ্রেণীটি দেশের ক্ষমতাসীন এলিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এদের বেশির ভাগই পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন কিংবা ভারত থেকে পরে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন। এই শ্রেণীটি অল্প সময়ের মধ্যে অধিকতর রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আদায়ে সক্ষম হয়।

রাজনৈতিক দল গঠন

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান এলাকাভুক্ত কাউন্সিল সদস্যদের সমন্বয়ে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠিত হয়।[৫] পূর্ব পাকিস্তানে সরকার বিরোধী ছাত্র শক্তিকে সংগঠিত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনই ছিল একমাত্র সক্রিয় ছাত্র প্রতিষ্ঠান। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় নঈমুদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্য নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ করা হয়।[৬] ১৯৪৯ সালের ২৩

Dhaka University Institutional Repository

জুন কে.এম. বশীর-এর কে.এম. দাস লেনস্থ বাসভবন, রোজ গার্ডেনের হলো কামরায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ২৫০ থেকে ৩০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী লিখিত ভাষণ দেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান। এ.কে. ফজলুল হক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং কতিপয় ছাত্র ব্যতীত সবাই এটি সমর্থন করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।[৭]

পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগ করা হয় যা পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পর ১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য এর সদস্যপদ খোলা রাখা হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছয় শত সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে এটি পাস হলে রূপমহলো সিনেমা হলে উপস্থিত সদস্যরা শহীদ ভাসানী জিন্দাবাদ হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই শ্লোগান দিতে থাকে। পার্টির নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।[৮] এছাড়াও আরো কিছু রাজনৈতিক দল গঠিত হয় যেমন নেজাম-ই-ইসলাম ১৯৫০ সালে, গণতন্ত্রী দল ১৯৫৩ সালে, কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩ সালে।

মূলনীতি কমিটি

পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের একটি ভয় ছিল যে ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন করবে। ফলে তারা নিজেদের শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য ১৯৪৯ সালের মার্চে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে Basic Principles Committee বা মৌলিক নীতিমালা কমিটি নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ২৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন বাঙালি। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার অনুপাতে এর প্রতিনিধি আরো বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিনেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে। যে ছয়জন বাঙালি এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমা নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। কমিটি তার অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে। কমিটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুমোদন দান করে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠন; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাথে ক্ষমতা বন্টন এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ। কমিটি আইন পরিষদের নিম্নকক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থাকবে কিন্তু উচ্চ পরিষদে এক পঞ্চমাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে বলে অনুমোদন দেন। এতে উভয় কক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে সংখ্যা লঘিষ্ঠ। উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন সিদ্ধান্তই উচ্চ কক্ষে ভেটো বা বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এছাড়াও কমিটি এমনভাবে ক্ষমতার বিভাজন অনুমোদন করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রাদেশিক সরকারের চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেশি ক্ষমতা থাকবে যা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বিপরীতে যাবে। উভয় অঞ্চলের মাঝে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদার করার জন্য কমিটি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদন দান করে।[৯]

উচ্চ ও নিম্নকক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[৯ক]

সারণি-১৬

অঞ্চল	উচ্চকক্ষ	নিম্নকক্ষ	মোট
১. পূর্ব বাংলা	১০	১৬৫	১৭৫
২. পাঞ্জাব	১০	৬৫	৭৫
৩. এন. ডব্লিউ. এফপি ও ট্রাইবাল অঞ্চল	১০	২৪	৩৪
৪. সিন্ধু এবং ...	১০	২০	৩০
৫. বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর ও করাচী	১০	১৬	২৬
মোট	৫০	৩০০	৩৫০

B P C (Basic Principles Committee) বা মৌলিক নীতিমালা কমিটির প্রতিবেদনই ছিল পাকিস্তানের সংবিধানের প্রথম খসড়া। এই খসড়া পূর্ব পাকিস্তানে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বাঙালিরা এই ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে যে, যদি মূলনীতি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে এবং এটি পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হয়ে পড়বে।[১০]

১৯৫০ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিরোধী দলসমূহের রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও আইনজীবীগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।[১১] গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির নভেম্বরের সম্মেলন জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। মূলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা স্থগিত রাখে এবং ১৯৫২ সালে গণপরিষদে দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক খসড়া পেশ করে। এই খসড়াটি ছিল পূর্বের তুলনায় অগ্রসরমান। এতে বলা হয় দুই প্রদেশের মধ্যে সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের ব্যবস্থা থাকবে।[১২] পাঞ্জাবীরা এর বিরোধিতা করলে সংবিধান তৈরির কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালের অক্টোবরে মোহাম্মদ আলী তার সাংবিধানিক প্রস্তাব ঘোষণা করেন যা বগুড়া নিস্টার (Bogra Nishter) ফর্মূলা নামে পরিচিত। তিনি প্রস্তাব করেন যে, নিম্নকক্ষে জনগণই প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হবে, পক্ষান্তরে উচ্চ কক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে ইউনিট এর উপর ভিত্তি করে। উভয় কক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

বৈঠকে উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। প্রত্যেক অঞ্চলে আসন সংখ্যা ছিল ১৭৫টি করে। এর ফলে সাংবিধানিক জটিলতা দূরীকরণ সহজতর হবে।[১৩] কিন্তু বগুড়া নিস্টার ফর্মুলা বাস্তবায়িত হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ২১ দফা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট শতকরা সাড়ে ৯৭.৫টি ভোট পায়।[১৪] এই ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩টি, কৃষক শ্রমিক ৪৮টি, নেজাম-ই-ইসলাম ২২টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১৩ ও খিলাফত রব্বানী ২।[১৫] উল্লেখ্য ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি আসন। এভাবে পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। নির্বাচনে জয়লাভের কয়েক মাসের মধ্যে ঐক্য জোট ভেঙ্গে গেলেও তাদের কর্মসূচী পরবর্তী রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর মন্ত্রিত্ব নিয়ে এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে মতান্তর হয়। এ.কে. ফজলুল হক আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তিনজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এক মাস পর ১৫ মে ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ থেকে ১০ জন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হয়।[১৬] মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এ. কে. ফজলুল হক বিভিন্ন গণমাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। এছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রদানের আহবান জানান। ১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা সফরে যান এবং সেখানে বলেন,. "It is important that the people of the two Bangals (Eastern wing of Pakistan and West Bengal in India) should realize the fundamental fact that in order to live happily must render mutual assistance to each other." তিনি আরো বলেন,"I do not belive in any political division of the country I am infact not familiar with the two new worlds Pakistan and Hindustan." [১৭]

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কলকারখানায় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা শুরু হয়। এ.কে ফজলুল হকের ঢাকায় দেওয়া বিভিন্ন গণমাধ্যমের বক্তব্য ও কলকাতায় দেওয়া বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় সরকার । কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হককে করাচীতে ডেকে পাঠান এবং তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয়। ৩০ মে ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক ঢাকায় আসেন । গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এই অজুহাতে ৯২-ক ধারা বলে জরুরী নির্দেশ জারি করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। প্রথম পর্যায়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা মাত্র ছয় সপ্তাহ স্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে সরকারি মন্ত্রিভবন থেকে বন্দীসহ অনেককে বন্দী করা হয়। গভর্নর জেনারেল ২৫ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙে দেন।[১৮] গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমিযুদ্দিন খাঁ গভর্নর জেনারেলের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করে সিন্ধু চিফ কোর্টে রিটের মামলা দায়ের করেন। চিফ কোর্ট তমিযুদ্দিন খাঁর পক্ষে রায় দিলে গভর্নর এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করেন। সেই সঙ্গে গভর্নর জেনারেল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২১৩ ধারার বিধান মতে ফেডারেল কোর্টের নিকট একটি রেফারেন্স করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে ফেডারেল কোর্ট কনভেনশন গঠনে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা নাই, সাধারণ গণপরিষদ গঠন করতে হবে বলে রায় দেন। ১৯৫৫ সালের ২৮ মে গভর্নর জেনারেল কোর্টের রায় মোতাবেক নয়া গণপরিষদ গঠনের অর্ডিন্যান্স জারি করেন।[১৯]

পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ ক ধারা প্রবর্তন

৩০ মে ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯ মে ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন যা গেজেট আকারে ৩০ মে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে। গভর্নর জেনারেল এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে, ভয়ানক জরুরি অবস্থা বিরাজমান এবং পূর্ব বঙ্গের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন, ফলে পূর্ববঙ্গের শাসন ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী চলতে পারে না। এতদ্‌প্রেক্ষিতে ৯২-ক ধারা অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদকে তাঁর পক্ষে ক্ষমতা ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে বিকাল ৬টায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ পাঠ করান ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জে.এইচ, ইলিচ।[২০]

মারি চুক্তি

গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৭ থেকে ১৪ জুলাই ১৯৫৫ সালে মারিতে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের ধারণা যে, পূর্ব পাকিস্তান একত্ব ও সংখ্যাধিক্যের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রাধান্য করবে। এই ভয়ে তারা দুই পাকিস্তানের সংখ্যা সাম্য দাবি করে। তাদের ভয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ঐক্যজোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের অনৈক্যের সুযোগে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি অবলম্বন করে প্রাধান্য বিস্তার করবে। এই কারণে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে একটি মাত্র প্রদেশ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিনেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংখ্যা সাম্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে না বলে স্পষ্টভাবে জানায়। দীর্ঘ আলোচনার পর পাঁচ দফার ভিত্তিতে মারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

পাঁচটি দফা নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট

২. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

৩. সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যা সাম্য

৪. যুক্ত নির্বাচন

৫. বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা

প্রথমে উভয় পাকিস্তান থেকে দুইজনসহ মোট চার জন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন বলে স্থির হয় কিন্তু এ. কে. ফজলুল হকের আপত্তির কারণে উভয় অঞ্চল থেকে চারজন করে মোট আটজন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, নবাব গুরমানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ডাঃ খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান এবং আবুল মনসুর আহমদ।[২১] ৫ আগস্ট ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে সরকার পক্ষ ১৭০-১৭৭ ভোট পায় এবং আওয়ামী লীগ ৯২-৯৯ ভোট পায়। অসুস্থতার অজুহাতে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ছুটিতে থাকায় অস্থায়ী গভর্ণর হন ইস্কান্দার মির্জা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব না দিয়ে ১০ আগস্ট ১৯৫৫ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কৃষক শ্রমিক পার্টি, কংগ্রেস ও তফসিলী সকলেই মন্ত্রিত্ব নিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এ.কে. ফজলুল হক পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট পাস করা হয়। ৩ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে গভর্নরের স্বাক্ষরের পর উক্ত আইন গেজেট হয়। ৬ অক্টোবর নতুন প্রদেশের গভর্নর হন মুশতাক আহমদ গুরমানী। ডা. খানের প্রধানমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[২২]

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস পার্টি প্রগ্রেসিভ পার্টি ও তফসিলী ফেডারেশন এই তিনটি হিন্দু দলও মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী হন এবং বার জন আওয়ামী লীগ সদস্যসহ মোট পঞ্চাশজনের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কোয়ালিশনের অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য।[২৩] আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন সরকার অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকলেও উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেন, যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১. মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সকল রাজবন্দীর মুক্তিদান ও নিরাপত্তা আইনে [illegible] বা মোকদ্দমায় জড়িত সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

২. শাসনভার গ্রহণের মাত্র ১১ দিনের মধ্যে আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান, বাজেট পাশ ও নিরাপত্তা আইন বাতিল।

৩. পাটের লাইসেন্স ফি উঠিয়ে দেওয়া।

৪. বকেয়া খাজনা সুদসহ মওকুফ করা।

৫. সার্টিফিকেট প্রথা উচ্ছেদ।

৬. কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ।

৭. প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা স্থাপন।

৮. লক্ষ লক্ষ মন চাউল গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৯. গরু, বাছুর ও কৃষির অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

১০. খাল-বিল খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, মেরামত ও জলাভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা টেস্ট রিলিফ বাবদ মঞ্জুর করা হয়।

১১. নির্বাচনের সময় মন্ত্রীদের সফরকালে সরকারি অর্থ ব্যয় ও যানবাহন ব্যবহার না করার আদেশ দেওয়া হয়।

১২. অল্প বেতনভোগী কর্মচারি ও শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয়।

১৩. প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪. কোর্ট ফি ও রেফ কাগজের দাম কমান হয়।

১৫. দুর্নীতি, ঘুষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬. খাদ্য ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য পাঠাবার জন্য বিমান ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান।[২৪]

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

১৯৫৬ সালের জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে এক দীর্ঘ বিতর্ক হয়। অবশেষে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা স্থগিত রেখে শক্তিশালী কেন্দ্রের নামে একটি ইউনিটারি শাসনতন্ত্র রচিত হয় যার নাম দেওয়া হয় ইসলামিক রিপাবলিক। এই শাসনতন্ত্রের বলে কেন্দ্রে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং পূর্ববাংলা সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়। শাসনতন্ত্রে বড় রকমের সংস্কারের মধ্যে একটি হলো পূর্ব বাংলার পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের চারটা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিজ নিজ অস্তিত্ব লোপ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এক হয়ে যায়।[২৫] ১৫

E:\k/05-02-2012\1-5.doc 13-01-12.doc

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পল্টনের জনসভায় বলেন, "প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করবে না। আমরা জীবনের বিনিময়ে হলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণবিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।" তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন যে, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলার সুপারি, তামাক ও পাটের ওপর ট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স, সেলট্যাক্স ও পার্চেজ ডিউটি ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই কেন্দ্রের হাতে দিয়ে পূর্ব বাংলা প্রদেশকে অর্থনৈতিক দিক হতে অচল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, "নৌ-সদর দপ্তরের ডেপুটি প্রধান সেনাপতির অফিস এই প্রদেশে স্থাপনের দাবি আমরা করিয়াছিলাম, আনসার বাহিনীকে নিয়মিত সৈন্য বাহিনীতে সংযুক্ত করা হয় নাই। সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে পূর্ব বাংলাকে সব দিক দিয়া স্বায়ত্তশাসন হতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।" তিনি অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি হতে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালো ব্যাজ ধারণ করতে বলেন ও ২৯ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানান।[২৬] প্রাদেশিক পরিষদেও বিরোধী দলীয় নেতা আতাউর রহমান খান এই শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের মুখে রচিত পূর্ব বাংলার মৃত্যু পরওয়ানা বলে অভিহিতোকরেন।[২৭] ১৯৫৬ সালের ১০ ও ১১ অক্টোবর পাকিস্তান গণপরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিল আনা হয় এবং ১৪ ঘণ্টা বিতর্কের পর পূর্ব পাকিস্তানের যুক্ত নির্বাচন বিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন বিল পক্ষে ৪৮ ও বিপক্ষে ১৯ ভোটে পাস হয়। [২৮]

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী বলেন–

১. পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি মানুষের মতামত না নিয়ে রাজধানী করাচীতে স্থাপন, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা ও অর্থ ও চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে এনে মুসলিমলীগের দোষ-ত্রুটির সমালোচনাকে ইসলাম বিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৩. মুসলিম লীগ নেতারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে না চললেও রাজনৈতিক সভা-সমিতিকে প্রধানত ধর্মমূলক ওয়াজ নসিহতের জলসায় পরিণত করেন।

৪. মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রাসূল এক এবং কেতাব এক এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও এক হবে বলে প্রচার চালান ও এই যুক্তিতে বিরোধী দলকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিহিতোকরা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সমস্ত পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করেন। তারা চরম দুর্নীতি, চোরাকারবারী ও স্বজনপ্রীতি করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় গোলাম মোহম্মদের জামাতা হোসেন মল্লিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগান কেনার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬ লক্ষ টাকা ৭/৮ বৎসর ধরে ব্যক্তিগত তহবিলে রাখেন।

৬. কেন্দ্রীয় সরকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূর্খতার পরিচয় দেন।

৭. মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অর্থনীতিকে রাজনীতির সাথে মিলিয়ে ফেলেন। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তান থেকে ৪০ লাখ বেল পাট ও ১৫ লাখ মন তুলা কিনতো, বর্তমানে মাত্র দশ লাখ বেল পাট ক্রয় করে। ভারত যেখানে পাঠ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে সেখানে পূর্ব বাংলাকে বলা হচ্ছে পাট উৎপাদন কমাও নীতি।

৮. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের চেয়ে পাকিস্তানের মতো দরিদ্র দেশের অনেকের বেতন বেশি। মওলানা ভাসানী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে, "আসসালামো আলায়কুম"[২৯]

১৯৫৭ সালের ১ ও ৩ এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মহিউদ্দিন আহম্মদ, মি. মোজাফ্ফর আহমদ ও মি. আসাবুদ্দিন আহমদ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় উল্লেখিত ১৯নং দফায় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যুক্তি দেখান। কিন্তু এ.কে. রফিকুল হোসেন ও সৈয়দ কামরুল আহসান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বক্তারা নিম্নলিখিত বৈষম্য তুলে ধরেন:

465932

১৯৪৭-১৯৫৬ পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যঃ (কোটি টাকার অংকে) [২৯ক]

সারণি-১৭

ক্রঃনং	খাতসমূহ	পূর্ব পাকিস্তান	-	পশ্চিম পাকিস্তান
১.	রাজস্বখাত	১৮৮	....	১০০৮
২.	কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি	৫৪	....	২১৯
৩.	সাহায্য খাতে	১৮	....	৫৪
৪.	বিদেশিসাহায্য	১৫	....	৭৩
৫.	কৃষি খাতে	৯	....	৯৭
৬.	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সামরিক খাতে	৩৭	....	৬১২
৭.	ডাক ও তার	৩	....	১৩

২. ১৯৪৭-১৯৫৫ পর্যন্ত রপ্তানির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়:

	আমদানি	....	রপ্তানি
পূর্ব পাকিস্তান	২৮৯	....	৫৬২
পশ্চিম পাকিস্তান	৭৭১	....	৫৮১

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল

পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলির জনমত যাচাই না করে এক ইউনিট করা হয়েছিল সেখানকার জনগণ এই এক ইউনিট মেনে নেয়নি এবং এর প্রতিবাদে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনগণের চাপে আইন পরিষদের সদস্যরা এক ইউনিট ভেঙ্গে প্রদেশগুলি পুন:প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন এই সময় রিপাবলিকান পার্টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের রুলিং পার্টি। এই পার্টির এক সভায় এক ইউনিট ভেঙ্গে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিরোধীদল মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান ও ন্যাপ সকলেই একমত হয়ে পরিষদে এক ইউনিট ভাঙ্গার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে ১৪জন মন্ত্রী নিয়ে চুন্দ্রিগড়মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় আইনসভায় মেজরিটি রক্ষা করতে না পেরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে আইন পরিষদের বৈঠক ডাকেন। তবে তিনি নিশ্চিত পরাজয় জেনে আগেই পদত্যাগ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ বিনা মন্ত্রিত্বে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে রিপাবলিকানদের সমর্থন দেন। ফিরোজ খাঁ নুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের দিন চূড়ান্ত করেন।[৩০]

সামরিক শাসন জারি

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা 'মার্শাল ল' জারি করে শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানকে চীফ 'মার্শাল ল' অ্যাডমিনেস্ট্রেটর নিযুক্ত করেন। করাচীর 'দৈনিক ডন' পত্রিকা সামরিক শাসনকে স্বাগত জানিয়ে এটিকে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব যা বেহেস্তের আশীর্বাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে মন্তব্য করে যে, এটি একটি সুস্থ ধারার বিপ্লব যা রাষ্ট্রের সমস্ত পরিবর্তন আনয়ন করবে এবং এই সামরিক শাসন সকল তিক্ততার অবসান করবে।[৩১] পশ্চিম পাকিস্তানিনেতৃবৃন্দ নির্বাচন চাইতেন না। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে বলেন, "এদেশের মূর্খ জনসাধারণ ভোট দিতে জানে না। তার প্রমাণ এই মূর্খেরা না বুঝিয়া ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শতকরা সাড়ে সাতানব্বই ভাগ ভোট দিয়েছিল। এতে প্রমাণ হইয়াছিল এরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। এদের শুধু ডান্ডা পিটা করিয়া শাসন করা দরকার।"[৩২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আটবছরে কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয়নি। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচকদের পাকিস্তানের দুশমন, ভারতের চর ও ইসলামের শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়। সংবাদ পত্রের অফিসে তালা লাগিয়ে সাংবাদিক ও এর স্বত্বাধিকারীদের জেলে আটক করা হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ব বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবিকে অস্বীকার করে ছাত্র জনতার উপর গুলি

Dhaka University Institutional Repository

চালাতে শাসকগোষ্ঠী দ্বিধা করেনি। উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বহিষ্কার ও সদস্য পদ বাতিলসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যখন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় এবং একটি সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয় সেই মুহূর্তে সরকার পরিকল্পিতভাবে করাচী, চট্টগ্রাম বন্দর, আদমজী জুট মিল, কর্ণফুলী পেপার মিল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল ও ডকইয়ার্ড, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানাসহ বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বাঁধিয়ে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৫৮ সালে ২৮ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হন। মার্শাল ল জারি করে আওয়ামীলীগের অনেক নেতা-কর্মীকে বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠান হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, আব্দুল খালেক, এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি মি. আজগর আলী শাহ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. আব্দুল জব্বার প্রমুখ। এদের কাউকে দুর্নীতি মামলায় কাউকে নিরাপত্তা আইনে আটক রাখা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রধান কাজ ছিল প্রশাসনিক, উন্নয়ন সংক্রান্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংবিধান সংক্রান্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মকর্তাগণের মাঝে সহযোগিতা সৃষ্টি করা। তারা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচক কলেজ হিসেবে তারা কাজ করবে।[৩৩] মৌলিক গণতন্ত্রের গঠন কাঠামো নিম্নের তালিকায় দেখানো হলো :

মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো

সারণি-১৮

		চেয়ারম্যান	সদস্য
১.	বিভাগীয় পরিষদ	কমিশনার (সরকারি কর্মকর্তা)	অর্ধেক নির্বাচিত ও অর্ধেক চাকুরিজীবী
২.	জেলা পরিষদ	উপ-কমিশনার (দাপ্তরিক)	অর্ধেক নির্বাচিত ও অর্ধেক চাকুরিজীবী
৩.	থানা পরিষদ বা পৌর কমিটি	মহকুমা কর্মকর্তা (দাপ্তরিক)	অর্ধেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও অর্ধেক চাকুরিজীবী
৪.	ইউনিয়ন কাউন্সিল বা ইউনিয়ন কমিটি	সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত	বয়স্ক প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত

এই ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল ইউনিয়ন পরিষদ। এর প্রতিনিধিগণ বয়স্ক প্রতিনিধিদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এর অনুপাত ছিল ১:১০০০ জন। মূলত, এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বা মহকুমা কর্তৃক মনোনীত হতো। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন।[৩৪] এভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা না রেখে (৮০,০০০) আশি হাজার মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রীর আনুগত্যে নিশ্চিত হয়ে গোপন নির্বাচনের মাধ্যমে ৭ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যালট পেপার ছিল, হ্যা না সূচক। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে তিনি জয় লাভ করেন।[৩৫] তবে ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর এই প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয়ে যায়।

১৯৬২ সালের সংবিধান

১৯৬০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন. এর দুদিন পর শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সংবিধান কমিটির প্রধান ছিলেন এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন যারা নিম্নবর্ণসহ সকল পেশার প্রতিনিধি। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। মার্শাল ল জারির পর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন হয়নি। বিদেশিদের অর্থ সাহায্যে পাকিস্তান ধ্বংস করা হচ্ছে এই অজুহাতে ৩১ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করেন। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়াসহ বহু ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার করা হয়। শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর বিক্ষোভ আরো তীব্রতর হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের মতোই ১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল আইয়ুব খানের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ছিল নামমাত্র। সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে। কারণ আইয়ুব খানের ধারণা ছিল যদি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সময় আগা খান আইয়ুব খানকে উপদেশ দেন যে, যদি তুমি সংসদীয় পদ্ধতি অনুসরণ কর, তবে তুমি পাকিস্তান হারাবে। স্বয়ং সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সময় ঢাকার পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ১৩টি সংগঠন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পরিচালনার দাবি তোলে। ঢাকার আইনজীবী সমিতি এর সমর্থন দেয়। প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক শাসক আইয়ুব খান তাদের উপর সামরিক শাসন জারির হুমকি দিলে স্বয়ং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম ১৯৬২ সালের এপ্রিলে এই পদ্ধতির প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেন। সাবেক মন্ত্রী আতাউর রহমান বলেন, "সংবিধানের খোলস গণতান্ত্রিক কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। সংসদ অধিবেশনে বক্তৃতা, বিতর্ক এবং প্রশ্ন থাকবে এবং এর মাধ্যমে আইন প্রণীত হবে। বাজেটসহ সব কিছুই সংসদে আলোচনা করা হবে কিন্তু সদস্যদের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে না।"[৩৬] ২৫ জুন ১৯৬২ সালে নয়জন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে শাসনতন্ত্রকে অকেজো বলে দাবি করেন এবং নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। এটি নয় নেতার বিবৃতি নামে পরিচিত। নয় নেতার বিবৃতি ছিল নিম্নরূপ:-

Dhaka University Institutional Repository

"পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবস্থাকে দূরীভূত করার বিষয়টি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্রের প্রাক প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকেও বিভিন্ন বাঁধা দূর করে হবে রাজবন্দীদের ডিটেনশনও প্রত্যাহার হওয়া উচিত।" [৩৭]

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে *কনভেনশন মুসলিমলীগের প্রার্থী* হন আইয়ুব খান। পাকিস্তানের সুকল বিরোধী দল ফাতেমা জিন্নাহকে বিরোধীদলীয় সদস্য হিসেবে সমর্থন করে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে মিস ফাতেমা জিন্নাহ লাখাম হাউসে সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট পদে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের পাঁচনেতা খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা ভাসানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান ফাতেমা জিন্নাহর বাস ভবনে যান এবং তাকে মাল্যভূষিত করেন। ফাতেমা জিন্নাহ উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি আরও বলেন, জনগণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রার্থী হিসেবে সম্মতি দিয়েছেন। [৩৮]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করে এবং তার সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দ ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচারপত্র বিতরণ করে। আইয়ুব খান ফুল প্রতীক ও ফাতেমা জিন্নাহ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে ভোটার ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের সদস্যরা।[৩৯] ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান ভোট পান ২১০১২টি এবং ফাতেমা জিন্নাহ পান ১৮৪৩৪টি। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান ভোট পান ২৮৯৩৯টি এবং ফাতেমা জিন্নাহ পান ১০২৫৭টি। মোট ভোটার সংখ্যা ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী।[৪০]

নিম্নের তালিকায় ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দেখান হলো:[৪০ক]

সারণি-১৯

জেলার নাম	আইয়ুব খান	ফাতেমা জিন্নাহ
১. ঢাকা	১৭৬৪	২১৯৩
২. ময়মনসিংহ	২৭৬৪	২৬৮৪
৩. সিলেট	১১৪২	১৫৫১
৪. কুমিল্লা	১৫৩৬	১৮৭৪
৫. নোয়াখালী	৬৮২	১১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৬. চট্টগ্রাম	১২৮৪	১০৫২
৭. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	১৫০	১৪৮
৮. ফরিদপুর	১৩৩৩	১১০৯
৯. বরিশাল	১৯২০	১৩৮৯
১০. যশোর	১০১৬	৬৮৩
১১. খুলনা	১২৪০	৬৬২
১২. রংপুর	১৭২৭	১২২৯
১৩. দিনাজপুর	৭২১	৬০৯
১৪. রাজশাহী	১৪৪৫	৭৩০
১৫.. পাবনা	৯৩২	৫৯২
১৬. বগুড়া	৮৪১	৩৭৯
১৭. কুষ্টিয়া	৫১৫	৩৮৬
মোট-	২১০১২	১৮৪৩৪

আইয়ুব খানের সমর্থকরা ভয়ভীতি, কারচুপি ও টাকার বিনিময়ে তাঁর পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করেন। এছাড়াও আইয়ুব খান তার সরকারি যন্ত্র এবং স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপক ব্যবহার করে নির্বাচনে জয় লাভ করেন। কিন্তু এই নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ফাতেমা জিন্নাহ তথা বিরোধীদলসমূহ তার আগের জনপ্রিয়তায় ফাটল ধরাতে সমর্থ হয়। সেই অর্থে এই নির্বাচন একটি ক্রমবর্ধমান আইয়ুব বিরোধী পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে আরও দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে এই দুটি দেশ কচ্ছের রান অঞ্চলে একটি সীমিত সংঘর্ষে মিলিত হয়। পরবর্তীকালে আগস্ট মাসে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলে কাশ্মীরি মুজাহেদীন পাকিস্তানিসৈন্য ও গেরিলা বাহিনীর ছাদ্মবেশী অনুপ্রবেশের মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে কাশ্মীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই দ্বন্দ্বই চূড়ান্তরূপে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে বৃহৎ সংঘর্ষে রূপ নেয়।[৪১]

১৯৬২ সালে চীন ভারত- যুদ্ধে চীনের আক্রমণে ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে, প্রধানমন্ত্রী নেহেরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছে সরাসরি সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিতে ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের ক্রমাগতভাবে কোণঠাসা অবস্থানের প্রেক্ষাপটে এবং এশিয়ায় চীনের সাম্যবাদের সম্প্রসারণ ঠেকানোর জন্য ভারতের মতো একটি বড় রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাকিস্তান মার্কিনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় কারণ পূর্বেই মার্কিন ও পাকিস্তানের মধ্যে সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) বা বাগদাদ প্যাক্ট (Baghdad Pact) এর মতো সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪২] ১৭ মে ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুতে ভারতের অভ্যন্তরীণ

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের দূর্বলতার সুযোগে পাকিস্তান মনে করে কাশ্মীর সংক্রান্ত পাকিস্তানি অভিযানে ভারত ঝুঁকি নিবে না। এছাড়া ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আইয়ুব খান চীন সফর করেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারত পাকিস্তান বিষয়ে সোভিয়েত যেন নিরপেক্ষ থাকে। ইতোমধ্যে আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কাশ্মীর অভিযানের রূপরেখা প্রণয়ন করে। এপ্রিল মাসেই পাকিস্তান ভারত প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় কচ্ছের রান অঞ্চলে।[৪৩] এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় বাহিনীকে চাদবেত এলাকা হতে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের মধ্যস্থতায় এবং ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনারদ্বয় যথাক্রমে জন ফ্রিম্যান এবং স্যার মরিস জেমস এর প্রচেষ্টায় ১ জুলাই দুই দেশের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় দেশের সম্মতিতে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের হাতে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'India-Pakistan Western Boundary Case Tribunal' নামে তিনসদস্য বিশিষ্ট এই ট্রাইব্যুনালে ভারত মনোনীত প্রার্থী ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার বিচারক Alois Bebler এবং পাকিস্তান মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ইরানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী Nasrollah Entezam এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট মনোনীত সুইডেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক Gunner Lagergen [৪৪] ভারতের দূর্বল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে পাকিস্তান প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চ মহলে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাশ্মীর সমস্যা পুনরায় উত্থাপন করার এটাই উপযুক্ত সময়। একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে আইয়ুবের প্রয়োজন ছিল তার নতুন মার্কিন অস্ত্রসমূহ পরীক্ষা করা, পাকিস্তানের সামরিক জোটভুক্ত বন্ধুদের দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া এবং ভারতের প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই করা।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়লাভ করলেও তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় ফলে জনগণের মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এছাড়াও আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভূট্টো, পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমেদ, প্রতিরক্ষা সচিব নাজির আহমদ, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব আলতাফ গওহর প্রমূখ পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মির অঞ্চল হতে গেরিলা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যদের সমন্বয়ে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলে একটি গুপ্ত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। অভিযানের প্রধান কৌশল ছিল ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে Operation Gibraltar নামে এই অভিযান সীমাবদ্ধ রাখা। আইয়ুব খানের ধারণা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে পারবে না এবং পাক-সোভিয়েত সম্পর্কের কারণে সোভিয়েত নিরপেক্ষ থাকবে। কমিউনিস্ট চীন পাকিস্তানের সমর্থক হওয়ায় প্রয়োজন বোধে চীন পাকিস্তান উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। পাকিস্তান যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে মূলত তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে: (১) ভারত নিয়ন্ত্রিত

Dhaka University Institutional Repository

কাশ্মীরে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাবে; (২) ভারত তার পাল্টা অভিযান পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখবে; (৩) ভারত কর্তৃক আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমের কোন সম্ভাবনা নাই।[৪৫]

৫ আগস্ট ১৯৬৫ সালে ভারত অভিযোগ করে যে, পাকিস্তান হতে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলে ছদ্মবেশী সশস্ত্র গেরিলা প্রবেশ করেছে এবং পাকিস্তান নিয়মিত বাহিনী যুদ্ধবিরতি সীমার ওপার থেকে গুলি ছুঁড়ছে। পাকিস্তান প্রেরিত মুজাহেদীন বাহিনী কাশ্মীর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্রিজ উড়িয়ে দেয় এবং পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে। ভারতীয় বাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করে ২৭ আগষ্টের মধ্যে কারগিল অঞ্চল পুনর্দখল, উত্তর পশ্চিমের পীর সাহেবা এবং পশ্চিম মধ্য অঞ্চলের পীর পাশা, কাশ্মীরের উরি পুনচ অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে। ১ সেপ্টেম্বর ভুট্টোর ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তান নিয়মিত বাহিনী ও আজাদ কাশ্মির বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীও কতক এলাকা দখল করে। ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী পাঞ্জাব অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে। তবে যুদ্ধ চলাকালে উভয়পক্ষই এইযুদ্ধ দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়ার অসুবিধাগুলি উপলব্ধি করে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে একটি জোরালো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভারত ২১ সেপ্টেম্বর এবং পাকিস্তান ২২ সেপ্টেম্বর তা গ্রহণে সম্মত হয়। যুদ্ধবিরতির পর ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকতা এবং মধ্যস্থতায় সোভিয়েত উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে দুই পক্ষ মিলিত হয়। পাকিস্তানের পক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, ভারতের পক্ষে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এই আলোচনার নেতৃত্ব দেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়।[৪৬]

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানের দুই অংশের উপর ভিন্ন মাত্রার প্রভাব পড়ে। এই যুদ্ধের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবল হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাঝে জাতীয়তাবাদী মনোভাব তীব্রতর হয়। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর কোন সমস্যা ছিল না এবং এই ব্যাপারে তারা আগ্রহীও ছিল না। সম্পদের অভাব দেখিয়ে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনবল ও সম্পদ এই যুদ্ধে ব্যয় করা হয়। কাশ্মীর সমস্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নিজস্ব সমস্যা। পশ্চিমা লেখক রবার্ট জ্যাকসন বলেন: The Kashmir question is exclusively West Pakistan's is concern"[৪৭] এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অরক্ষিত ছিল এবং ভারত ইচ্ছা করলে অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রশ্ন উঠলে ভুট্টো বলেন, "বন্ধুরাষ্ট্র চীনের দেয়া আশ্বাসের পরই পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ভার ছেড়ে দেওয়া হয়।"[৪৮] ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঞ্জাবীরা তাদের জনপদ এবং সৈন্যবাহিনী দুই-ই হারায়। ফলে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীতে আইয়ুবের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। আইয়ুবকে এই

যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার জন্য ভুট্টোই বেশি দায়ি ছিলেন। কিন্তু ভুট্টো তাসখন্দ ঘোষণা বিরোধীদের সাথে হাত মেলান এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছয় দফা কর্মসূচী

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি এলিট শ্রেণীর সাথে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি ঘোষণা করেন, "যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসনের সকল প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সকল দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করার সময় এসেছে।"[৪৯] ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছয় দফা ভিত্তিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫০] শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচী মূলত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা হলেও এতে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর নিশ্চয়তা বিধান করার দাবি ছিল। ছয় দফায় উল্লেখিত দাবিগুলি ছিল পূর্বের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত দাবিগুলির উপর ভিত্তি করে প্রণীত তবে নিঃসন্দেহে তা ছিল বিস্তৃত ও বাস্তব কাঠামো সম্পন্ন। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল: এতে প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ সরকার গঠনের কথা বল হয়, যাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে, পৃথক বা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একক মুদ্রা থাকবে, কেন্দ্রের অনুমোদিত অর্থের জন্য প্রদেশের নিকট কর আদায়ের ক্ষমতা থাকতে হবে, পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব থাকতে হবে এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে পূর্ববাংলা স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।[৫১] যে সময়ে ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় সে সময় বাঙালিরা ছিল প্রায় আট বছর রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানিশোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য যখন সচেতন ঠিক সেই সময় ছয় দফা দাবি তাদের মনে আশার সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

বিরোধী দলীয় পাঞ্জাবী নেতারা ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে এক সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফা উত্থাপনের চেষ্টা করলে সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা প্রচার করতে থাকে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচী বিরোধী ঐক্য প্রতিহতোকরা এবং বিরোধী নেতাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের প্ররোচনায় উত্থাপন করার চেষ্টা করছেন। বঙ্গবন্ধু নিজের প্রস্তাব উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে সম্মেলন ত্যাগ করেন। সরকার বঙ্গবন্ধুর 'ছয়দফা' দাবি পাঞ্জাবীদের স্বার্থের প্রতি মারাত্মক হুমকি বলে প্রচার করে। বঙ্গবন্ধু বিবৃতি আকারে ছয়দফা কর্মসূচী সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর বিবৃতিটি ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচী আমাদের বাঁচার দাবি

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে ছয় দফা প্রসঙ্গে দাবি করা হয় যে, "এটি দেশের দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক সমাধানের মৌল নীতিমালা। এতে জোর দিয়ে বলা হয়, এই দাবিসমূহ আমার বা কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত নতুন কোন দাবি নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব দাবি জনগণ সুদীর্ঘকাল ধরেই জানিয়ে আসছে এবং এসব দাবি পূরণে নেতাদের অঙ্গীকার দশকের পর দশক ধরে বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ঝুলছে।"[৫২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ছয়দফা কর্মসূচীর স্বপক্ষে জনগণ আন্দোলন শুরু করলে ১৯৬৬ সালের ১৮ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে এবং ছয়দফার সমর্থনে ০৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আইয়ুব খানের নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ ছাড়াও বাঙালির প্রধান মুখপত্র হিসেবে পরিচিত সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর সম্পাদককে গ্রেফতার ও ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। [৫৩] ছয়দফাকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে তাতে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভীত নড়ে ওঠে। জনগণের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ডিসেম্বর মাসে আইয়ুব খান আওয়ামীলীগের নেতৃবর্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা যড়যন্ত্র মামলা নামক একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।[৫৪] দীর্ঘদিন ধরে সামাজিকভাবে অবহেলিত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত এবং রাজনৈতিকভাবে নিগৃহীত পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তা বিস্ফোরিত হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে। মামলাটি যে ষড়যন্ত্রমূলক ছিল এবং সাজানো হয়েছে তা বুঝতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অসুবিধা হয়নি। ফলে জনগণ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে আরো বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন বয়কট করার জন্য জনমত গঠনে তৎপর হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকে। অন্যদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ছাত্র সমাজ পূর্বের তুলনায় বেশি সুসংগঠিত হতে থাকে। মওলানা ভাসানী ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর নির্যাতন বিরোধী দিবস পালনের আহবান জানান এবং পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতায় ৭ ডিসেম্বর ধর্মঘটের ডাক দেন। তার নির্বাচনী বয়কট পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। [৫৫]

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। ফলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র অনেকটা অচল হয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথমদিকে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository
কমিটি (স্যাক) গঠন করে। এই কমিটি এগারো দফা দাবিনামা ঘোষণা করে যা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রেরণা যোগায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) গঠিত হয় ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি বাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে। ডাকের ৮ দফা কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে স্যাক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে মার্কসবাদী নেতা আসাদ শহীদ হন। আসাদের শহীদ হবার খবর ছড়িয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭নং অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক কারাগারে আটকাধীন অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের রীডার ডা. শামসুজ্জোহা ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালে সেনাবাহিনীর নির্যাতন থেকে ছাত্রদের রক্ষার জন্য এগিয়ে গেলে সামরিক আফিসারের গুলিতে শহীদ হন।[৫৬] এই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় ব্যাপক গণঅসন্তোষ লক্ষ্য করে আইয়ুব খান জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নিয়ে ভুট্টোসহ অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের মুক্তি দেন। কিন্তু আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন। আইয়ুব খানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনরত জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। কিন্তু 'ডাক' শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে এবং আইয়ুব খানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অবশেষে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের শর্তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হয়।[৫৭]

১০ মার্চ ১৯৬৯ সালে গোল টেবিল বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়। 'ডাক'-এর পাঞ্জাবী নেতারা ছয়দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই বিরোধী ছিলেন। মওলানা মওদুদী, মমতাজ দৌলতানী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীসহ পাঞ্জাবী নেতারা ৮ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর চাপ দিতে থাকেন যে, ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি 'ডাক'-এর অভিন্ন দাবিনামার অংশ নেওয়া উচিত নয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অবস্থানে অটল থেকে বলেন ছয় দফা কর্মসূচীভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করতে না পারলে তিনি এবং তার দল গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না। পাঠান এবং বেলুচী নেতারা ছয়দফা দাবির সমর্থক ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সামগ্রিকভাবে কমিটি (ডাক) একটি ন্যূনতম অভিন্ন দাবিনামা উত্থাপন করবে তবে কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক দলই তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া আলাদাভাবে তুলে ধরার স্বাধীনতা পাবে। এই

Dhaka University Institutional Repository
সমঝোতার ভিত্তিতে অবশেষে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। ছয় দফার সঙ্গে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অভিন্ন দাবি তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। [৫৮]

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন যে, "আগামী দুই মাসের মধ্যে সরকার ছাত্র সমাজের তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রাণের দাবি ১১ দফা মানিয়া না লইলে জনসাধারণ খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করিবে।" তিনি ঘোষণা করেন যে, "নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলনের দিন শেষ হইয়াছে। এখন অনিয়মতান্ত্রিক ও সহিংস আন্দোলন শুরু হইবে।" তিনি প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে ডাক নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, "বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল ব্রিটিশ আমলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের চাইতে খারাপ হইবে।" তিনি বলেন যে, "ব্রিটিশের গোল টেবিল বৈঠকের মারফত যেমন পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকেও জনসাধারণের দাবি আদায় সম্ভব নয়।" [৫৯]

১০ মার্চ ১৯৬৯ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার দাবি জানান। তিনি পাকিস্তানের জনগণের জন্য পুর্ণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানান। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে বাতিল করে এক ইউনিট চালু করা হয়। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবি জোরদার হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন উঠতি বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তবে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। [৬০] ১৩ মার্চ ১৯৬৯ সালে চারদিন আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোলটেবিল বৈঠক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন যে, 'আমীমাংসিত প্রশ্নগুলি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সমাধান করলেই সব চাইতে ভাল হবে।' [৬১] গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান কার্যত একতরফা রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে গণআন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অবশ্য মার্চ মাসেই 'ডাকে'র বিলুপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের রোয়েদাদ ঘোষণার পর বাঙালি জনগণ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নিন্দা এবং ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৬২] ছয় দফাকে কার্যকর করার জন্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আইয়ুব খানের বৈঠক হয় এবং জাতীয় পরিষদে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তার উপদেষ্টাদের সাহায্যে তিন সপ্তাহের মধ্যে ছয়দফা কর্মসূচি ও এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ার জন্য ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো প্রণয়নে যখন ব্যস্ত ঠিক সেই সময় আইয়ুব খান সংশোধনীটি পাকিস্তানের ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন–

I have always told you the secret of the continued existence of Pakistan is in a strong center. I accepted the federal Parliamentary system because even in this system, there are possibilities of keeping a strong center. But now it is being proposed that the country be divided into two parts the center be made weak and helpless, the defence forces be paralyzed completely and west Pakistan's political position be ended. I cannot preside over the destruction of my country. [৬৩]

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল, জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত করেন। প্রথম ভাষণেই তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান, একটি গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আইনগত রূপরেখা (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) ঘোষণা করেন। তিনি এক ব্যক্তি এক ভোট অর্থাৎ তিনি জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে নেওয়ার কথা বলেন। এর ফলে পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি পাবে। [৬৪] ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আইন কাঠামো আদেশ জারি করেন। এই আইন ছিল ৬ দফা ও ১১ দফার দাবি বিরোধী ।[৬৫] প্রথমে ৫ অক্টোবর ১৯৭০ সালে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও বন্যার কারণে তারিখ পিছিয়ে ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর করা হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই দুর্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেশে-বিদেশে প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়। সরকারি ত্রাণতৎপরতা ছিল অপর্যাপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদাসীনতায় পূর্ব পাকিস্তানে গণ অসন্তোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে স্বায়ত্তশাসনের দাবির সাথে আপোস রফা করার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। এইসময় মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে স্বাধীন পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ঘোষণা দিয়ে বলেন–"সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবি আইনসঙ্গত–এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়; স্বাধীন স্বার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব-পাকিস্তানের ১৪ লক্ষ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আর ১৫/২০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো না হয় মৃত্যুবরণ করবো।" তিনি আরও বলেন, "জয়বাংলা"শ্লোগান বন্ধ করার জন্য কোন সৈন্য দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র বলে ধরে নেওয়া হবে।"[৬৬]

নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতায় আওয়ামী লীগের জনসমর্থন আরো বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বাঙালির বিরুদ্ধ অনুভূতি ভোটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। নিম্নের সারণিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো :[৬৬ক]

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

সারণি-২০

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট আসন	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	NWFP	Baluchistan	Tribal Area	মহিলো 1	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০				-	-	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	-	৬৪	১৮	১	-	-	৫	৮৮
অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	-	১	১	৭	-	-	-	০৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	-	৭	-		-	-	-	০৭
জামাত উল উলেমা ই ইসলাম (হাজাভি গ্রুপ)	৯৩	-		-	৬	১	-	-	০৭
মারকাজি জামাত উল উলেমা-ই-ইসলাম (থানভি গ্রুপ)	-	-	৭	৩		-	-	-	০৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান)	৬১	-			৩	৩	-	১	০৭
জামাত-ই-ইসলাম	২০০	-	১	২	১	-	-	-	০৪

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	-	২			-	-	-	০২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১				-	-	-	০১
স্বতন্ত্র	৩০০	১	৩	৩		-	৭	-	১৪
		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল:[৬৬খ]

সারণি-২১

ক্র: নং	রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ সীট সংখ্যা	পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলো।	মোট আসন
১.	আওয়ামীলীগ	২৮৮	১০	২৯৮
২.	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২		০২
৩.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান)	১		০১
৪.	জামাত-ই- ইসলাম	১		০১
৫.	নিজাম-ই-ইসলাম	১		০১
৬.	স্বতন্ত্র	৭		০৭
		৩০০	১০	৩১০

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন পায় এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বেশি সীট পায়। নির্বাচনের পরই ভুট্টো বলেন, তার পিপলস পার্টির সম্মতি ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র তৈরি হতে পারে না। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাবই হলো ক্ষমতার দূর্গ এবং কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাই জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক নয়। [৬৭]

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠকে পুনরায় ছয়দফার ব্যাখ্যা চান। জানুয়ারির প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু ঢাকার এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন যে, ছয় দফা এখন জনগণের সম্মতি এবং ছয় দফা প্রশ্নে আপোসের কোন ক্ষমতা তাঁর নাই। ২৭ জানুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় এলে বঙ্গবন্ধুর সাথে কয়েকদফা আলোচনা হয় কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ভুট্টো ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, "আমাদের আসলেই সমস্যা রয়েছে এবং কোন মন্তব্য করার জন্য আমাদেরও অন্তত ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ সময়ের প্রয়োজন।" তিনি আরো বলেন, "গণপরিষদে প্রবেশের আগে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছার প্রয়োজন নেই কারণ পরিষদের অধিবেশন করলেই আলোচনা চলতে পারে।"[৬৮] মূলত, পিপলস পার্টিরও উদ্দেশ্য সংলাপ নয় বরং সংকট সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা প্রদানে বাঁধা সৃষ্টি করা। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধারূপে পরিচয়দানকারী দুই তরুণ ভারতীয় এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে গেলে ভুট্টো ও তার পিপলস পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

ছিনতাইকারীদের সিংহ বিক্রমশালী বীর হিসেবে তুলে ধরেন, লাহোরের রাজপথে তাদের [illegible] বিজয় মিছিল করে এবং বিস্ফোরক দিয়ে বিমানটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমানটি ধ্বংসের নিন্দা [illegible] বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপ বক্তৃতা দেন–"দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপে কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা প্রতিহতোকরতে পারতো [illegible] মনে রাখা উচিত যে, জাতীয় জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি কেবল [illegible] স্বার্থই রক্ষা করবে। আমি বিষয়বস্তু তদন্ত এবং সৃষ্ট পরিস্থিতিকে অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা থেকে স্বার্থবাদী মহলো কে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"[৬৯] তবে ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ে-একটি উল্লেখযোগ্য ফল হলো ভারত তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সকল পাকিস্তানিবিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পুর্ব পাকিস্তানে বিমান পাঠানোর একমাত্র পথ হলো ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের বাইরে দিয়ে ঘুরে শ্রীলংকা হয়ে যার দূরত্ব ও ভ্রমণ সময় প্রায় তিনগুণ।[৭০]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে বিলম্ব হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে এক বিস্ফোরণমুখর অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, ছয়দফা প্রশ্নে আপোস বা সমঝোতার লক্ষ্যে মতৈক্য ছাড়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদে বৈঠকে যোগদান করবেন না। ভুট্টোর বিবৃতির পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি সমূহের যৌথ অধিবেশনে এক নীতি নির্ধারণী ভাষণ দান কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফ্যাসিস্ট পন্থা পরিহার করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরুর শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন নিয়ে খেলা হতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "আমার ও ৬ দফার মোকাবেলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে। জনগণের দেয়া রায়ের অধিকারে ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে। সাতকোটি বাঙালির বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।"[৭১] অন্যদিকে ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়া খানের গোপন বৈঠকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী ১ মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় পরিষদ স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়। জানা যায় ভুট্টো এবং পীরজাদা মিলে জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার ঘোষণাটি তৈরি করেন। কারণ ইয়াহিয়া কোন বেতার ভাষণ দেননি বেতারে কেবল বিবৃতিটি পড়ে শোনান হয়।[৭২]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় সরকারি কর্মচারিরা সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারি অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে। ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলি খালি হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের ক্রিকেট ম্যাচ থেকে দর্শকরা দলে দলে বেরিয়ে যায় এবং ছাত্ররা রাজপথে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে। ১ মার্চ ১৯৭১ সালে দুপুর ১টায় হোটেল পূর্বানীতে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল, ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ ঢাকায় জনসভা আহবান করা হয়। ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে কোন ধরণের সহযোগিতা না করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহতোকরা সরকারি কর্মচারিসহ প্রতিটি পেশার প্রত্যেক বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন- "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস। আশা করা হচ্ছে সকল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে।"[৭৩] ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঐ সভায় প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়। লাল সবুজের এই পতাকায় হলো্দ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় পতাকায় দেশের মানচিত্র না রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। [৭৪]

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সভায় অনিধার্রিতভাবে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হন। ঐ সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ছিল দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধুকে তার উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা ঘোষণা করে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন পদাধিকার বলে ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ। পল্টনের ছাত্রলীগের এই সভায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানকে, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করা হয়। এই সভায় বঙ্গবন্ধু আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন- "আমি যদি আর না থাকি, বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন । যে কোন মূল্যে আন্দোলন চালাইয়া যেতে হবে- অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" [৭৫]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। ভাষণটি ছিল মাত্র ১৯ মিনিটের। ভাষণের মূল বাক্যটি ছিল- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুধু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসেও একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কারও কারও মতে এই ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ব্যতিক্রম হলো আব্রাহাম লিংকনের ভাষণটি ছিল লিখিত এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল অলিখিত। পাকিস্তানের সামরিক শাসকের কামান বন্দুকের মুখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে সেদিন প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণায় তিনটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে যেমন-

১। বাঙালি জাতির অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ ছিল।

২। সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনার কথা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩। *'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো'* এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকারান্তরে গেরিলা যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। [৭৬]

১৯৭১ সালের ৫ মার্চ লন্ডনের গার্ডিয়ান, সানডে টাইমস, দি অবজারভার এবং ৬ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। ৬ মার্চ ১৯৭১ সালে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপা হয়-East Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected- Sheikh Mujibur Rahman expected to Declare independence tomorrow. অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (৭ মার্চ) পূর্ব পাকিস্তানের এক তরফা স্বাধীনতার ঘোষণা করতে পারেন।)[৭৭]

ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু ১৬ ও ১৭ মার্চ তার সাথে সাক্ষাৎ করে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালে ইয়াহিয়া বার বার আইনগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ১৭ মার্চের বৈঠকের পর ইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কা খানকে নির্দেশ দেন, প্রস্তুত হও- এবং সেই অনুযায়ী ১৮ মার্চ সকালে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাওফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট এর নীল নকশা তৈরি করেন। ১৯ মার্চ ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর ট্রাকবহর টঙ্গী অতিক্রমকালে জনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে গোলাগুলি হয়। বস্তুত এটিই ছিল জনগণ কর্তৃক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়। পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী একদিকে আলোচনার নামে সময় ব্যয় করতে থাকে অন্যদিকে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য ২৪ মার্চ হেলিকপ্টার যোগে স্বয়ং ঢাকার বাহিরে দুইজন পরিকল্পনাকারীকে প্রেরণ করে তাদের বিশ্বস্ত কমান্ডারদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দিতে। ২৪ মার্চের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগ-এর দলীয় নেতৃবৃন্দ কনফেডারেশনের প্রস্তাব করলে এর প্রতিবাদ করে সরকার দলীয় এ. আর. কর্নেলিয়াস কনফেডারেশনের পরিবর্তে ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেন। ইতোমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজ এম.ভি. সোয়াত থেকে মাল খালাস করতে গেলে লাখ লাখ নিরস্ত্র জনগণ চট্টগ্রাম বন্দর অভিমুখে পথ অবরোধ করে রাখে। রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সামরিক তৎপরতার খবর পাওয়া যায়।[৭৮]

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যখন একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌছানোর জন্য আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্ব পরিকল্পিত নীল নক্শা প্রণয়নের পর ২৫ মার্চের রাতে ইয়াহিয়া খান গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালির দীর্ঘদিনের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা কার্যকর করে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় দুই ভিন্ন রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীকে নিয়ে যা ছিল কৃত্রিম রাজনৈতিক বন্ধন। উভয় অঞ্চলের মানুষ ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভিন্ন জীবন ধারায় অভ্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে কোন সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল না। উভয় অংশের মানুষের মাঝে যে বিষয়ে মিল ছিল তা হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা এই ধর্মের মানুষ কোন একক রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তৈরি করতে পারেনি। ধর্ম একটি কারণ কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয় যা মানুষকে একত্রিত করে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে জনগোষ্ঠী তারা সবদিক দিয়েই একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এমনকি উভয়ের মধ্যে ছিল ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং বিশ্বাসও। উভয়ের মাঝে কোন সম্প্রীতির বন্ধন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে নিজেদেরকে আশরাফ বা অভিজাত মনে করত।

১৯৪৭ সালের পূর্বে পূর্ব বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত বাঙালি হিন্দু ও অবাঙালি জৈন ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারীদের হাতে। যে কয়েকজন বাঙালি মুসলিম ঐ সময়ে বিত্তশালী ছিল তাদের ভেতর কয়েকজন চট্টগ্রামের সওদাগর যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিত্তবান হয়ে উঠে। কিন্তু ভারত বিভক্তির কারণে ১৯৪৭ সালের অব্যবহিতোপর পূর্ববাংলা থেকে অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু ও জৈন মাড়োয়ারী ব্যাবসায়ী ও পুঁজিপতি ভারতে চলে গেলে এদের স্থলাভিষিক্ত স্থানীয় বাঙালি মুসলমান না হয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় অবাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি। তবে উল্লেখ্য যে, এই সময় কিছু সংখ্যক স্বচ্ছল বাঙালি মুসলিম পরিবার বাঙালি হিন্দুদের পরিত্যাক্ত জমি-জমা ও বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে পূর্ববাংলার সমাজ কাঠামোয় প্রথম প্রজন্মের বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৭৯] হিন্দু ও মাড়োয়ারী পুঁজিপতিদের ঢাকা ত্যাগের ফলে বাঙালি মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী বিকশিত হওয়ার আরেকটি সুযোগ পায় ষাটের দশকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। ১৯৬৫ পর্যন্ত যে সামান্য সংখ্যক হিন্দু ও মাড়োয়ারী দেশে অবস্থান করছিল ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণভাবে ভারতে চলে যায় এবং তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সম্পত্তির সুযোগ গ্রহণ করে মূলত বাঙালি মুসলিম বিত্তশালী পরিবার।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে যে সকল মোহাজর ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছিল তাদের পরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রায় সবক'টি জেলায় একটি করে বিহারী কলোনী গড়ে তোলা হয়। কালেক্টরির গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের বসানো হয়। প্রতিটি জেলায় বিহারীদের স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলোতে বাঙালি কৃষকদের হটিয়ে ঐ সকল কৃষিক্ষেত্রে বিহারিদের মধ্যে বন্টন করা হয়। দিনাজপুরের রানীশংকাইল, ঘোড়াঘাট, বেনাপোল, ঝিকরগাছা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি সীমান্ত এলাকায় বিহারিদের কৃষিজমিসহ ঘরবাড়ি দেয়া হয়। মূলত, সীমান্ত এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিহারীদের হাতে। দুই বাংলার মানুষ যাতে এক হতে না পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষ এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগণ বিহারিদের স্থান দিতে চায়নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিজের শহর করাচীতেই বহু বাধার পরে বিহারীদের স্থান দেওয়া হয়।[৮১]

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে এক হিসেবে দেখা যায় ১৭৫০০০ জন পূর্ববাংলা থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারতে অভিবাসন গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী এক চতুর্থাংশ সরকারি চাকুরিজীবী। ছয় শতাংশ ভূ-স্বামী এবং চিকিৎসক ও আইনজীবীদের হার ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ।[৮২] প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী শ্রেণী ও শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণী ভারতে অভিবাসন গ্রহণের পর পূর্ব বাংলায় নব্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালি মুসলিম সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি মুসলিম সমাজ কাঠামোতে এই শ্রেণীর আবির্ভাব সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতির উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে হিন্দু ভূ-স্বামী ও ব্যবসায়ী সমাজের অনুপস্থিতিতে মুসলিম জোতদার ও ধনী কৃষক সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং পূর্ব বাংলার গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে তারা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে।[৮৩] পূর্ব বাংলার মানুষ যে সুযোগ সুবিধা আশা করেছিল তা তারা পায়নি। কারণ তাদের জায়গায় নতুন প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয় অবাঙালি গোষ্ঠী। শুধু চাকুরির ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা নয়, চাকুরি প্রদানের মালিক হয় তারা। এই অবাঙালিদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী এবং তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে। বিভাগ উত্তরকালে বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত যুবক পূর্বের তুলনায় চাকুরিতে বেশি সংখ্যক নিয়োগ লাভ করলেও নীতি নির্ধারণী ও উচ্চ পদগুলো লাভ করে অবাঙালিরা। পাকিস্তানের রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অবাঙালি-পাঞ্জাবীদের দ্বারা। পূর্ব বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের যারা ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী ছিলেন তাদের বেশির ভাগই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তারা বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে নেতৃত্বে আসেন। তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ছিল জনগণের উপর ভিত্তি করে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় ঢাকায় যখন গণআজাদী লীগ গঠন হয় তখন উদ্যোক্তাগণ ছিলেন বামপন্থী ভাবধারার।[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের নামে জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা হয়। সরকার উন্নত ধানের বীজ, সার ও কীটনাশক এবং পাওয়ার পাম্প ও নলকূপ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে ধনবাদী ধারা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এতে কিছু উৎপাদন বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তা সামঞ্জস্য না থাকায় গ্রাম-বাংলার সমাজে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। একদিকে পুরোনো সামন্তবাদী শোষণ অব্যাহতোথাকে আর অন্যদিকে ধনবাদী কায়দায় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ষাটের দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ কাঠামোয় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। উক্ত দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের কৃষি সমাজ কাঠামোয় দু'টি নতুন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দাতা দেশগুলোর পরামর্শে ধনবাদী কৃষি উন্নয়নের ফলে এক শ্রেণীর ধনী কৃষকের জন্ম হয় অন্যদিকে ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুর শ্রেণীরও সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪.৩ ভাগ, যা ১৯৬১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭.৫ ভাগ এবং ১৯৬৭ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত হয়।[৮৫] ১৯৬০-৬৪ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ পরিবার ও জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ ছিল সম্পূর্ণ দরিদ্র। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে এটি বেড়ে সম্পূর্ণ দরিদ্র পরিবারের শতকরা হার দাঁড়ায় ৮৪ ভাগ ও জনসংখ্যার হার দাঁড়ায় ৭৬ ভাগ। ষাটের দশকের মধ্যভাগে গ্রামের ২৫ ভাগ মানুষ কৃষি মজুরীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কৃষি মজুরীও ক্রমাগত কমতে থাকে। ১৯৫০ সালে যেখানে মাথাপিছু প্রতিদিন কৃষি মজুরি ছিল প্রায় ৩ টাকা কিন্তু এক দশক পরে ১৯৬০ সালে তা কমে গিয়ে মাত্র ২ টাকায় দাঁড়ায়।[৮৬]

অবাধ ধনবাদী পথে শিল্পোদ্যোগের নীতি গ্রহণ করার ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম পাকিস্তানে ২২টি বৃহৎ পুঁজিপতি পরিবার গড়ে ওঠে। পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশন প্রধান মাহবুবুল হকের হিসাব মতে এরা সমগ্র পাকিস্তানের ৬৬ ভাগ শিল্প সম্পদ'৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ ও ৭৯ ভাগ বীমা সম্পদের মালিক। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানিপুঁজিপতিদের শোষণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ১৯৫০ সালে ১৮ ভাগ থেকে ১৯৬৫ সালে ৩১ ভাগ ও ১৯৭০ সালে ৩৮ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৯ ভাগ কম ছিল সেখানে ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৭ ভাগে, ১৯৫৯-৬০ সালে ২৩ ভাগে ১৯৬৪ সালে ৩০ ভাগ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩৪ ভাগে পৌছায়।[৮৭]

ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে গণআন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার পরিবেশ পূর্ব থেকেই সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ
Dhaka University Institutional Repository
ভূ-স্বামী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী এলিট-শ্রেণী সমৃদ্ধ মুহাজির আমলাবর্গ এবং সেনাবাহিনী সব কিছুই কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এই শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক শ্লোগান তুলে পূর্ব বাংলাকে তাদের কাঁচামালের যোগানদার এবং পণ্য সামগ্রীর বাজারে পরিণত করে। বাংলার মুসলমান সমাজ যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার স্বপ্ন দেখেছিল তা এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়। বলা যেতে পারে দেশ ভাগের ফলে ক্ষমতা কাঠামোতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাংলার ঔপনিবেশিকীকরণের কারণ লুকিয়ে ছিল।[৮৮]

পিটার বারটোসী এ পরিস্থিতির পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন, "বাঙালি জনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জাতি গোষ্ঠীগুলির ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা সহজাত এবং ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।"[৮৯] স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ছয়মাস পরে পাকিস্তান গণপরিষদের একজন বাঙালি পরিষদের বৈঠকে ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[৯০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলা চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ববাংলা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে। নিম্নলিখিত খাতগুলিতে ঋণ ছিল:-

১। রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে;

২। প্রভিডেন্ট ফান্ড;

৩। বেসরকারি আমানতাদি;

৪। অনাদায়ি ট্রেজারি বিলসমূহ;

৫। খাদ্য ক্রয় খাতে ঘাটতি ও

৬। সরকারি চাকুরিজীবীদের পাওনাসহ চুক্তিগত দেনা।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকের এই পাওনা ও অবিভক্ত বাংলার অনাদায়ি ট্রেজারি বিল বাবদ যে দেনা ছিল তা পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমেই ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। কিন্তু অন্যান্য খাতের দেনা থেকেই যায় ফলে কার্যভার গ্রহণের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারকে বছরের পর বছর ধরে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। প্রাদেশিক রাজধানীর সদর দপ্তর সমূহের স্থান সংকুলানের জন্য বহু সংখ্যক দালান-কোঠা নির্মাণ করতে হয়। চারকোটি ১৯ লাখ লোকের বাসভূমি পূর্ব বাংলার রাজস্বখাতে ১৯৪৮-

Dhaka University Institutional Repository
৪৯ সালে বার্ষিক আয় ছিল ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। অপরপক্ষে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব বাবদ আয় ছিল প্রায় ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।[৯১]

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতা। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পদ শোষণের পশ্চাদভূমিতে পরিণত করা হয়। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্থনৈতিক শোষণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বাঙালিরা নিজেদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিকার না পাওয়ায় অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্বীকার হয়। পাকিস্তানিক্ষমতাসীন এলিটরা যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন তা দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিক শোষণের একটি কৌশলগত দিক হচ্ছে অধীনস্থ এলাকার অতিরিক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে ব্যবহার করা। পশ্চিম পাকিস্তানিশাসক শ্রেণী পূর্ব পকিস্তানের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ইতিবাচক ভারসাম্য সবসময় লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ভারসাম্য ছিল নেতিবাচক। প্রথমদিকে পাকিস্তান শুধুই কাঁচামাল এবং প্রাথমিক পণ্য সামগ্রী যেমন- পাট, তুলা চামড়া, পশম প্রভৃতি রপ্তানি করত। শিল্পায়নের ফলে প্রক্রিয়াজাতকৃত এবং তৈরী সামগ্রী যেমন তুলা, কাপড় এবং পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে। ষাটের দশকে যন্ত্রপাতি এবং বৈদেশিক সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য তৈরি সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে। ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় ৬০% রপ্তানি আয় করে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন বিনিয়োগ ছিল না। রপ্তানি আয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। ১৯৪৭-১৯৭০ পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানে আমদানি ব্যয়ে কোন সমতা রাখা হয়নি। আমদানি খাতে পশ্চিম পাকিস্তান ব্যয় করে ৯৩১২ মিলিয়ন ডলার অথচ রপ্তানি আয় হয় মাত্র ৪৪৪০ মিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি আয় হয় ৩৩৩৭০ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ব্যয় হয় ৪২১৭ মিলিয়ন ডলার। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়।[৯২]

নিম্নের সারণিতে দুই অঞ্চলের রপ্তানী বৈষম্যের চিত্র দেখান হলো [৯২ক]

সারণি-২২

বৎসর (জুলাই-জুন)	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি	পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি
১৯৪৭-৪৯	১.৪৪ কোটি রূপি	১৩.৭৬ কোটি রূপি
১৯৫৫-৫৬	২২.০৭ ,, ,,	৩১.৮৯ ,, ,,
১৯৬০-৬১	৩৫.৫৯ ,, ,,	৮০.০৫ ,, ,,
১৯৬৫-৬৬	৬৪.৯৭ ,, ,,	১১৮.৯৮ ,, ,,
১৯৬৭-৬৮	৭৭.৯০ ,, ,,	১২১.৬০ ,, ,,
১৯৬৮-৬৯	৪৬.৩৩ ,, ,,	৬৪.০৩ ,, ,,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর করাচীতে স্থাপন করা হয় নতুন পাকিস্তানের রাজধানী। এই রাজধানী উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় ২০০ কোটি টাকা। পরে রাজধানী স্থানান্তর করা হয় ইসলামাবাদে এবং এর জন্য ব্যয় করা হয় ২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী বলে খ্যাত ঢাকার জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্যালয়, দেশরক্ষা, সদর দপ্তর, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, বীমা কোম্পানিসমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলম্বো প্ল্যান ফোর্ট ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ সাহায্য ইত্যাদির অধীনে বিদেশে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য যেসব বৃত্তি দেওয়া হয় তার অধিকাংশ দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিগুলি এমনভাবে প্রণয়ন করা হতোযাতে পূর্ব পকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের জন্য একটি অধীন ও স্থায়ী বাজার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা যায়। মাথাপিছু আয়ের মধ্যেও পার্থক্য ছিল ব্যাপক। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে শতকরা ৩২ ভাগ বেশি ছিল। দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে শতকরা ৬১ ভাগ বেশি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাল আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম। পশ্চিম পাকিস্তানের চালের বাজার দর মণপ্রতি ১৮ টাকা, পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তা ৫০ টাকা। গমের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে ১০ টাকা, পূর্ব পাকিস্তানে ৬৫ টাকা।[৯৩]

ঋণদান প্রসঙ্গ

ঋণদানের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের স্বীকার হয়। ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান ঋণ পেয়েছে ৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে মাত্র ৪৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বিদেশি সাহায্যের খুব কমই পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ৬৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৮১ কোটি টাকা।[৯৪]

দেশরক্ষা

দেশ রক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দের চিত্র ছিল আরও নৈরাশ্যজনক। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ১৮ কোটি টাকা অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ৪৮০ কোটি

Dhaka University Institutional Repository

টাকা। অথচ দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা সবদিক দিয়েই সন্তোষজনক ছিল। উন্নয়ন এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন খাতের আয় বৃদ্ধির জন্য ১০ বৎসরে ৩০টি নতুন কর ধার্য করে। এছাড়াও সি.এস.পি. অফিসারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং গভর্নরকে বেশি সুযোগ সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কতিপয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ায় প্রাদেশিক সরকারকে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়।[৯৫]

১৯৪৮-৪৯ সালে রাজস্বের একমাত্র সম্প্রসারণশীল উৎস বিক্রয় কর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। রাজস্বের বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বার বার পুনর্বিবেচনার দাবি উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ সালে রেইসম্যান কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে। কিন্তু এই কমিটি প্রদেশকে সাহায্য না করে কেন্দ্রকেই জোরদার করে। পাট রপ্তানি শুল্কের অংশের ব্যাপারে এই কমিটি পূর্ব বাংলাকে ক্ষতি করে কারণ ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আয় ছিল যথাক্রমে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ও ৬ কোটি কিন্তু রেইসম্যান রোয়েদাদের পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৪ কোটি। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর জন্য মোট ব্যয়ের ৬০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে সম্মত হলেও এই অর্থ প্রদান করেনি। ফলে পূর্ববাংলার পাওনা হয় প্রায় ৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে বেসামরিক দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করার কথা। এক্ষেত্রে প্রদেশের পাওনা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই খাতটি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলে।[৯৬]

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এই চার মাস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংকটকাল হিসেবে বিবেচিত। এই সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে বন্যা এবং ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় আউশ, আমন ও রবিশস্য নষ্ট হয় এবং বহু জেলায় বহু গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। ফলে পাকিস্তানে কলেরা ও বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করে। ১৯৫৩ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৭৯২০ জন, ১৯৫৪ সালে ১০৯১২ জন, ১৯৫৫ সালে ১০০৭৫ জন ১৯৫৬ সালে ২০৭৯৯ জন, ১৯৫৭ সালে ১৬২৫০ জন ও ১৯৫৮ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১৯০৮৬ জন। এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন ছিল সাড়ে ১৩ কোটি টাকার অধিক। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে।[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সাহায্য

পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দুই অংশের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করে তা থেকে বৈষম্যের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সরাসরি সাহায্য দিয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানকে দিয়েছে ২৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলায় কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছিল। বাংলা প্রদেশের এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকার ৭০ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করে। এতে পূর্ব বাংলার প্রাপ্য হতোপ্রায় ৫০ কোটি টাকা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে বলেন, এই খাতে প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ মঞ্জুর করা হবে। [৯৮]

অর্থনৈতিক নীতি

১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অর্থনীতি বিষয়ক পঞ্চবার্ষিকী অনুষ্ঠানে দ্বৈত অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত অর্থনীতিবিদগণ এমনভাবে তাদের নীতি উপস্থিত করেন যাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশ পৃথক দুটি অর্থনৈতিক বলয় নিয়ে গঠিত। এই দ্বৈত অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রধান যুক্তি ছিল প্রথমত, পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে একক অর্থনীতি গড়ে তোলার যে অসুবিধা দেখা দেয় তা ছিল উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য দায়ি। দ্বৈত অর্থনীতির প্রবক্তাগণ মত প্রকাশ করেন যে, ভৌগলিক কারণে পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে উৎপাদন ব্যবস্থা স্থানান্তরযোগ্য নয়। এর অর্থ এই দাড়ায় যে এক অঞ্চলের বিনিয়োগ অন্য অঞ্চলের উপর প্রভাব ফেলবে না।[৯৯] এছাড়া দুই অঞ্চলের মধ্যে অবকাঠামোগত পার্থক্য বিরাজমান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল ব্যাপক উৎপাদনক্ষম এবং ব্যক্তিগত মূলধন নির্ভর। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর অর্থনীতি কৌশলগত কারণে উভয় অঞ্চলের জন্য পৃথক অর্থনীতির প্রয়োজন ছিল। বাণিজ্যিক অসাম্য, মূল্যের অসমতা দুই অঞ্চলের অর্থনীতিকে পৃথক করেছে। তাদের মতে, একক অর্থনৈতিক কৌশল অবলম্বন করলে এক অঞ্চল থেকে সম্পদ অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে। একক অর্থনীতির প্রবক্তাগণ পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে " Economic Efficiency বলে অভিহিতোকরেছেন।[১০০] তাঁদের মতানুসারে যে অঞ্চলে চাহিদা বেশি এবং ধারণ ক্ষমতা বেশি সেই অঞ্চলে বিনিয়োগ বেশি করতে হবে। দ্বৈত অর্থনীতির প্রবক্তাগণ এই নীতির বিরোধিতা করে বলেন, এতে পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হবে যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হবে। এই নীতি পূর্ব পাকিস্তানে কোন উন্নয়ন ঘটাবে না। তারা দাবি করেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

উভয় অঞ্চলের অর্থনীতিকে পৃথক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং পৃথক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তাদের মতে, সার্বিকভাবে না হলেও রাজস্ব প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর স্ব স্ব-নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ রাজনীতিবিদদের সাথে যৌথভাবে দ্বৈত অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানালেও সরকার তা নাকচ করে দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এতে দুই অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। জনগণ দ্বৈত অর্থনীতিকে সমর্থন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির ফলে বাঙালি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী চরম বৈষম্যের শিকার হয়। তাদের ধারণা ছিল এতে ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিতোকরা হবে কিন্তু এর দ্বারা বাংলার স্বল্প সংখ্যক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বাস্তবে কোন উন্নতি হয়নি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের কাছে হেরে যায়। জাতীয় সংসদের একজন সাংসদের বক্তব্য থেকে এই বিষয়ে নিম্নলিখিত ধারণা পাওয়া যায়।

> How can capital be formed in East Pakistan? When the government decided to give more and more to East Pakistan in the import trade as you know in the import trade East Pakistan are not categorical importers they decided that there should be OGL (Open General License) importers and the OGL System was introduced and East Pakistanis were allowed to import and they were registered as importers. But as soon as the authorities found that East Pakistanis are coming and becoming importers and trying to form small capitals, they over night abolished the system of OGL and brought free list. Sir, it is open to everybody that East Pakistanis have very small capital. They cannot compete in free list. They cannot compete with the big industrialists in East Pakistan, you will find that not even a single chamber will be able to come and stand for this system of free list because the system of free list has completely damaged the economic backing and background of the commercial community of East Pakistan. [১০১]

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য একই অর্থনীতি চালু রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী অর্থনৈতিক একতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক একীভবন, অর্থনীতির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ একীভূতকরণ শব্দগুলির ব্যবহার অব্যাহতোরাখে। [১০২] অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদরাও দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। ফলে দুই অঞ্চলের স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository
অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে অর্থনীতিবিদরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। আইয়ুব খানের সময়ে দুই অর্থনীতির তত্ত্ব প্রবল হয়ে উঠে। কারণ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন দুই অর্থনীতির অর্থ দুই পাকিস্তান। [১০৩]

১৯৬৪-৬৫ সময়ে উভয় অঞ্চলের বিদেশে রপ্তানিকৃত পণ্যের বৈষম্যের চিত্র ছিল নিম্নরূপ

পাট ও পাটজাত পণ্য: (সবটাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে) ১২৪৫০০ মি. রুপি

সুতা ও সুতার তৈরি পণ্য: (প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে) ৪১৮৮০ মি. রুপি

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য: (পূর্ব পাকিস্তান থেকে) ৬১৩০ মি. রুপি

চা : (সবটাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে) ১০০০ মি. রুপি

পশম/উল : (সবটাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে) ৭৩০০ মি. রুপি

অন্যান্য : (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) ৫৬২০০ মি. রুপি [১০৪]

অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে H. Papanek বলেনঃ " The issue of economic disparity between East and West Pakistan is deeply bound up with the problem of an imbalance in political power. The absence of Bengal is Particularly notable at the top. Among the 29 largest houses families there are two Bengalis near the bottom of the list. In a study carried out in 1959-60, it was revealed that the Bengali Muslims owned and controlled only 2.5 percent. Bengali Hindus 8.5 and Marwaris, other Hindus and Shikhs another 3.5 percent. By control, nearly half of all industrial assets were owned or controlled by members of business communities of West Pakistan or West Indian origin. [১০৫] শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের ধারণাটি পূর্ব বাংলার জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র নিম্নের সারণি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

সরকারি ব্যয়ের অঞ্চল ভিত্তিক বণ্টন এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ১৯৫০-৭০ (মি. রুপি)। [১০৫ ক]

সারণি-২৩

১. সরকারের চলতি ব্যয়	১৯৫০-৫৫	১৯৫৫-৬০	১৯৬০-৬৫	১৯৬৫-৭০
ক) পূর্ব পাকিস্তান	১৭১০	২৫৪০	৪৩৪০	৬৪৮০
খ) পশ্চিম পাকিস্তান	৭২০০	৮৯৮০	১২৮৪০	২২২৩০
২. সরকারি উন্নয়ন ব্যয়				
ক) পূর্ব পাকিস্তান	৭০০	১৯৭০	৬৭০০	১১০৬০
খ) পশ্চিম পাকিস্তান	২০০০	৪৬৪০	১০০১০	১৩৭০০
৩. বেসরকারি উন্নয়ন ব্যয়				

Dhaka University Institutional Repository

ক) পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	৭৩০	৩০০০	৫৫০০
খ) পশ্চিম পাকিস্তান	২০০০	২৯৩০	১০৭০০	১৬০০০

১৯৫২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত ১৩ জন সচিবের সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী, আর ১৬ জন যুগ্ম সচিব ও ৫৯ জন উপসচিবের ভেতর বাঙালির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ জন ও ৪ জন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিপরীতে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার পূর্ব বাংলার ছিল মাত্র ২ হাজার ৯শ জন। বেতন হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি চাকুরিজীবীরা পেতেন ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর পূর্ব বাংলার চাকুরিজীবীরা পেতেন মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হার ছিল আরও বৈষম্যমূলক। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয় মাত্র ১০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা খাত ছাড়াও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পশ্চিম পাকস্তানে ৭৯০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।[১০৬] পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই বিশাল বৈষম্যের কারণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকস্তানের রাজনীতি সচেতন ছাত্র ও শিক্ষিত পেশাজীবী গোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিশাসকবর্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস চালায় এবং যার পরিণতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভুত বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠে।

চাকুরি ক্ষেত্রেও বিরাট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। সিভিল সার্ভিস সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রে বাঙালিরা বঞ্চনার শিকার হয়। বেশির ভাগ বিনিয়োগ কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় তারাই এর সুযোগ গ্রহণ করেন। আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চাকুরির প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নের সারণিতে দেখান হলো:[১০৬ক]

সারণি-২৪

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
ফরেন সার্ভিস	৮৫%	১৫%
ফরেন হেড মিশন (সংখ্যা)	৬০	৯
সেনাবাহিনী	৯৫%	৫%
সেনাবাহিনী: সাধারণ পদের অফিসার (সংখ্যা)	১৬	১
নেভী টেকনিক্যাল	৮১%	১৯%
নেভী নন-টেকনিক্যাল	৯১%	৯%
বিমান বাহিনী পাইলট	৮৯%	১১%

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীর সংখ্যা	৫০০০০০	২০০০০
পাকিস্তান এয়ারলাইন্স (সংখ্যা)	৭০০	২৮০
পি.আই.এ. পরিচালক (সংখ্যা)	৯	১
পি.আই.এ. এরিয়া ম্যানেজার (সংখ্যা)	৫	১
রেলওয়ে বোর্ড ডিরেক্টরস	৭	১

উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকায় ১৯৬৭ সালের ২৭ অক্টোবর বিশ্বব্যাংকের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট মি: জর্জ উডস গত বিশ বছরের উন্নয়ন সাহায্য, সাহায্য দাননীতির সাফল্য, ত্রুটি ও ফলাফল পর্যালোচনার জন্য কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৮ সালের ১৯ আগস্ট কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মি.এল.বি. পিয়ার্সনকে চেয়ারম্যান করে বিশ্বব্যাংকের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মি. রবার্ট ম্যাকমারা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ আরো সাতজন ছিলেন। কমিশন ১৯৬৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। পিয়ার্সন কমিশন পাকিস্তানের সরকারি হিসাবপত্র থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বিশেষ করে আইয়ুব খানের শাসনামলের সরকারি তথ্য থেকে। এই ক্ষেত্রে কমিশন পাকিস্তানের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের টাকার ন্যায্য অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্যের চিত্রটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে: দেশটির অভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে দু'অঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যই রাজনৈতিক বিরোধ ও স্থিতিহীনতার কারণ হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির সরকারি প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার করার সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রদেশের আবহাওয়া এবং ছোট ছোট কৃষি ফার্মের উপযোগী করে ধান ও পাট উৎপাদনের আধুনিক কারিগরী বিদ্যা প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। অধিকন্তু সব চাইতে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই অর্থ, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। এর অর্থ হবে পশ্চিম পাকিস্তানের পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যয় হ্রাস এবং সেখানকার সামগ্রিক উন্নয়ন হার কমিয়ে ফেলা। তা না হলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপেক্ষার ফল বিপজ্জনক হবে।[১০৭]

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত এইডের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে বৈষম্য তা সারণিতে দেখানো হলো [১০৭ক]

সারণি-২৫

সাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৯-৬০	৩.৪	৩১.২
১৯৬০-৬১	৪.১	২৩.৭
১৯৬১-৬২	১.০	২৪১.২

Dhaka University Institutional Repository

সাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬২-৬৩	২১.৫	২২২.৩
১৯৬৩-৬৪	৪২.৬	২১৯.২
১৯৬৪-৬৫	৫১.৬	২২২.৪
১৯৬৫-৬৬	৩৬.৫	১৯২.৯
১৯৬৬-৬৭	৪৪.৫	১৬১.৩
১৯৬৭-১৯৬৮	৩.৭	১৪৮.৪

১৯৬৫ সালে সতেরো দিন ব্যাপী ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রাখা হয় অথচ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অংকের ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের উপর। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পঁচিশ বছরে বাংলাদেশ পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল বিক্রির বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু বৈদেশিক ঋণের ১৪ আনা খরচ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু তার দায় চাপানো হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনা সমাপ্ত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক সামান্য পানি সেচের উন্নত ব্যবস্থা করা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তান তার সংলগ্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য সুবিধা গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে তার সংলগ্ন প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার সাথে রাজনৈতিক বিরোধের অজুহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুবিধা গ্রহণ করতে দিতে রাজী হয়নি। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও খালের পানি সমস্যার মীমাংসা চুক্তি করতে পশ্চিম পাকিস্তানের আপত্তি নেই অথচ আপত্তি দেখা যায় বাংলাদেশের বন্যানিয়ন্ত্রণে ভারতের সহযোগিতা গ্রহণে। জাতিসংঘের পিয়ার্সন রিপোর্টেও স্বীকৃত হয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা। সেখানে বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে গভীর নলকূপের সাহায্যে সবুজ বিপ্লব ঘটানো হয়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি।[১০৮] কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পকে সুপরিকল্পিতভাবে যে ধ্বংস করে তা নিম্নের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়-

পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূল ও কক্সবাজারে লবণ উৎপাদিত হতো। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৫ মণ। ১৯৫৯ সালে পূর্ব বাংলার গভর্নর জাকির হোসেনের প্রচেষ্টায় লবণের উৎপাদন বেড়ে যায়। পূর্বে সমুদ্রের পানি আগুনে জ্বালিয়ে লবণ তৈরি করা হতো এবং ১৯৪৯ সালে এই পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং এরপর লবণ তৈরি হয় সমুদ্র থেকে পানি ড্রেন করে এনে এক জায়গায় জমা করে রেখে শুকিয়ে আবার জমি রোলার (Ruller) দিয়ে সমান করে লবণাক্ত পানি চুইয়ে দিয়ে। প্রখর রৌদ্র ছাড়া লবণ হয় না। এটাকে লবণ শিল্প না বলে লবণ চাষ বলা হয়। এই কাজে নিয়োজিত ছিল যারা দিন আনে দিন খায় এমন দিনমজুর নারী-পুরুষ মিলে সারাদিন পরিশ্রম করে লবণ উৎপাদন করে। এদের নিজস্ব কোন জমি ছিল না। কিন্তু লবণের উৎপদন বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ট্যাক্স বসানোর কথা বলেন কিন্ত প্রাদেশিক সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাতিল করেন, কারণ তিনি সরাসরি কক্সবাজারে গিয়ে দেখেন এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত তারা খুবই দরিদ্র এবং লবণের উপর ট্যাক্স বসালে লবণ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে এবং গরীব মানুষ মারা যাবে। গর্ভনর জাকির হোসনের সময়ে ট্যাক্সের কথা উঠলেও পরে তা বাতিল করা হয়। তিনি ৩০০ মনের উপর যে ট্যাক্স বসানোর কথা বলে তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫০০০ মণ করা হয়। বলা হয় ১৫০০০ মণ উৎপাদন করলে প্রতিমণের জন্য আড়াই টাকা(duty) দিতে হবে। তবে এখানে ১৫০০০ মন লবণ উৎপাদন করার মতো লোক ছিল না।

সমুদ্র উপকূলে যেখানে লবণ উৎপাদন হতো সেখান থেকে মানুষের চলাচলের রাস্তা প্রায় ১৪ থেকে ১৭ মাইল দূরে ছিল। ছোট ছোট সাম্পান নৌকায় করে লবণ আনা হত। লবণ উৎপাদিত হতো মূলত পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই পাঁচ মাস। অর্থাৎ বছরের প্রায় ছয় মাস লবণের উৎপাদন সম্ভব হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪ জন লবণ শিল্প মালিকের অধীনে কাজ করত ৭০০০ জন শ্রমিক এবং পূর্ব পাকিস্তানে শুধু চট্টগ্রামেই কাজ করত ৫০০০০ জন শ্রমিক। সমদ্র উপকূলে পূর্ব পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। লবণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (EPSIC) ১৪ জায়গায় লবণ উৎপাদনের জন্য বন্দোবস্ত দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৩৭ জন অফিসার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার তাদের মধ্যে ৮৮ জনকে ছাঁটাই করে দেয়। এই বিষয়ে স্বয়ং সরকারি সংবাদপত্র 'পয়গামে' বলা হয়– "পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণের চাহিদা বৎসরে প্রায় ১ কোটি মন। তার মধ্যে ১৯৬৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩ লক্ষ মন লবন আমদানী করা হয়। অবশিষ্ট লবণ প্রদেশে উৎপাদন করা হয়। লবণের ক্ষেত্রে প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। উহার ফলে জনসাধারণ যেমন সস্তায় প্রয়োজনীয় লবণ পাবে তেমনি উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও কর্মচীর হিসেবে বহু লোকের ভরনপোষনের ব্যবস্থা হবে।" EPSIC'র চেয়ারম্যান করাচী ও রাওয়ালপিন্ডি ঘুরে এসে এক আদেশ জারি করে ৮৮ জন কর্মচারিকে ছাঁটাই করে দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের লবণের উপর ট্যাক্স ধার্য ও কর্মচারি ছাঁটাইয়ের ঘটনায় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানের লবণ শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য সরকার পরিকল্পিতভাবে এসব করেছে। এছাড়াও প্রাদেশিক সরকার করাচী থেকে লবণ আমদানির কোটা ৩০ লক্ষ মন থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি মণ করার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান যাতে লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সরকার সেই ব্যবস্থাই করে। পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প কুটির শিল্প হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃহৎ শিল্প। ১৯৫২ সালে লবণের সের হয়েছিল ১৬ টাকা। ১৯৬৫ সালে মে মাসে জলোচ্ছ্বাসে লবণ উৎপাদনকারীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ লবণ উৎপাদনে খরচ হতো মোট ৮ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১ টাকা । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের

Dhaka University Institutional Repository
বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিড়ি শিল্প, লবণ শিল্প, তাঁত শিল্প ও পাটশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। [১০৯]

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঋণ বন্টনে বৈষম্য

কেন্দ্রীয় ঋণ দান সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত ঋণের টাকা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (IDBP), পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন (PICIC), হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (HBFC), এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (ADBP) থেকে প্রাপ্ত টাকা বন্টনে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের তালিকায় ঋণ বন্টনের বৈষম্যের চিত্রটি তুলে ধরা হলো : [১০৯ক]

সারণি-২৬

	PICIC	IDBP	ADBP	HBFC
পূর্ব পাকিস্তান	৮৪০ রুপি	৯২২ রুপি	৫০৮ রুপি	২২৬ রুপি
পশ্চিম পাকিস্তান	১৭৯৮,,	১০৩৪,,	৬৬২,,	৩৩১ ,,

রাজস্বখাতে ব্যয়:

পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের রাজস্বের বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫০-৭০ সাল পর্যন্ত দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ২৩% ব্যয় করেছে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য। নিম্নের সারণিতে রাজস্ব ব্যয়ের বৈষম্য চিত্র তুলে ধরা হলো : [১০৯-খ]

১৯৫০-৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট রাজস্ব ব্যয়
সারণি-২৭

সময়কাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	১৭১০	৭২০০
১৯৫৫-৬০	২০৪০	৮৯৮০
১৯৬০-৬৫	৪৩৪০	১২৮৪০
১৯৬৫-৭০	৬৪৮০	২২২৩০
১৯৫০-৭০ মোট	১৫০৭০	৫১২৫০

আইয়ুব খানের শাসনামলে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় তাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে সচেতনতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে উপেক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে চরম জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিবর্তনের ধারায় বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। পোস্টারের মাধ্যমে বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয় তা নিম্নের সারণিতে দেখান হলো : [১০৯গ]

সোনার বাংলা কেন গোরস্থান?

সারণি-২৮

বৈষম্য খাত	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব ব্যয়	১৫০০ কোটি রুপি	৫০০০ কোটি রুপি
উন্নয়ন ব্যয়	৩০০০ ,,	৬০০০ ,, ,,
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
আমদানি	২৫%	৭৫%
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
চাউল প্রতি মন	১০ রুপি	২৫ রুপি
আটা প্রতি মন	৩০ ,,	১৫ ,,
ভোজ্য তেল প্রতি সের	৫ ,,	২.৫০ ,,
সোনা প্রতি তোলা	১৭০ ,,	১৩৫ ,,

১৯৪৯-৫০ আর্থিক বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পূর্ববাংলার জিডিপি বা উৎপাদন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশি ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামান্য কিছু বেশি। তাই পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ১৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে মাথাপিছু আয়ের এই পার্থক্য বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় যখন দুই দশকে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত ২৯৩ থেকে ৩২১ টাকায় উন্নীত হয় তখন পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ৩৪২ টাকা থেকে ৫৪৬ টাকায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক উৎপাদন বা জিডিপি ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত দু'দশকে ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২২৭১ কোটি টাকা। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন ১২০০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৩১৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এই বৈষম্যের মুখ্য কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিশাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শাসন; বস্তুত এই দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তানকে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের (Primitive Capital Accumulation) কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ধরণের শিল্পায়ন ও কৃষি সমৃদ্ধি ঘটান হয়। [১১০]

১৯৫০-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ২০ শতাংশ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে এই বরাদ্দ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

বেড়ে যথাক্রমে ২৬, ৩২ ও ৩৬ শতাংশে দাড়ায় এবং কোন সময়েই এর পরিমাণ ৪০ শতাংশের বেশি অতিক্রম করেনি। ১৯৬০-৭০ দশকে পরিকল্পনা বহির্ভূত যে বিপুল অংকের সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় তারও সিংহভাগই ব্যয় করা হয় সিন্ধুনদের জলসম্পদকে ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের গতি সঞ্চার করতে, শিল্পের জন্য, বিদ্যুতের উৎপাদন বহুগুণ বাড়াতে এবং কৃষির জন্য ব্যাপক অঞ্চলে জলের যোগান নিশ্চিত করতে। উন্নয়ন ও উন্নয়ন বহির্ভূত রাজস্বখাতে এই বিশাল বিনিয়োগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যুৎ শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোকে যে বিশাল অগ্রগতি সাধিত হয় তার ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নের পথ সুগম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ও পাকিস্তান শিল্পউন্নয়ন ব্যাংক নামে দুটো প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৬১-৬৭ সময়কালে প্রথম করপোরেশনটির বিনিয়োগ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ ও ৬৯ কোটি ৭ লক্ষ অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে এই প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তিনগুণ বেশি। বৈদেশেক সাহায্য বা ঋণের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্তি বা বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ। ১৯৫০-৭০ এই দুই দশকে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের খরচ করা হয় ১৯৪.২ কোটি ডলার, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয় ৪৫৫.৮ কোটি ডলার।[১১১]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করলে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যে দুটি সাহিত্য সংগঠন স্থাপিত হয়– একটি কলকাতায় অপরটি ঢাকায়। কলকাতার সাহিত্য সংগঠন রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২) নামে পরিচিত। রেঁনেসা সোসাইটির আহবায়ক ছিলেন মুজিবুর রহমান খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ। আর সাহিত্য সংসদের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং সৈয়দ আলী আহসান। রেনেসাঁ সোসাইটির লক্ষ্য ছিল জাতীয় রেনেসাঁয় উদ্ধুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য রচনা, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননশীল আলোচনা করা ও সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহতোকরা। সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বলতে তারা বোঝাতে চাইতেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলমানদের জীবন ভিত্তিক, আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দবহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করা এবং সংস্কার করে নতুন বাংলাভাষা নির্মাণ করা।[১১২] সাহিত্য সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হতো তিনটি লক্ষ্যে ১। ইসলামের প্রবাহমান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ ২। অধুনা অপাংতেয় মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এবং ৩। পূর্ব পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রাম্য জীবনকে আরো বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা।[১১৩] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের অধিকতর রক্ষণশীল অংশ পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে তারা রেনেসাঁ সোসাইটি ও সংসদের নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে অব্যাহতোপ্রয়াস চালিয়েছে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। তাদের সুপরিকল্পিত হামলার শিকার হয় প্রথম বাংলা ভাষা। তবে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকেই। যেমন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে মত ব্যক্ত করেন।[১১৪] এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে জনসাধারণ এবং শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করার জন্য দৈনিক আজাদ পত্রিকায় পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা সমস্যা প্রবন্ধে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন: "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের কোন প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন যেমন- পুশ্‌তু, বেলুচী, সিন্ধী এবং বাংলা কিন্তু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা রূপে উর্দু চালু নয়। যদি বিদেশিভাষা বলিয়া ইংরেজি পরিত্যাক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের ভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলাভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।" [১১৫] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রবন্ধটির শেষে বলেন: "বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আমি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতিবিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।"[১১৬]

১৯৪৭ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা করেন। সরকারের এই প্রচেষ্টার প্রধান সমর্থক ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অবাঙালি শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ও চট্টগ্রামের 'হরফুন কোরআন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা মওলানা জুলফিকার আলী। মওলানার মতে মুসলমানদের শিক্ষা কোরআন মাজীদে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার মাধ্যমে হওয়া উচিত। তিনি আরবি বর্ণমালায় লেখা বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতেন যাতে এভাবে বাংলা লেখা ও পড়া সহজ হয়ে যায়। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় বহু যুক্তাক্ষর থাকায় মুদ্রার ও সাঁটলিপিতে নানা অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালা ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা আছে। তাছাড়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক আরবি বর্ণমালার সাথে পরিচিত। আরবি বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সংহতোকরা সহজতর হবে।[১১৭]

E:\k03-02-2012\1-5.doc 13-01-12.doc

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ছাত্র এবং অধ্যাপকদের নিয়ে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে প্রথম থেকে সক্রিয় ছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বা উর্দু ? শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এর লেখক। *তমদ্দুন মজলিসের* পক্ষে ভাষা বিষয়ে একটি প্রস্তাব করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম। তিনি বলেন, ইংরেজরা একসময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেইভাবে কেবলমাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোন কোন মহলে সেই প্রচেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহতোকরার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে তিনি দাবি করেন, লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সাবভৌমত্বের কথা বলা হয়েছিল কাজেই তাদের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই অধিকার ও তাদের দিতে হবে। [১১৮]

১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের *তমদ্দুন মজলিসের* পুস্তিকায় উল্লেখিত বিষয় ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলা ভাষাই হবে:

ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন

খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা

গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা

২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি– উর্দু ও বাংলা

৩. ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের একশত জনই শিক্ষা করবেন।

খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু উর্দুভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হবে।

গ) ইংরেজি হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানে কর্মচারি হিসেবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরি করবেন যারা উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষায় নিয়োজিত হবে তারাই শুধু ইংরেজি শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে হাজারে একজনের বেশি হবে না। ঠিক একই নীতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে সেখানকার স্থানীয় ভাষা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা আর ইংরেজি ভাষা ৩য় স্থান অধিকার করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বছরের জন্য ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতোমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।[১১৯]

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকাতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারি বাসবভন বর্ধমান হাউসে। এইসভায় ছাত্রদের সঙ্গে বেশ কিছু শিক্ষক বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মওলানা আকরাম খানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বর্ধমান হাউস ত্যাগ করেন। *তমদ্দুন মজলিসের* পক্ষ থেকে আবুল কাশেম ও আবু জাফর শামসুদ্দিন আকরাম খানের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা করেন।[১২০] উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে কলকাতার পত্রিকায় ফর্‌রুখ আহমদ, আব্দুল হক, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক চিঠিপত্র ও প্রবন্ধের আকারে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে থাকেন। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী বানান সংস্কারের চেষ্টা চালাতে থাকেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফর্‌রুখ আহম্মদ, আবুল কাশেম, আবুল মনসুর আহমদ, শাহেদ আলী, মিজানুর রহমান, ইব্রাহিম খান, খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন প্রমুখ। আজাদ গোষ্ঠীর অনেক বুদ্ধিজীবীই ছিলেন আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা প্রচলনের পক্ষপাতী। সৈয়দ আলী আহসান, শওকত ওসমান এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা প্রচলনে উৎসাহিতোকরেন।[১২১] ১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর শিল্পী জয়নুল আবেদিনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এতে সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। এই সভায় *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ শরফুদ্দিন, আবুল কাশেম, মনসুর উদ্দিন এবং সাহিত্যিক আবুল হাসনাৎ, সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দিন প্রমুখ বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তদানীন্তন সচিব গুড ইন ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সার্কুলার পাঠান। এতে ৩১টি বিষয়ের মধ্যে ৯টি ছিল ভাষা সম্বন্ধীয়। পাকিস্তানের অধিকাংশ বাঙালির ভাষা বাংলা হলেও সেখানে বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। অধ্যাপক আবুল কাশেম কলকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদে এবং আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদকীয়তে তীব্রভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এই আশংকায় বিভিন্ন পেশার কয়েক শত নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি ১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করেন।[১২২] ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার আবরণে উর্দুকে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও প্রস্তাব করে যে:

১। বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক;

২। রাষ্ট্রভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া ও বাংলাভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।[১২৩]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদ অধিবেশনে পরিষদে ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সমান মর্যাদার দাবি উত্থাপন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।[১২৪] তিনি বলেন: রাষ্ট্রভাষা সেই ভাষায়ই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে এবং আমি মনে করি যে, বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রের লিংগুয়া ফ্রাংকা যদি ২৯নং বিধিতে ইংরেজি ভাষা সম্মানজনক স্থান পেতে পারে যদি পরিষদের কার্যাবলী উর্দু অথবা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে চলতে পারে তাহলে বাংলা যা চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের ভাষা কেন সম্মানজনক স্থান পাবে না? কাজেই এ ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এ ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষারূপে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি যে, ২৯নং বিধিতে ইংরেজি শব্দটির পরে অথবা বাংলা কথাটি যোগ করা হোক।[১২৫]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বিরোধী দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ঘোষণা করেন–

"Pakistan is a Muslim State and it must have its lingua, Franca, the language of the Muslim nation the moves, who was a congress member. D.N. Datta/ Should realize that Pakistan has been created because of a demand of hundred million Muslims in this subcontinent and the language of a hundred million muslims is urdu. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.[১২৬]

৪ মার্চ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে *সাপ্তাহিক নওবেলাল*-এর সম্পাদকীয়তে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়: "পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাদের সংস্কৃতি, তহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ন থাকবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান, তাদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার

Dhaka University Institutional Repository
উপায় নাই। যদি এক ভাষার আধিপত্য অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি নষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের ভাষার মর্যাদার হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকটি বলে, 'সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলের গভর্নমেন্টের কারেন্সী নোটেও বাংলাভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনি অর্ডার ফরম, ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড ইত্যাদিতে বাংলার স্থান নাই।'

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উক্তি সম্পর্কে *নওবেলাল* বলে: 'এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্রানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী যে, অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছে তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহতোহইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এইসব অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এই সব ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।'

খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে বলা হয়: এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খান যেসব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য তাহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তান বাসীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। খাজা সাহেবের পারিবারিক ভাষা উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায় এই তথ্য কোথায় অবিষ্কার করলেন?

গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যদের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি বলে– "এইভাবে আপনারা মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারাঘাত করিতেছেন তাহারা কি একবারও ভাবিয়াই দেখেন না যে, ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ আদর্শ প্রভৃতি রূপ পাইয়া থাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কোন এক বিশেষ প্রভাবে পড়িয়া তাহারা হয়ত আপনাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারেন তবে পূর্ব পাকিস্তানের চারকোটি চল্লিশ লক্ষ লোক কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা বাংলার অবমাননা সহ্য করিবে না। তাই ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছে এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই নয় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। এই গণবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এই সব নেতাদের আসন টলটলায়মান হইয়া পড়িবে।"

Dhaka University Institutional Repository
সর্বশেষে পাকিস্তানের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখার আ্যাবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "তাই পূর্বাহ্নেই আমরা কর্তৃপক্ষ মহলো কে অনুরোধ করিতেছি যদি পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের মনে এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাদের কর্মের সংশোধন করুন। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করুন। তাহা না হইলে স্বাভাবতই পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোকেরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলাকে আস্তে আস্তে তার ন্যায্য আসন হইতে সরাইয়া ফেলা হইতেছে।" [১২৭]

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকেই পূর্ব পাকিস্তানে সরকারিভাবে উর্দুভাষা ব্যবহারের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ছাপা হাতে থাকে। সচিবালয়ে উর্ধ্বতন অবাঙালি কর্মচারিরা ইচ্ছা করেই উর্দুতে ফাইলের নোট লেখা শুরু করে। বাঙালি কেরানিরা আপত্তি তুললে তাদের উর্দু শিখে নিতে বলা হয়। ঢাকা শহরের শতকরা ৯০ ভাগ দোকানপাট ছিল অবাঙালিদের এবং তারা উর্দুতে সাইনবোর্ড লাগায়। পোস্ট অফিসে উর্দু-ইংরেজি এমনকি বিচারালয়গুলিতে ও হঠাৎ করে উর্দুর প্রভাব দেখা যায় ফলে বাঙালিদের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম নেয়। শুধুমাত্র বাংলাভাষা মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় টান শুধু নয় বা বাঙালি জাতীয়তার অস্তিত্বেও আশংকায় নয় চাকুরি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাই বাঙালির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়ায়। [১২৮]

কামরুদ্দিনের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের শুরুতেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ৭ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট এবং ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট দেওয়া হয়। ধর্মঘট চলাকালে সেক্রেটারিয়েটের সামনে থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে ও দেশের অন্যান্য স্থান থেকে শামসুল হক, অলি আহাদসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এইদিন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি সার্বিক সংগ্রামে পরিণত হয়।[১২৯] পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে ১৫ মার্চ ১৯৪৮ সালের আট দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে দমননীতি প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করা এবং সংবাদ পত্রের উপর থেকে নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়।

চুক্তিসমূহ

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হতে বাংলাভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository
৩. ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হয়েছে সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্টভাষা করবার এবং ইহাকে পাকিস্তান পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এইমর্মে একটি প্রস্তাবন উত্থাপন করা হবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ই ইংরেজি উঠিয়ে যাওয়ার পরই বাংলা তার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজগুলিভে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হবে।

৫. আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭. ২৯ ফেরুয়ারি হতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে সেখান হতে তাহা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিসন্দেহ হয়েছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[১৩০]

ভাষার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে স্মারকলিপি

১ম, ২৪ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যুবকদের নিয়ে গঠিত এই কর্ম পরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমত তাহারা মনে করে যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তানের জনগণের রাষ্ট্র হওয়ায় অধিকাংশ লোকের দাবি মানিয়া লওয়া উচিত।

২য়, আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি দেশের নাম করা যায়: বেলজিয়াম, (ফরাসি ও ফ্লেমিংভাষা), কানাডা (ফরাসি ও ইংরেজি ভাষা), সুইজারল্যান্ড (ফরাসি, জার্মানি ও ইটালি ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজি ও আফ্রিকান ভাষা) মিসর (ফরাসি ও আরবি ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজি ভাষা), এতদ্ব্যতীত সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে।

৩য়, এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ, আলাওল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসীমউদ্দিন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের তাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এইভাষাকে সমৃদ্ধিশালী

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছে। ৫ম, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ, সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবি ভাষা হতে নেওয়া। যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলাভাষার জন্য এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া যাইবে।[১৩১]

১৯৪৯ সালের ৪ মার্চ ফজলুল হক মিলনায়তনে *তমুদ্দিন মজলিস*-এর সাহিত্য শাখার উদ্যোগে পূর্ববাংলার 'হরফ সমস্যা' এবং সোজা বাংলা প্রবতর্ন সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক আব্দুর রহমান খান এবং 'সোজা বাংলার' উপর ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ নেন কাজী মোতাহার হোসেন ও সৈনিক সম্পাদক শাহেদ আলী। আলোচনায় হরফ নির্ধারহৈর দায়িত্ব ভাষা বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়ার দাবি করা হয় এবং শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। [১৩২] এই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। 'পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্য আরবিহরফের যে সুপারিশ করিয়াছেন একমাত্র বাংলার উপরই আঘাত তীব্র এবং ব্যাপকভাবে পড়বে। হরফ পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে শিক্ষা সুবিস্তারকে ব্যাহতোকরিবার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাংলাকে আরবিহরফে লিখিত হইলে নতুন যে প্রতীকগুলি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা শিখিবার জন্য একজন আরবিজানা লোকের যে পরিমাণ শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক কম শ্রমে ও অধ্যবসায়ে বাংলা হরফ শিক্ষা সম্ভব। বাংলাকে আরবিহরফে লিখিলেই উহার সহিতোআরবিহরফ জানা লোকের পরিচয় স্থাপিত হইবে না। [১৩৩]

বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করে স্মারকলিপি

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে স্মারকলিপিতে বলেন: "আমরা মনে করিতেছি যে, আরবি হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় গৌরবের ঐহিত্যবাহী বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে। পাক-বাংলার মনে নতুন পরাধীনতার আশংকাকে কায়েম করে তুলিতেছে। বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক-বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মত ছুরি চালনা করা চলিবে না।"[১৩৪]

বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি

৭ ও ৮ মে ১৯৪৯ সালে বাখরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির ঊনত্রিশতম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খান ভাষা সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি উপস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলা কাফেরি ভাষা নয়, যারা এই ভাষায় কথা বলে তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। বাংলাভাষায় কোরআন-হাদিসের অনুবাদ, ভাষ্য, মহানবীর জীবনী, ইসলাম সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনামূলক বই রচিত হয়েছে। মুসলমানরা হিন্দুদের কাছ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও চর্চা করেনি। বাংলার শাসক শ্রেণীই এই ভাষাকে শ্রদ্ধা করেছে। উর্দু মুসলমানের ধর্ম ভাষা নয়, মুসলমানের ধর্মভাষা আরবি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করলে যত সহজে তার মানষিক বিকাশ ঘটবে, বাইরের কোন ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। পরদেশি ভাষা দিয়ে মাতৃভাষাকে স্থায়ীভাবে জয় করা দুনিয়ার ইতিহাসে কোন দেশে কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। বিজয়ী জার্মানেরা ইংল্যান্ডের উপর, আরবেরা পারস্যের উপর, মুরেরা স্পেনের উপর, মোঘলো পাঠানেরা ভারতের উপর তাদের নিজ ভাষা চাপিয়ে দিয়ে দেশি ভাষাকে মেরে ফেলতে পারে নাই। পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফের সুপারিশ করেছেন। তারা মনে করেন-(১) আরবি হরফে বাংলা ভাষা লিখলে বাংলা হরফ শিক্ষার বোঝা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। (২) আরবি হরফের মারফত পশ্চিম পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আরব, পারস্যের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠবে। (৩) এতে ইসলামি তমদ্দুনের বিকাশ ঘটবে। কিন্তু তিনি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশের বিরোধিতা করেন এবং স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, (১) আরবি হরফে বাংলা ভাষা লিখতে গেলে অনেকগুলি নতুন অক্ষর যোগ করতে হয় যথা ঘ, থ, ট, ঠ, ড, ঢ, ছ, অ, এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদি। এই নতুন হরফগুলি শিক্ষার জন্য যতখানি শক্তি ক্ষয় হবে, তা ব্যয় করে বাংলা হরফ মোটামুটি শিখে নেওয়া যাবে। (২) আরবি হরফে বাংলা লিখলেই যদি আরব, পারস্য, ইরান, মিশরের সাথে বন্ধুত্ব গজিয়ে উঠত তবে আগের কালে আরব-পারস্যের লড়াই হতো না এবং ইদানিং ইংল্যান্ড জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালিতে যুদ্ধ হতো না কারণ এই দেশগুলির বাসিন্দারা সবাই খ্রিষ্টান এবং তাদের সবারই ভাষা রোমান হরফে লিখা। (৩) হরফ দ্বারা তমদ্দুনের বিকাশ বা মিলন সংঘটিত হয় না। তার জন্য চাই পরস্পরের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও আলোচনা মারফত ভাবের আদান-প্রদান। আরবিতে বাংলা ভাষা লিখলেই কি বাঙালীরা কাবুল, কান্দাহার, ইরান, আরব, মরক্কো, মিশর সব দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, তাদের সাহিত্য বুঝবে? (৪) হরফ হিসেবে বাংলা হরফই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। বাংলা হরফ ধ্বনি অনুগামী হরফই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। বাংলা হরফ দিয়ে লিখলে ব্যকরণ অজ্ঞদের পক্ষেও ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যাকরণ অজ্ঞদের পক্ষে আরবি উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করা কঠিন। আব্দুর রহমান এর উচ্চারণে ভুল হওয়ার পথ নাই; কিন্তু এ কথাই আরবীতে লেখা হয় অব্দ আল রহমান আর ব্যাকরণ মতে সন্ধি করে পড়তে হবে আব্দুর রহমান। বাংলা 'আমি' শব্দকে যদি আরবি আলিফ, মীম, ইয়া দিয়ে লিখা যায়, তা পড়লে হবে আমি, আমি , উনি, ইনি যে কোন উচ্চারণে পড়া যাবে। ইরাব বসিয়ে দিলে অবশ্য শব্দটিকে ফর্মার মধ্যে ফেলা যায় কিন্তু ইরাব দেওয়া সময় সাপেক্ষ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং জঞ্জালপূর্ণ। প্রথমে , মধ্যে ও শেষে বসার কারণে আরবি হরফ রূপ পরিবর্তন করে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে এই রূপান্তর ভেদ বিশেষ জটিল হবে এবং এর ফলে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা অনেকাংশে ব্যহত হবে। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে হাজার হাজার পুঁথি পুস্তক লিখা হয়েছে কে তাদেরকে আরবি হরফে নতুন করে লিখবে? এই যুগ পরিবর্তনের পরক্ষণে হরফ পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করলে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের তামাবদ্দুনি জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, তার রাষ্ট্রীয় জীবন ও ষোলআনা রক্ষা পাবে না। সবশেষে তিনি বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে সেখানে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকারি হস্তক্ষেপে থাকলে শিক্ষার ভবিষ্যত অন্ধকার হবে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি গণতন্ত্র শাসিত দেশগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিক হতে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে এবং আজাদীর সেই প্রাণদায়িনী আবহাওয়ায় লালিত বলেই সে সব দেশের শিক্ষার এত বিকাশ, এত সমৃদ্ধি, এত শক্তি। [১৩৫]

বাখরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষক সমিতির অধিবেশনে সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খার বক্তব্য নিয়ে DC নং ১৬৩/বিধি তাং ১৮ জুন ১৯৪৯ এর মাধ্যমে প্রশ্ন তোলা হলে তিনি ভাষণদানের কপি এফ. এ. করিম. পি.এ.এস. সচিব পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা-এর বরাবরে ২৮-০৫-১৯৪৯ তারিখে প্রেরণ করেন। এতদ্বসত্ত্বেও ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ২৫৮ EDN (শিক্ষা) শাখা থেকে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খার বরাবরে তাঁকে সাবধান করে পত্র প্রেরণ করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, সে ১৯৪৯ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা ও ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সভায় প্রদত্ত আপনার বক্তৃতার আলোকে বলা হচ্ছে যে, সরকার মনে করে আপনার এ ধারনের বক্তৃতা প্রদান করা উচিত হয়নি। এতদপ্রেক্ষিতে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, আপনার বক্তৃতা সরকারি চাকুরী বিধি লংঘনের সামিল যার ফলে সরকারের নীতিমালার সম্মুখীন হবে। তাই পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে এ ধরণের বক্তৃতা আপনি করবেন না । উল্লেখ্য এ. এ. করিম সচিব, পূর্ববঙ্গ শিক্ষা বিভাগ থেকে চিঠিটি প্রেরণ করা হয়। [১৩৬]

আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় সর্বত্র যখন প্রতিবাদের ঝড় উঠে তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ১৯৫০ সাল থেকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় মোট ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। হাজার হাজার টাকা খরচ করে আরবি হরফে বাংলা বই ছাপা হয়। এছাড়াও আরবি হরফে বাংলায় রচনাকারীদের কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কারের ঘোষণা করেন। শিশুদের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরবি হরফে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ব বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরবি হরফে বাংলা লিখার বিষয়টি বাদ দিলে সরকার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।[১৩৭] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

Dhaka University Institutional Repository
করার জন্য দেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী অভিমত ব্যক্ত করেন। এদেরও মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ভাষা বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বক্তব্যের সাথে এই অভিমত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু এবং বাংলা ভাষা আরবি হরফের ঘোর বিরোধী হলেও ধর্মীয় কারণে আরবির প্রতি দূর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, "সেদিন পাকিস্তানের জন্ম স্বার্থক হবে, যেদিন আরবি সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবে"।[১৩৮] পূর্বপাকিস্তান আরবি সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটি– ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদে পেশ করার জন্য খসড়া স্মারকলিপি অনুমোদন করে। এই স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আরবি করার সুপারিশ এবং শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও মফস্বলে 'দর্সে কোরানের' ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। [১৩৯]

১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ নানা পেশার মানুষ পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৮৪৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের শাসনকালে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রদেশের জন্য বাংলাকে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত গত তিন বছরেও বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর সে কারণেই বর্তমানে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস থেকে সকল সরকারি কাজকর্ম বাংলায় শুরু করা হোক।[১৪০] ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘটের আহবান জানিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ইশতেহার প্রকাশ করে বলে, 'বন্ধুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের এই ফ্যাসিস্ট মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করে আমাদের বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না। অতএব আসুন আমরা ১১ মার্চ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও সভা আহবান করে আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে পুনরায় লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করি।' [১৪১]

উর্দু ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে যুক্তি

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গণপরিষদে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই স্মারকলিপির কপি বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এই সময় বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ উর্দুর পক্ষে তৎপরতা দেখায়। ১৫ এপ্রিল ১৯৫১ সালে করাচীতে নিখিল পাকিস্তান উর্দু সম্মেলনে মওলানা আকরাম খা সভাপতির ভাষণে উর্দুর পক্ষে বাংলা বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও উর্দুর পক্ষে বক্তব্য দেন। [১৪২] তিনি তার বর্ক্তৃতায় বলেন, "পাকিস্তানে উর্দুর মাধ্যমে আন্তঃপ্রাদেশিক আলাপ আলোচনা ও সাংবাদাদি আদান-প্রদান চলবে। উর্দু যদিও এদেশের লোকের মাতৃভাষা নয়, তথাপি ইহা তাদের মৌলিক ভাবধারার

Dhaka University Institutional Repository

উপর প্রতিষ্ঠিত। একদলের মতে পাঞ্জাব এবং অন্যদলের মতে সিন্ধু উর্দুর উৎপত্তি স্থান। সে যাই হোক, উর্দু সর্বদাই আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের নিকট নিজ ভাষারূপে প্রিয় হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে লাহোর ও ঢাকা উর্দুকে সমৃদ্ধশালী করে রেখেছে। দেশ বিভাগের বহু পূর্ব হতে একমাত্র সিন্ধু ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র স্কুল পর্যায় পর্যন্ত উর্দুকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশেও উত্তরোত্তর উর্দুর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে তাদের দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, উর্দু এবং বাংলা পরস্পরের সংমিশ্রণে উভয় ভাষাকেই সমৃদ্ধশালী করবে। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অব্যবহিতোপরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে করাচীতে পাকিস্তান এডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উর্দুকেই আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগে মিল্লাত মরহুম কায়েদে আজম পূর্ববঙ্গে শুভাগমন করেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। পাকিস্তান এডুকেশন কনফারেন্স এবং এডুকেশন এডভাইজারি বোর্ড আরো সুপারিশ করেন যে, যে সকল এলাকায় উর্দুকে শিক্ষার বাহন করা হয়নি সে সকল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার পরের পর্যায় পর্যন্ত উর্দু অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ববঙ্গ ও সিন্ধু প্রাদেশিক সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং ইহা কার্যে পরিণত করার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সমর্থনানুসারে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজির পরিবর্তে উর্দুকে শিক্ষার বাহন করার জন্যও সুপারিশ করেছেন।"[১৪৩]

বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের চেষ্টা

১৯৫১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের শিক্ষা দফতর এক আদেশ জারি করে নির্দেশ প্রদান করে যে, এখন থেকে মুসলমান বালকদের শিক্ষা আরবিবর্ণমালা দ্বারা আরম্ভ হবে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী শিশুরা ১ম ও ২য় শ্রেণীতে আরবিআর পরিচয় শিখবে এবং ৩য় শ্রেণীতে তাদের আমপারা শিক্ষা দেয়া হবে। ৪র্থ ও তদুর্ধ শ্রেণীগুলিতে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়ানো হবে। সরকারের নির্দেশ সম্পর্কে ইনসাফ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়: 'তবে পূর্ববঙ্গের ছেলে-মেয়েরা বাংলা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করলে গোমরাহ বা ইসলামি ভাবধারাবিহীন হইয়া পড়িবে এই আশংকা কেন? সেই আশংকা যদি কাহারো মনে না থাকে তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষ মহলে এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? [১৪৪] তবে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদকীয়তে প্রতিবাদ জানান হয়। ১৯৫১ সালের পুরো সময়টা ধরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঢাকায় আসেন। ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানের জনসভায় বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

Dhaka University Institutional Repository

হবে উর্দু'। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করতে যাইতেছি, যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সে রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে? মরহুম কায়েদে আজম বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন। তিনি আরো বলেন, প্রাদেশিক ভাষা কী হইবে তাহা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না। [১৪৫]

১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং কাজী গোলাম মাহবুব এই পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামিক ব্রাদারহুড, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ট মেডিকেল স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নেতারা। এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের ইচ্ছানুযায়ী উর্দু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সভায় নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতায় তীব্র নিন্দা করে প্রস্ত্বাব করা হয়। [১৪৬] ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, আরবিহরফে বাংলা লেখা চলবে না, শ্লোগানসহ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এইদিন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিলসহ আইন পারিষদ ঘেরাও কর্মসূচী গ্রহণ করে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সারা পূর্ববঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে কারণ ঐদিন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল।[১৪৭] ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে স্থানীয় প্রশাসন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ও অন্যান্য লীগ নেতাদের তৎপরতায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকার অধিকাংশ ছাত্রাবাসেই ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য ছাত্ররা প্রস্তুতি গ্রহণ করে । ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। সকাল ১১টায় আমতলায় সভা শুরু হয় গাজী উল হকের সভাপতিত্বে। এই সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১০ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হয়। এদের মধ্যে ছাত্রীদেরও একটি ছোটদল ছিল। অব্যাহত জনস্রোত ঠেকাতে পুলিশ লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এরই মধ্যে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হয়ে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের শ্লোগান ছিলঃ রাষ্টভাষা বাংলা চাই, চলো চলো এসেম্বলি চলো। ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে জড়ো হতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বাড়তে থাকে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ, মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে পাম্প হাউজ সংলগ্ন স্থান, হোস্টেলে ছাত্র-জনতার অবস্থান শক্তিশালী হয়ে উঠে। বিকাল তিনটার দিকে পুলিশ ছাত্র জনতাকে উদ্দেশ্য করে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে রফিকুদ্দিন, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বারসহ কয়েকজন শহীদ হন। শহীদের মৃত্যুদেহ

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের হাতে না দেওয়ায় ২২ ফেব্রুয়ারি ১১টায় হাজার হাজার লোক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শহীদদের উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাজা নামাজ আদায় করে। নামাজে এ.কে ফজলুল হক ও আবুল হাসিম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন: নামাজ শেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা রক্তমাখা সার্টগুলিকে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করে নবাবপুর রোডের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বাঁধা দেয়। ঐদিন পুলিশ বিভিন্ন স্থানে লাঠিচার্জ ও গুলি বর্ষন করলে আরও কয়েকজন আহতোও শহীদ হন। [১৪৮]

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের ঘটনায় পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মত্যাগ ও সরকারি দমন পীড়নের বিরুদ্ধে স্বতস্ফুর্ত প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্ররূপে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর গৃহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটির একসভায় সরকারকে গুলি চালনা সম্পর্কে অবিলম্বে হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা বিচার বিভিাগীয় তদন্তের আদেশ দিতে এবং উহাতে যাহারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাহাদেরকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করতে অনুরোধ জানান হয়। কমিটি সরকারকে শহীদদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে অনুরোধ করেন।[১৪৯] ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষনের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। পূর্ববঙ্গের সরকার পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের চারজন সদস্যকে ২৫ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে আটক করে। আটককৃত সদস্যরা হলেন: শ্রীমনোরঞ্জন ধর, শ্রী গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন। ঐদিন শহরে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।[১৫০] ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিনের বক্তব্য ছিল যে, ভাষা সম্পর্কিত আন্দোলন আসলে ভাষার জন্য নয়– ইহার মূলে কাজ করছে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্রকারী হিন্দুগণ প্রেরণা পাচ্ছে ভারত থেকে। এই জন্য পরিষদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়। ভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনকে বিকৃত করায় তার এই বক্তব্যের জবাবে আবুল হাশিম বলেন, নির্লজ্জ সরকারি পত্রিকা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়ার জন্য জঘন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দু এম.এল,এ.রা-ই দায়ি এবং হিন্দু মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবেই নারায়নগঞ্জে হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।[১৫১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সভায় রাষ্ট্রভাষার দাবি সমর্থন করা হয়। পাকিস্তান চেম্বার অব কমার্স শুধু বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি, সরকারি ১৪৪ ধারা জারিই ছাত্রগণের রক্তপাতের জন্য দায়ি বলে মনে করেন। হাইকোর্টের বারের সদস্যগণও রাষ্ট্র ভাষার দাবির প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে ব্যাপক সমর্থনের পরও ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রী সতীন্দ্রনাথ সেন এবং চারজন অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত

Dhaka University Institutional Repository
অধ্যাপক হলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রী অজিত গুহসহ কয়েক ব্যক্তি এবং ২৮ জন ছাত্র। বলা হয় তাদেরকে পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও শহীদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৩ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। শহীদ স্মৃতি স্তম্ভটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রতিটি মানুষের মনের কথার প্রতীকরূপে শাসক শ্রেণী বিশেষ করে লীগ শাসনের অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, জুলুম আর ভাষা বৈরিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা আর প্রতিবাদের প্রতীক রূপে। মানুষ নতুন করে শাসক বিরোধিতার ঢেউ অনুভব করে। কিন্তু জনগণের উদ্দীপন সৃষ্টিকারী " শক্তিশেল" হিসেবে পরিচিত শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ও তার প্রশাসন। স্তম্ভটির বুকে মোটা দড়ির প্যাঁচ আটকে ট্রাক দিয়ে টেনে ভেঙ্গে ফেলে এবং খণ্ড খণ্ড করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।[১৫২] ১৯৫২ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে ৩টি বেসরকারি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাব তিনটিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। চট্টগ্রামের গণপরিষদ সদস্য নূর আহমদ গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব করলে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সদস্যরা তা সমর্থন করেননি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য আব্দুস সাত্তার পীরজাদার আনীত যথাসময়ে বিষয়টি গণপরিষদে উত্থাপনের সংশোধনী সমর্থন করেন। পীরজাদার সংশোধনী গৃহীত হওয়াই রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।[১৫৩] ১৯৫২ সালের অক্টোবরে নবম সেশনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য প্রভাশ চন্দ্র লাহিড়ী জনাব স্পিকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে জানতে চান কতজন রাজবন্দী বিনা বিচারে পূর্ব বাংলার জেলে আটক আছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জনস্বার্থের খাতিরে জবাব দেওয়া যাবে না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রভাশ চন্দ্র লাহিড়ী পরিষদে তার বক্তৃতায় বলেন, বন্দীদের রাজবন্দী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঘৃণা করা হয়। সব বন্দীদের পুলিশ সন্দেহ করে আটক করেছেন। পুলিশ যাকেই সন্দেহ করে তাকেই নিরাপত্তা আইনে আটক করে। অনেকে চার বছর এমনকি বিভাগের সময় থেকে বিনা বিচারে আটক আছেন। এই পরিষদের সদস্য মওলানা ভাসানী জেলে মুমূর্ষ হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছেন, আব্দুল লতিফ হৃদরোগে ভুগছেন, ময়মনসিংহ জেলে সতীন সেন অত্যন্ত অসুস্থ্য। সতীন সেন স্বাধীনতার জন্য জীবনে বহুবার জেলে কাটিয়েছেন এবং বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাকে জেলে কাটাতে হচ্ছে। গোবিন্দ ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ধর বগুড়া জেলে। বহুসংখ্যক রাজবন্দীর মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু এম.এল.এ রয়েছেন। হিন্দু এম.এল.এ হলেন সতীন সেন, গোবিন্দ ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ধর এবং মুসলমান এম.এল.এ খয়রাত হোসেন আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ও ওসমান আলী। তাদের অন্তত: পুলিশ প্রহরায় পরিষদে উপস্থিত করা উচিত ছিল। সামনের নির্বাচনে অনেকে অংশগ্রহণ করতে চান কাজেই তাদের মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই। দেশের জন্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেক অবদান আছে। দেশবাসী একথা বিশ্বাস করবে না যে, যারা দেশ স্বাধীন করেছে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। তারা মনে করেন রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে শাসন পদ্ধতি বদলাতে হবে কিন্তু শাসনপদ্ধতি পরিবর্তন করা কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়।[১৫৪] ব্যবস্থা পরিষদে সংসদীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সদস্য মিসেস নেলী সেনগুপ্ত লাহিড়ীর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, এটা সহ্য করার মত নয় যে, আমাদের পাঁচ বছরে এই স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি পাঁচ জন রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে। যদি তাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাঁদের যথোপযুক্ত বিচার করা হোক। এদের কয়েকজন কয়েক বছর এবং কয়েকজন কয়েক মাস অন্তরীণ রয়েছেন। তিনি কলকাতায় বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে (Bengal Legistative Assembly) দেওয়া তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "Government may come and Government may go but our Political Prisoners go on for ever." যারা আজ বন্দী তাদের অনেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। তিনি আরো বলেন, নাজিমুদ্দিনের সরকারের সময়েও রাজবন্দীরা এক সাথে হতে পারতেন, রেশন তুলতে পারতেন, ভাল খাদ্য এবং এ্যালাউন্স পেতেন যা তাদের পরিবারকে দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে এসব থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে এবং তাদের পরিবার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাই তিনি স্পিকারের মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানান যে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক না হয় স্বচ্ছ বিচার করা হোক। কারণ অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিরাপরাধ। তারা অপরাধী হলে শাস্তি দিন।[১৫৫]

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য জনাব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মি. লাহিড়ীর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, উল্লেখিত রাজবন্দীদের সেকশন ৪১ জননিরাপত্তা আইন (Section-41-Public Safety Ordinance) এর অধীন এবং সেকশন-১৭ জননিরাপত্তা আইনে (Secton-17- Public Safety Ordinance) এর অধীন আটক (Detained) রাখা হয়েছে। জননিরাপত্তা আইনের ১৭ ধারা বলে প্রাদেশিক সরকার যদি মনে করেন কোন ব্যক্তিকে অনিষ্টকর কোন কাজ থেকে বিরত রাখবে, তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে নির্দেশ দান করা এবং সে নির্দেশ জারি করতে পারে। সেকশন-১৭ এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে কোন কাজ করা থেকে বাঁধা প্রদান করা। যে কোন মামলার প্রেক্ষাপটে অনিষ্টকর আইন (Prijudicial Act) ব্যাপক ও বিস্তৃত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং সরকারের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। ক্ষমতাসীন সরকারের সমলোচনা করার পরিণতি হিসেবে অনিষ্টকর আইন (Prijudicial Act) করা হয়েছে। আইন ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দেয় বা সরকারের সমালোচনা করার পরিণতি হিসেবে অনিষ্ঠকর আইন (Prijudicial Act) করা হয়েছে। অনিষ্টকর আইনের অর্থ হচ্ছে যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দেয় বা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজ। অর্থাৎ জননিরাপত্তা আইন থেকে মনে হয় এই আইন সবচেয়ে নিকৃষ্ট আইন, যে আইন অতীতের সংবিধি; (Statute Book) বই বিবৃত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা সংক্রান্ত বিবাদের কারণে ছয়জন আইন পরিষদ সদস্যকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও সরকারিভাবে বলা হচ্ছে তাদেরকে ভাষা সংক্রান্ত বিবাদের কারণে আটক রাখা হয়নি কিন্তু তাদের অনিষ্টকর/ নাশকতামূলক আইনের (Prijudicial Act) আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। হাইকোর্টে বিতর্ক হয়েছে যে, তারা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য ১৯৪৮-৪৯ থেকেই অপরাধী কিন্তু তাদেরকে ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আটক করা হয়েছে। এই দীর্ঘ তিন বছর সরকার তাঁদেরকে গ্রেফতার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। সতীন সেন, মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দ বাবুর গ্রেফতার একই ভাষা সংশ্লিষ্ট বিবাদকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। আমি নিশ্চিত জনাব খয়রাত হোসেন এবং তর্কবাগীশ ১৯৪৯ সাল থেকে আইন পরিপন্থী কাজে অপরাধী নয়। তাঁদের বিচার বহির্ভূতভাবে অন্তরীণ রাখার বিষয়টির কোন যৌক্তিকতা নাই। তাই তিনি বলেন এই আইন শুধু জঘন্য নয়, এর প্রয়োগও অন্যায় এবং যথপোযুক্ত নয়। আবুল হাশিম প্রসঙ্গে বলেন, তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রাক্তন সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন পাকিস্তানকে সেবা করার জন্য কিন্তু তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আর এর কারণটি স্পষ্ট যা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে প্রকাশিত তার একটি বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন '. ভাষা আন্দোলন স্বত:স্ফূর্ত এবং এটাকে বাহিরে থেকে ঘটানো হয়নি।' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তার চেষ্টা ও অবদান অনেক। তিনি পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানে আসেন। পাকিস্তানকে সেবা করার জন্য অথচ তাঁকেও একজন রাজবন্দী হিসেবে দিন কাটাতে হচ্ছে। ছয় জন সংসদ সদস্য যদি আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের সাথে জড়িত থাকে তা প্রমাণ করে তাঁদের বিচারের আওতায় আনা হোক। তিনি আরও বলেন, সরকার তাঁদের বিচার করতে চান না কিন্তু অন্তরীণ রাখতে চান। "আপনি কুকুরকে গালি দিয়ে তাদের ফাঁসি দিতে চান"। (You give the dog a bad name and hang it)[১৫৬]

প্রথম শহীদ দিবস পালন

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালনের জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আতাউর রহমান খান আহবান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজে শহীদ দিবস পালনের জন্য বিপুল উদ্দীপনা দেখা যায়। স্মৃতিস্তম্ভ না থাকায় মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক ছাত্ররা মিলে বিলুপ্ত স্মৃতিস্তম্ভের স্থানটিতে কালো কাপড় ও লাল কাগজ দিয়ে তৈরি করেন এক প্রতীকী শহীদ মিনার । কার্জন হলেও এমন একটি প্রতীকী মিনার গড়ে উঠে। ঢাকা ও ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে এই প্রথম প্রভাত ফেরি, আজিমপুর গোরস্থানে ভোরে খালি পায়ে শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফুল দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাত ফেরির শোক মিছিল ছিল ঢাকার নতুন দৃশ্য। আজিমপুরের বাসিন্দারা রাস্তায় দাড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। এই দিন সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে যে অনুষ্ঠান হয় সেখানেই প্রথম আমার সোনার বাংলা, গানটি গাওয়া হয়। এছাড়াও আব্দুল লতিফের সূরে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটি ঐ অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া হয়। [১৫৭]

ভাষা প্রসঙ্গ:

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল ছাত্র যুব কর্মীদের জন্য একুশ দফার লড়াই যার মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করেছিল ভাষা ও সংস্কৃতি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়ের চালিকাশক্তি ছিল ছাত্র সমাজ। যুক্তফ্রন্ট মনত্রীসভা গঠনের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ভাষার প্রশ্নটিকে নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ মনে করে ১৯ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং আগামী বিশ বছর ইংরেজিই সরকারি ভাষা হিসেবে চালু থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। [১৫৮] কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রে। ২২ এপ্রিল করাচীতে বাংলা বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা ঘোষণার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরাও বিক্ষোভে অংশ নেয়। তবে এই বিক্ষোভ ছিল উর্দুভাষী মহাজের বা বিহারীদের। বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় একটি সিন্ধি পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ও গণপরিষদ ভবনের দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলে ও বাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। [১৫৯]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন:

১৯৫৪ সালের ২৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী বর্ক্তৃতায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষার প্রশ্নে বলেন, " আরবিহরফে বাংলা লেখা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনে খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তারা এসব মাতলামিতে এমনভাবে মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে না পারে তার পথে আবর্জনা স্তুপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না বরং খাঁটি সাহিত্য সেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিরা উস্‌কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমনকি বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। করাচীর তাবেদার লীগ সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙালি বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টার সহযোগিতা করেছেন। ১৯৪৮ সালে পরে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কোন সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।" [১৬০]

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা কমিটির রিপোর্ট

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের ভাষা সম্পর্কে নিযুক্ত মৌলিক নীতিমালা কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক উহা জাতীয় পরিষদে উপস্থাপিত হয়। কোন সংশোধনী ব্যতিরেকে রিপোর্টটি গৃহীত হয়। রিপোর্টটির সুপারিশ নিম্নরূপ:-

১. প্রজাতন্ত্রের দাপ্তরিক ভাষা হবে উর্দু বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের সংশ্লিষ্ট ভাষা যা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হবে।

২. জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ উর্দু এবং বাংলার সাথে ইংরেজি তেও বক্তৃতা দিতে পারবেন।

৩. এতদসত্ত্বেও উপরোল্লোখিত দফার যে কোন কিছু সংবিধান কার্যকর হওয়ার ২০ বছর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা প্রজাতন্ত্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

৪. কেন্দ্রীয় চাকুরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রাদেশিক ভাষা সমানভাবে মূল্যায়িত হবে।

অতিরিক্ত ভাষা

৫. মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে আরবি, উর্দু এবং বাংলা শিক্ষার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ভাষার বাইরেও একক একাধিক ভাষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. একটি সাধারণ জাতীয় ভাষা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭. সংবিধানের কার্যকারিতা শুরুর দশ বছর পরে একটি কমিটি গঠন করা হবে যা ইংরেজির পরিবর্তে অন্য ভাষার অনুমোদন দান করবে।

এই প্রসঙ্গে তথ্যের জন্য খান আব্দুল গাফফার খান এই মর্মে জানতে চান যে, প্রাদেশিক ভাষার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা । প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন যে, (ক) সমস্ত প্রদেশ তাদের পছন্দমত প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সভার অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান যে কোন প্রদেশের দাপ্তরিক ভাষা কী হবে তা ঘোষণা করতে পারবেন।[১৬১]

ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী বলেন, " আমি আশ্চর্য হলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন মন্ত্রী পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো। আমি মনে করি United from Parliamentary Party'র কোন সদস্য এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের দ্বান্দ্বিক ব্যাপারে দলের সাথে আলাপ না করে এ ধরনের কোন মতামত পেশ করতে পারে না।" মওলানা ভাসানী আরো বলেন, " পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত গণপরিষদের এই প্রস্তাব আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বিষয়টি আমাদের দেশের জনপ্রিয় দাবি পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এটি মূল বিষয়টিকে এড়িয়ে যা বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, জনমতকে ভিন্নখাতে প্রভাবিত করা। বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে দাবি তা নিরপেক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট সম্পষ্ট। পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর দাবি এটি যে, বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হউক এবং এটি অতিসত্তর গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু জাতীয় পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি ২০ বছর পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২০ বছর দীর্ঘ সময় এবং প্রস্তাবটি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার এবং আমরা অনিশ্চিত এই সময়ে বিষয়টি কী হবে? তাই প্রস্তাবটিতে আমাদের কোন স্বার্থ নাই এবং পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এটি কোন সহায়ক ভূমিকা রাখবে না বরং এটি পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলবে। আমি আশা করবো আমাদের দেশের সকল মানুষ একই কণ্ঠে এই ক্ষতিকর বিষয়টির প্রতিবাদ করবে। বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন সারা দেশ বেগবান হবে।[১৬২]

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি

১৯৫৪ সালের ৩০ মে তারিখে ৯২-ক ধারা বা আধা সামরিক শাসনের কারণে ১৯৫৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হতে পারেনি। ঐ দিন প্রতিটি ছাত্রাবাসে পুলিশ হামলা চালায় এবং বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ১৯৫৬ সালে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহারের পর যুক্তফ্রন্টের শরীকদল কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারিভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং প্রথম শহীদ মিনারের কাছাকাছি নতুন শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বিজয় সূচিত হয় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্ররূপে বাংলার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রস্তাবে বলা হয়, " পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা" ।[১৬৩]

রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

আইয়ুব খানের শাসনামলের প্রথম দিকে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার জন্য বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি পৃথক ভাষা তৈরির অপচেষ্টা করা হয়। সরকারি এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শরীফ শিক্ষা কমিশন ও বাংলা একাডেমী রোমান হরফ প্রবর্তন, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার, বাংলা-উর্দু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে পরিকল্পনাবিদরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সংস্কার করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা– *"চল্ চল্ চল্-এর নব নবীনের গাহিয়া গান, সজিব করিব মহাশ্মশান' এটি সংশোধিত হয়ে করা হয় সজীব করিব গোরস্থান"* ।[১৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

রোমান হরফের বিরোধিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সমিতির উদ্যোগে ২৬ ফেরুয়ারি ১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ভবনে ভাষা আন্দোলন স্মৃতি দিবস উপলক্ষে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আব্দুল হাই কর্তৃক শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর অধ্যাপক আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে সভার কার্য শুরু হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলা ভাষার জন্য অবৈজ্ঞানিক রোমান হরফের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।[১৬৫] ১৯৫৯ সালে মার্চ মাসে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট হলে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদের এক আলোচনা সভায় বাংলা ও উর্দু ভাষার জন্য রোমান বর্ণমালা প্রবর্তনের বিরোধিতা করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, বর্ণমালা প্রবর্তন কেবলমাত্র উভয় ভাষার বিকাশের পরিপন্থীই হবে না উহার ফলে বাংলা ও উর্দু ভাষা তার উত্তরাধিকার, সংস্কৃতি, ললিতকলা ও ঐহিত্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বাংলা ও উর্দুর জন্য রোমান বর্ণমালা প্রবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করা হয়। [১৬৬]

বাংলা বানানের জটিলতা নিরসনের চেষ্টা

১৯৬৩ সালের ২৯ মে বাংলা একাডেমির পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা ভাষার বানানের সংস্কার সম্পর্কে নতুন পদ্ধতি প্রকাশ করেন। এই সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে অন্যরা হলেন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাৎ, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, মুহাম্মদ ওসমান গণি, মুহাম্মদ ফেরদৌস খান, মুনীর চৌধুরী, মুফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। এঁদের নিয়েই গঠিত হয় নয়া বানান কমিটি। বানান পদ্ধতি প্রবর্তন কমিটি বলেন, বাংলা বানান সাধারণ সংস্কৃত বানানের অনুসরণে লিখিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত যে সব ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিপিবদ্ধ করা হয় বাংলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সেইসব উচ্চারণ অনুসৃত হয় না, অধিকন্তু বাংলা উচ্চারণও ধরা পড়ে না। যেমন–সহ্য, বাহ্য, দুঃখ, অন্তঃপুর, ক্রমশঃ শ্বাস, বিশ্ব, বাদ্য, লক্ষণ, স্তিত, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দ। ইহা অবৈজ্ঞানিক এবং ত্রুটিপূর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় ঙ, ং, ৎ, ঞ, জ, য, বর্গীয়, অন্তঃস্থ, ব, ন প্রভৃতি স্বল্প ব্যবহৃত অথচ বিকল্প বর্তমান গোটা কয়েক বর্ণ রয়েছে। এই সমস্তক্ষেত্রে বর্ণ সংস্করণ করা বিধেয়। সংস্কৃত ণত্ব, ষত্ব বিধান অনুসারে যে বানান লিখিত হয় বাংলা ষ তৎসম শব্দগুলি সেই বানান লিখিত হলে ও তারা যথাযথ উচ্চারণ করা হয় না। তবুও শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলির বানানের ণ ও ষ–ব ব্যবহার করতে হয়। ইহার ফলে বাংলা ব্যাকরণে ও ণত্ব-ষত্ব বিধানের অধ্যায়টি না রেখে উপায় থাকে না। বানানের ণ ও শ ধ্বনি মূল দুইটিকে রেখে উপায় থাকে না। বানানের ণ ও ধ্বনি মূল দুইটিকে রেখে তাদেরসহ ধনি ণ ও শ কে অপসারিত করে বানান ও বর্ণমালা যাতে সংক্ষিপ্ত ও সরলাকৃত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইহার ফলে বাংলা ব্যাকরণের ণত্ব ও ষত্ব বিধানের জটিলতা রক্ষা করার প্রয়োজনও অনুভব হবে না।[১৬৭]

E:\k\05-02-2012\1-5.doc 13-01-12.doc

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী জুলফিকার আলী চট্টগ্রামে 'হরফুল কোরান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি বাংলা হলেও তা ছাপা হতো আরবি হরফে। বাংলাভাষা বাংলাই থাকবে তা লিখতে হবে আরবি হরফে এটি ছিল যুক্তি। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহলো ছিলেন এর পক্ষে এবং এর জোরাল সমর্থক। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি মি. এফ. এ. করিম। আবুল ফজল যুক্তি দেখান 'হরফুল কোরান' কথাটাই ভুল। কারণ কোরান হরফ নিয়ে নাজিল হয়নি। আল্লাহর যেমন ওজুদ নেই তেমনি আল্লাহর কালামেরও অজুদ থাকতে পারে না। ওহী নাজের হওয়ার অনেককাল পরে তা আরবি হরফে লেখা হয়েছে। তাই আরবি হরফ বলাই সঙ্গত।[১৬৮] বাংলা ভাষার বানান, ব্যাকরণ ও বর্ণমালা সংস্কার ও সহজ করণের জন্য ১৯৬৭ সালে ২৮ মার্চ একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির অন্য দশজন সদস্য হলেন, বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ফিরদৌস খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ ওসমান গনি, বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, ডা. এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী, চৌমোহনী কলেজের অধ্যক্ষ টি হোসেন। কমিটি বানানোর সুবিধার জন্য ঙ, ন, ষ, ঈ, ঐ, ঔ বাদ দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল এটি অনুমোদন করেন। তবে একাডেমিক কাউন্সিলের তিনজন সদস্য এর বিরোধিতা করে। তারা হলেন, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী এবং ড. এনামুল হক। অসুস্থতার কারণে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্বাক্ষর দিতে পারেননি। বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল অনুমোদন করলেও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে এর বিরোধিতা করেন। বিরোধীদের প্রতি সংস্কার কমিটির বক্তব্য ছিল, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার অবসান এবং উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা হিসেবে বাংলার উন্নয়নকে সুগম করার জন্যে এই সংস্কার অনুমোদন করা হয়েছে।[১৬৯]

বর্ণমালা সংস্কারের বিরোধিতা:

বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ঢাকার সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিল্পী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে ৪২ জন বুদ্ধিজীবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি দানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সর্বজনাব ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম, সৈয়দ মুর্তজা আলী, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, শহীদুল্লাহ কায়সার, হাসান হাফিজুর রহমান, আতাউস সামাদ, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, জহীর রায়হান প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত বাংলা বর্ণমালা ও লিখন রীতি ও বানান সংস্কারের

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে আমাদের দীর্ঘদিনের বাংলাভাষা তার ঐতিহ্য হারাবে। কবি জসিম উদ্দিন পৃথক এক বিবৃতিতে বানান সংস্কার না করার জন্য অনুরোধ জানান। বাংলা ভাষার বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের প্রতিবাদ জানিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে তুলে না ধরায় দুঃখ প্রকাশ করেন।[১৭০]

সরকারের ভারতীয় পুস্তক ও রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতার প্রতিবাদঃ

বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল ঠিক তখনই পাক ভারত যুদ্ধকে পাকিস্তান সরকার একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। সরকারি প্রচেষ্টায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে সরকার ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধশেষে আইয়ুব খান ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ এবং মোনেম খান এক অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করে দেন। [১৭১] সরকারি এই ঘোষণায় তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হবার পর পরই ১৯ জন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিসংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে। বিবৃতি দানকারীদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ সর্বজনাব মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এম.এ বারী, মুহম্মদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, আহম্মদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ। জসীম উদ্দীন; পৃথক বিবৃতিতে (সংবাদ ৩০.৬.১৯৬৭) বলেনঃ "রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলাভাষীদের নাড়ীর বন্ধন সরকারি আইন দিয়ে সে বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না" [১৭২] এই সময় আরো অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী সক্রিয়ভাবে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত ও তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রতি জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান। এই সব বুদ্ধিজীবীগণ সরকারি সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ সর্বজনাব আলী আশরাফ, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম, কামাল হায়দার, মোস্তফা কামাল, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, হাসান ইমাম, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, ওয়াহিদুল হক, জাহিদুর রহমান, কামাল লোহানী প্রমুখ। চট্টগ্রাম থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বপক্ষে বিবৃতিদাতা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল ফজল, আল মাহমুদ প্রমুখ (সংবাদ, ১.৭.৬৭)। পাকিস্তান অবজারভার ও সংবাদ (২৯.৬.৬৭ ও ২.৭.৬৭)-এ সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লেখা হয়।[১৭৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমর্থনকারী

Dhaka University Institutional Repository
বুদ্ধিজীবীদের বিরোধীতা করেন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী। ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির প্রতিবাদ করে পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীগণ বলেন, "তাঁদের বিবৃতি শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে হয়। এঁরা মূলত পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১-৭-১৯৬৭ সালে পয়গাম পত্রিকায় মওলানা আকরাম খানসহ আরো ২৯ জন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরোধিতা করে বলেন: "রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি ও ভোগ-লালসার জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হতে এ সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও ও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল।[১৭৪] বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, আহসান হাবিব, ফররুখ আহম্মদ, কাজী দীন মোহাম্মদ, আশরাফ সিদ্দীকী, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু ও কাজী আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ। ২-৭-১৯৬৭ সালে পয়গামে কয়েকজন শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রদান করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- আব্দুল লতিফ, মীর কাসেম খান, আঞ্জুমান আরা বেগম ও শাহনাজ বেগম। তাঁরা বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রবীন্দ্রসঙ্গীত চাপাইয়া দেওয়ার সকল প্রচেষ্টাই নিঃশেষে ব্যর্থ হইবে।"[১৭৫] এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় সক্রিয়ভাবে। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, পূর্ব বাংলাকে একদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অন্যদিকে তাদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই তারা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কলম দিয়ে লড়াই করেন। বুদ্ধিজীবীগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এছাড়াও ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে তারা জোরাল বক্তব্য তুলে ধরেন যা সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রসঙ্গীত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। পশ্চিম পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী বাঙালি সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানিশাসনের পুরো সময়টা সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত ইসলামি ও পাকিস্তানি আদর্শকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সরল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। পাকিস্তান আমলে অনেক প্রগতিবাদী লেখকের বই সরকার পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দেন। যেমন- আবুল ফজল রচিত রাঙ্গাপ্রভাত বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর ধরে অনার্স শ্রেণীতে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়। কিন্তু সরকারের একটি স্বার্থান্বেষীমহলো ৭ বছর পর বইটি জাতীয় আদর্শের বিরোধী বলে মন্তব্য করায় পরের বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য তালিকা থেকে বইটি বাদ দেন। ১৯৬৪ সালে উর্দুর জন্য প্রেসিডেন্ট সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হলেও বাংলার জন্য দেওয়া হয়নি।[১৭৬] পাকিস্তান সরকার অর্থ ও পদের প্রলোভন

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়ে এবং নানা প্রকার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করে। তারা পাকিস্তানি আদর্শ ও জাতীয় আদর্শের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি বাঙালিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তাদের মতে মহেঞ্জোদাড়ো ও তক্ষশীলার সভ্যতা পাকিস্তানি আর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা বিজাতীয় ভাষা। পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ করা হয়। অথচ পশ্চিমা অশ্লীল সাহিত্য আমদানীতে বাঁধা নেই। মূলত বাঙালি সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্যই এই ধরনের স্ববিরোধী তৎপরতা চালান হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুল, কলেজে রমজানের ছুটি ছিল না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তা চালু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারে, পূর্ব পাকিস্তানে শুক্রবারে। বেতার, টেলিভিশন এবং সরকারি প্রচার মাধ্যম থেকে খাঁটি বাংলা শব্দ বাদ দেওয়া হয়। বাঙালির স্বাধীন চিন্তাধারাকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন কালা কানুন জারি করা হয়। ফলে প্রবীন সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চা সীমাবদ্ধ ও নির্জীব হয়ে পড়ে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সাহিত্যের আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়। বাঙালির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে নির্মূল করার জন্য সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন ও পারিতোষের মাধ্যমে বিপদগামী করা হয়। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠন করা হয়। যেমন–পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পাকিস্তান লেখক সংঘ, পাকিস্তান কাউন্সিল ও জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানিআদর্শ প্রচার করা। ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য বাংলা একাডেমি গঠিত হলেও এর আসল উদ্দেশ্য নস্যাৎ করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। [১৭৭]

তথ্যসূত্র

১. উদ্বৃত Rounaq Jahan, Pakistan: *Failure In National Integration*, The University Press Limited, 1994, p.9

২. Ibid

৩. Mufizullah Kabir, *Experience of an Exile at Home*, Dhaka: Asiatic Press,1972, p.2

৪. সালাউদ্দিন আহমদ,*বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি*, বাংলাদেশ, ১ম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২০

৫. অলি আহাদ: জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল ১৯৮২, পৃ.৭০

৬. ঐ, পৃ.৩৪-৩৫।

৭. ঐ পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

৮. *Pakistan observer*, 24 October, 1955.

৯. K.B. Sayeed, *The Political System of Pakistan*. Boston, 1967, pp.67-68.

৯ ক. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র* ১ম খণ্ড, পৃ.৩৫৯

১০. Pakistan, *Constituint Assembly Debates*. Session 8. November 21, 1950.

১১. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯২, পৃ.১৯

১২. আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি*, বাংলার ইতিহাস (১৭০৭-১৯৭১) সম্পাদিক সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ.৫৫২

১৩. A.M.A. Muhith, *Bangladesh Emergence of Nation*, Dhaka 1978. p. 46.

১৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ.২৫১-২৫২

১৫. ঐ, পৃ.২৫৯

১৬. ঐ, পৃ.২৬১-২৬২

১৭. উদ্ধৃত: Nehal Karim. *Exploitation. Domination and Alienation*. Dhaka: Osmania Library, 1994, p. 38

১৮. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬১, ২৬৭

১৯. ঐ, পৃ.২৬৭,২৭৬।

২০. *Pakistan Observer*, 31 may 1954

২১. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত পৃ.২৮৪-২৮৬

২২. ঐ, পৃ.২৯১, ৩০০, ৩০২

২৩. ঐ পৃ.৩১৮

২৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র:* ১ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা:১৯৮২, পৃ.৪২৯।

২৫. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৮

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬

২৭. ঐ

২৮. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র:* ১ম খণ্ড পৃ.৫৮৫ ও ৫৮৯

২৯. ঐ, পৃ.৫৯৪, ৫৯৫ ও ৬০১

২৯ ক. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র:* ১ম খণ্ড: পৃ.৬০৩-৬০৭

৩০. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত পৃ.৪১১, ৪১৯ ও ৪২৪

৩১. Edtorial, The Dawn, Karachi 7 and 12 October of 1958. Adopted, Rounaq Jahan, Ibid. p.51.

৩২. আবুল মনসুর আহমদ, প্রগুপ্ত, পৃ.৪৬০

৩৩. Rounaq Jahan,Ibid, pp.112-113

৩৩ক. Reproduceed from Rounaq Jahan, Pakistan, Failure in National Integration, The University Press Limited 1994, Table vi.i. p.115

৩৪. Ibid, pp.116

৩৫. Nehal Karim, Ibid, P.45

৩৬. Ibid, pp.45-46

৩৭. Pakistan observer, 25 june 1962 বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সর্ব জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুর হক (নান্না মিয়া) পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া)।

৩৮. দৈনিক আজাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪।

৩৯. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* ১৮৩০-১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.২৯০

৪০. Ayub Khan, *Friends not Master*, Dhaka: 1967. p. 317

৪০ ক Pakistan, Election Commission, Presidential Election Results, 1965.

৪১. নূরুল হুদা আবুল মনসুর ও শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধ ও পাকিস্তানের ভূমিকা: একটি পুনর্মূল্যায়ন, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, ১৯৯৮-২০০১, পৃ.৪৩

৪২. ঐ, পৃ.৪৫

৪৩. ঐ, পৃ.৪৫

৪৪. ঐ, পৃ.৪৯

৪৫. ঐ পৃ.৫৩,৫৫ ও ৫৬

৪৬. ঐ পৃ.৫৮,৫৯ ও ৬২

৪৭. Adopted from Nehal karim, Ibid, p. 49

৪৮. ড. কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* ১৯৬৬-১৯৭১, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ.৭

৪৯. আজিজুর রহমান ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫৪

৫০. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৫১. Mufizullah Kabir, Ibid, pp.18-19

৫২. ড. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত পৃ.১০

৫৩. ঐ পৃ.১৪

৫৪. আজিজুর রহমান ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫৫

৫৫. মওদুদ আহমদ,পূর্বোক্ত, পৃ.১১১

৫৬. ঐ, পৃ.১১১-১১৫

৫৭. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ.৩০

৫৮. ড. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩৩

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৬০. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত পৃ.৩১

৬১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ মার্চ ১৯৬৯

৬২. ড. কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪

৬৩. *The New York Times*, March 26, 1969

৬৪. ড. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত ,পৃ.৩৫-৩৭

৬৫. আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত পৃ.৫৫৭

৬৬. *সাপ্তাহিক মাতৃভূমি* (যশোর থেকে প্রকাশিত) ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

৬৬ক. *The Dawn,* 18 December 1970.

৬৬খ. *The Dawn*, 18 December 1970.

৬৭. ড. কামাল হোসেন পূর্বোক্ত, পৃ.৪০

৬৮. ঐ. পৃ.৪১-৪৩

৬৯. উদ্ধৃত: ড. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪

৭০. ঐ, পৃ.৪৫

৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৭২. ড. কামাল, পূর্বোক্ত পৃ.৪৫ ও ৪৯

৭৩. ঐ, পৃ.৫২-৫৪

৭৪. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ মার্চ ২০০৯

৭৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ মার্চ ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. বিটিবি-৭ মার্চ ২০০৯ তাং সন্ধ্যায় ৭ মার্চের উপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থাপক ছিলেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং এম.এ খায়ের (এম.এল.এ.) বক্তারা ৭ মার্চের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন

৭৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ মার্চ, ২০০৯

৭৮. ড. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত ৬২, ৭১ ও ৭২

৭৯. ড. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ.২৫৬ ও ২৬৫

৮০. ঐ, পৃ.২৫৬-২৫৭

৮১. আবু আল সাঈদ, *পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.৮৩

৮২. Rangalal Sen, *Political Elites in Bengal*. Dhaka: U.P.L, 1986, pp. 20-21

৮৩. Rangalal Sen, Ibid, P. 21

৮৪. আবু আল সাঈদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৩

৮৫. ড. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ.২৫২

৮৬. ঐ, পৃ.২৫২

৮৭. ঐ, ২৫২-২৫৩

৮৮. আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি*, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ১ম খণ্ড, পৃ.৫৪৮

৮৯. ঐ, পৃ.৫৪৮

৯০. ঐ, পৃ.৫৪৮

৯১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র:* ১ম খণ্ড পৃ.৬১৫

৯২. Nahal Karim, *Explotation, Doninations and Alienation,* Dhaka: Osmania Library, 1994, p.18

৯২ক.Pakistan Economic Survey 1968-69 Table no 41, Government of Pakistan Ministry of Finance, Islamabad. 1969.

৯৩. দূর্গাদাস ধর, *বাংলাদেশের* উদ্ভব বাংলাদেশ বিজয় দিবস সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃ.৪৮-৫০

৯৪. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ১ম খণ্ড, পৃ.৬১৬

৯৫. ঐ. পৃ.৬১৭

৯৬. ঐ. পৃ.৬১৭

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. ঐ, পৃ.৬২১

৯৮. ঐ, পৃ.৬১৬

৯৯. Raunaq Jahan, পূর্বোক্ত পৃ.৮৬

১০০. ঐ; পৃ. ৮৬

১০১. Speech by: A.S.M. Sulaiman, Pakistan National Assembly Debates, Vol. II. June 22, 1966.pp.181-182

১০২. ড. মুহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* ,ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, পৃ.১৩০-১৩১

১০৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, বাংলাদেশ প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃ.৭৭

১০৪. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২২৮

১০৫. Rangalal Sen, পূর্বোক্ত, পৃ.২

১০৫ক. Reports of the advisory panels for the fourth five year plan 1970-75, Vol-1, Planning Commission Government of Pakistan Islamabad July 1970.

১০৬. রংগলাল সেন পূর্বোক্ত পৃ.২৫১

১০৬ ক. আর, আলম, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: ৪র্থ* খণ্ড, পৃ.২৩২

১০৭. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র*, ২য় খণ্ড-, পৃ.৪৭৫, ৪৭৬.

১০৭ ক. Pakistan, Ministry of Economic Affairs, Central Statistical Office. Twenty Years of Pakistan in Statistic 1947-67. pp.287-295.

১০৮. আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, *স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলাদেশ, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৭২, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৩৭

১০৯. Speech by: Mr. Azizar Rahman, *Assembly Proceedings Official Report*, East Pakistan Provincial Assembly, 1966-1967,Vol-30, 15 July. 1966, pp.250-255.

১০৯ক. *Pakistan Economic Survey*, 1969-70, Ministry of Finance, Government of Pakistan, Islamabad,1970, pp.76-85.

১০৯খ. Reports of the Panel of Economic on the Fourth Five Year Plan 1970, *Planning Commission of Pakistan*, Islamabad, 1970. Table-2. p.6.

১০৯গ. The Awami League Poster. Publication and Circulated on the eve of Election, October, 1970.

১১০. *দৈনিক জনকণ্ঠ, চতুরঙ্গ*, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

১১১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯

১১২. *মাসিক মোহাম্মদী* , পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটির কার্যবিবরণী পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সম্মেলন

১১৩. সাঈদ উর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি আন্দোলন*, ঢাকা: ভানা প্রকাশনী ১৯৮৩, পৃ.১৩

১১৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: ১৯৭৫, পৃ.৩

১১৫. ঐ

১১৬. ঐ. পৃ.৩-৪

১১৭. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, ২ *সংস্করণ*, চট্টগ্রাম-১৯৬৮, পৃ.৩০৭, *দৈনিক আজাদ*, ১২ মার্চ ১৯৪৯

১১৮. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪-১৬

১১৯. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪৯

১২০. ঐ, পৃ.১৯

১২১. আহমদ শরীফ, *বাঙলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন সেমিনার প্রবন্ধমালা*,১৯৮১,পৃ.১১-১২

১২২. মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: ১৯৮৭, পৃ.১৩-১৬

১২৩. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ.২০-২১

১২৪. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী* ,ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯২, পৃ.২

১২৫. মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ.২০-২১

১২৬. *Constitent Assembly of Pakistan deabtes*. Vol. 11. 25 Februay 1948. pp. 15-17.

১২৭. *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৪ মার্চ, ১৯৪৮,উদ্ধৃত: *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র*: ১ম খণ্ড

১২৮. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ১ম খণ্ড, পৃ.৮৪

১২৯. ঐ, পৃ.৮৪

১৩০. ঐ, পৃ.৭৭

১৩১. বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃ.২৬১

১৩২. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ৮ এপ্রিল ১৯৪৯,উদ্ধৃত: স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ১ম খণ্ড

১৩৩. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১, পৃ.৪৪

১৩৪. বাখরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির উনত্রিশতম অধিবেশন ৭-৮ মে, ১৯৪৯, স্থান- মদনমোহন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, শুকদেব, ভোলা, সভাপতির ভাষণ, সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খান, সভাপতি পূর্ববঙ্গ মাধ্যমকি শিক্ষা সংসদ, পৃ.৮-১৬

E:\\...\\05402-2012\\1-5 doc 13-41-12 doc

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫. Government of the East Bengal, *B-Proceedings Education*, File No. 8b-38 of 1948, Proceeding 244 to 147 july 1953.

১৩৬. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১৮৩০-১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ.১২২-১২৩

১৩৭. বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃ.২২৭

১৩৮. ঐ, পৃ.২৭২

১৩৯. *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ১ মার্চ ১৯৫১, উদ্ধৃত: স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ১ম খণ্ড

১৪০. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি,২০০৫, পৃ.৭৫

১৪১. ঐ. পৃ.৭৭

১৪২. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: ১ম খণ্ড: পৃ.২১৮-২১৯

১৪৩. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫

১৪৪. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫২

১৪৫. *দৈনিক আজাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

১৪৬. আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক, প্রাগুপ্ত, পৃ.৮৩

১৪৭. সংগ্রহ ও সম্পদনা ড. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন কলকাতার সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি-১৯৯৫, পৃ.৬৫

১৪৮. ঐ পৃ.৭৪ ও ৭৭

১৪৯. ঐ পৃ.৭৯-৮০

১৫০. ঐ, পৃ. ৮৪

১৫১. ড. সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৬, আব্দুল মতিন, পূর্বোক্ত-১৭১, ১৭৩ ও ১৭৪

১৫২. আব্দুল মতিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৪-২১৫

১৫৩. Speech by Mr. Provas Chandra Lahiri, *Assembly Proceedings Official Report*, Vol-ix. No. 1. East Bengal Lagislative Assembly Ninth Session October1952.

১৫৪. Speech by Mrs. Nellie Sen Gupta. *Assembly Proceedings Official Report*. Vol-ix-No.1, October-1952, pp.269-270.

১৫৫. Speech by Mr. Dhirendra Nath Datta, *Assembly Proceedings Official Report*, vol-ix-No1. 17 Octobor 1952, pp.270-271.

১৫৬. আব্দুল মতিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২২২-২২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ এপ্রিল ১৯৫৪
১৫৮. *দৈনিক আজাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৫৪
১৫৯. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র: ১ম খণ্ড, পৃ.৩৯২
১৬০. স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র: ১ম খণ্ড: পৃ.৩৮৯
১৬১. ঐ, পৃ.৪০১

১৬২. আব্দুল মতিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩১-২৩৩।

১৬৩. মুহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, পৃ.১০৩

১৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

১৬৫. ঐ, ৩১ মার্চ, ১৯৫৯

১৬৬. *দৈনিক আজাদ*, ৩১ মে ১৯৬৩

১৬৭. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, দ্বিতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম বই ঘর, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, পৃ.৩০৭-৩০৮

১৬৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ আগষ্ট ১৯৬৭

১৬৯. ঐ, ১১ অক্টোবর ১৯৬৮

১৭০. খান সারওয়ার মুরশিদ, সম্পাদক মনজুর মওলা, *শ্রাবণ:* ত্রৈমাসিক, ২য় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, এপ্রিল-জুন ১৯৮৭,পৃ.১৩৬
১৭১. শ্রাবণ, ঐ, পৃ.১৩৭
১৭২. ঐ, পৃ.১৩৭
১৭৩. ঐ, পৃ.১৩৭, ১৩৮
১৭৪. ঐ, পৃ.১৩৮

১৭৫. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৬ ও ৩২৭

১৭৬. নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবী দলন বাংলাদেশ*, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭২, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৮২-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৮-৩৯ সময়কালে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৭৪.৫% এবং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২৩.৭%। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ২৫ হাজার প্রবেশিকা পাস করা ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২২২৩ জন।[১] সঙ্গত কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বপ্নের পাকিস্তানে শিক্ষ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়নের আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই আশাবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বলেছেন, " যেমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের চাপে বাংলার মুসলমান লেখকদের প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে আছে। গণতান্ত্রিক ইসলামি সভ্যতা ও বিপ্লবী ইসলামি সংস্কৃতি থেকে রস সঞ্চার করে নবশিক্ষার আলোকে পত্র বিস্তার করতে চাচ্ছে এদের মানস ও মনন।"[২] নব শিক্ষার আলো সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার কথা। এই লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার আমূল পরিবর্তন চেয়ে তিনি বলেছিলন, "আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা আশাকরি আমূল পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আসবে নব বিধানের পরিকল্পনা।"[৩] রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনেও ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে পরিবর্তন কামনা করা হয়েছিল। শত শত অপদার্থ মাদ্রাসার পরিবর্তে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী ও কলকাতায় চারটি সত্যিকারের ইসলামিক জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের গবেষণা এখানেও চলতে পারে।[৪] সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ছিল ধনী, নির্ধন নিবিশেষে সবার জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করার মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে-তোলা হবে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনেরপর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়া শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ববাংলার প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন :

পাকিস্তানের স্বাধীনতার অল্পকালের মধ্যেই পাকিস্তানিশাসকগোষ্ঠী শিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন আহবান করেন। শিক্ষাকে পাকিস্তানিকরণ করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মূলগত পরিবর্তনের দিকে না গিয়ে ন্যূনতম সব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব না করে এই শিক্ষা সম্মেলন উর্দু ও ইংরেজি ভাষার প্রসার ও ঐ ভাষা দু'টিকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করে। সম্মেলন কর্তৃক উপস্থাপিত অনেক প্রস্তাব পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করলেও বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন পাকিস্তানিশাসনের প্রায় সিকি শতাব্দী সময়কালেও বাস্তবায়িত হয়নি। ভাষার প্রশ্নে সম্মেলন যে সুপারিশ করে তাও বাস্তবায়িত হয়নি বরং উর্দুর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় ছাত্র-জনতা ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা

স্বাধীনতার পরপর প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি উঠলেও সরকারি উদাসীনতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। জেলা বোর্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয় তা অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষক ৩/৪ মাস থেকে ৮/৯ মাস বেতন পান না। যা পান তাও অতি সামান্য। স্কুল ঘরগুলির দরজা-জানালা ভেঙ্গে পড়ায় সেখানে কুকুর-শেয়াল, গরু-বাছুর গিয়ে বাস করে। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনেকদিন ধরে কর আদায় করা হলেও কোন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের (United Provinces) স্কুলগুলিতে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেনি পাকিস্তান সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন (Untrained) শিক্ষক বেতন পান ১৫.৫০ টাকা অন্যদিকে একটা সরকারি অফিসের চাপরাশি শুধু মহার্ঘ্যভাতা (Dearness Allounce) পান ২৪ টাকা থেকে ২৭ টাকা। এছাড়াও তাদের বেতন আছে। প্রাথমিক স্কুলের একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (Trained) শিক্ষক বেতন পান ২৪.৫০ টাকা আর গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক (G.T. Head Pandit) পান ৩২.৫০টাকা।[৫]

৩১-০৩-১৯৪৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিবরণ[৬]

সারণি-২৯

ক্র: নং	জেলার নাম	গ্রামীণ অঞ্চল	মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল	মোট
১.	ঢাকা	২১৬০	৭৮	২২৩৮
২.	ময়মনসিংহ	৩৪৪৫	১০১	৩৫৪৬
৩.	বাকেরগঞ্জ	২৫১৯	৮৪	২৬০৩
৪.	ফরিদপুর	১৮১৪	৩০	১৮৪৪
ক্র: নং	জেলার নাম	গ্রামীণ অঞ্চল	মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল	মোট
৫.	চট্টগ্রাম	১৬০১	৪৫	১৬৪৬
৬.	নোয়াখালী	১৫১১	১২	১৫২৩
৭.	টিপেরা অঞ্চল	১৮৮৮	৪০	১৯২৮
৮.	রাজশাহী	১২৩৬	৩৫	১২৭১
৯.	দিনাজপুর	১১৪১	২৩	১১৬৪
১০.	পাবনা	১৩০৩	৩৩	১৩৩৬
১১.	বগুড়া	১০৩৫	১০	১০৪৫
১২.	রংপুর	১৮৯৬	১৮	১৯১৪
১৩.	যশোর	১২১৬	২৭	১২৪৩
১৪.	খুলনা	১৯৯২	৫৬	২০৪১
১৫.	কুষ্টিয়া	৬১৩	১০	৬২৩
১৬.	সিলেট	স্থানীয় বোর্ড অঞ্চল ২৯৬০	৪৮	৩০০৮
১৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম			১৮৫
মোট-				২৯১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৭৪০৯২ জন। শিক্ষকের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ছিল ১৯ রুপি । প্রবেশিকা পাশ প্রশিক্ষিত প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত এলাউন্স ২ রুপি এবং সর্বনিম্ন বেতন ছিল ৪ রুপি । যে সব শিক্ষক বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় পাশ করতেন তারা অতিরিক্ত ৫ রুপি মাসিক বেতন পেতেন। এছাড়াও জেলা বোর্ড স্কুল অঞ্চলে কর্মরত শিক্ষকদের এলাউন্স হিসেবে ৫ রুপি এবং মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের প্রত্যেকে ৩ রুপি করে অতিরিক্ত এলাউন্স পেতেন প্রতিমাসে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সব ব্যাপারেই ইসলামের কথা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান ঢাকায় এসে বলেছিলেন, "আমাদের শিক্ষা হবে Islamic শিক্ষা Education হবে Islamic Education " তাঁর এই উক্তি সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে পরিষদ সদস্য প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে হয়ত দুই জাতিত্বের প্রয়োজন ছিল কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানকে যদি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে পাকিস্তানে এক জাতি গড়তে হবে এবং পাকিস্তানে এক নেশন সৃষ্টি করতে হবে। পাকিস্তান একা হিন্দুরও নয় একা পাকিস্তানেরও নয়। হিন্দু-মুসলমান মিশ্রণে তৈরি হবে পাকিস্তান Nation যদি শিক্ষার ভেতর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয় সেখানে বিক্ষোভ হবে। খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছেন যে, পাকিস্তান মুসলমানের বাসভূমি (Pakistan in the homeland of Mussalman) তাহলে অমুসলিম কি বিদেশি? তিনি প্রশ্ন করেন তাহলে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলের মত আলাদা Anglo Education হবে কি না? তিনি সমালোচনা করে বলেন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি বাংলা ভাষার পরিবর্তন, হরফ পরিবর্তন করে আরবি, উর্দু প্রবর্তন এবং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সাহিত্য নতুন করে সাজানোর কথা বলা হলেও বাধ্যতামলূক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়নি।[৬ক]

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা তুলে ধরে পরিষদ সদস্য বিনোদ বিহারী চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুমোদিত একটি বই, ' প্রশ্নোত্তরে ব্যাকরণ শিক্ষা' লেখক জাহানারা বেগম ও এলোকেশী বিশ্বাস। লেখকদের কেউ চেনেন না। এই বইতে উল্লেখ ছিল, স্যার মোহাম্মদ ইকবাল ২৪ বৎসর বয়সে হিমালয় বন্দনা নামক কবিতা পুস্তক রচনা করেন এবং ইসলাম ধর্মের উন্নতির জন্য বহু পুস্তক লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন; কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৫ বৎসর কাল বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর পদে কার্য করেছেন, ১৮ বৎসর বয়সে তিনি পারস্যের রতন বাঈ নামে এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু গ্রন্থাবলীর রচনা করে প্রসিদ্ধ হন এবং বিদ্যাসাগর কলেজ স্থাপন করে জগতে অমর হয়েছে ইত্যাদি। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বই পাঠ্য করা হয় এবং শিক্ষা কর্মকর্তা এটি অনুমোদন করে।[৬খ]

Dhaka University Institutional Repository
১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেটে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দের সমালোচনা করে পরিষদ সদস্য মওলানা খন্দকার আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন, শিক্ষাখাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হলেও সংশোধিত বাজেটে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা হ্রাস করা হয়। বর্তমান (১৯৪৯-৫০ সালের) বাজেটে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে দেখা যায় সরাসরি সাহায্যের জন্য মাত্র ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল এবং স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে মাত্র ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সংশোধিত বাজেটে সরাসরি সাহায্যের খাতে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় পরিণত করা হয় অর্থাৎ আসল বরাদ্দ হতে ৫০ হাজার টাকা কমান হয়। ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় সরাসরি সাহায্যের জন্য মাত্র ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় যা পূর্বের বাজেটের চেয়ে ৮৯ হাজার টাকা কম। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজগুলির ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দের সমালোচনা করে পরিষদ সদস্য ড. আব্দুল আহাদ বলেন, প্রদেশে ৪টি সরকারি কলেজে ৩৬৩৬ জন ছাত্রের জন্য সরকারি খরচ ১০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি ছাত্রের জন্য খরচ হয় ৩০০ রুপি কিন্তু ৪৭টি বেসরকারি কলেজের ২২০০০ ছাত্রের জন্য সরকার খরচ করে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ছাত্র প্রতি ২০/২৫ রুপি। [৬গ]

স্বাধীনতার পর হতেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা, উর্দুকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করে। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম সফরে এলে সেখানকার ছাত্র সমাজ তার উদ্দেশ্যে একটি 'খোলা চিঠি' সাধারণের জন্য প্রকাশ করে। এতে ছাত্ররা মন্ত্রীর কাছে জানতে চায়-

আচ্ছা জনাব, শিক্ষা ব্যবস্থা কি আগা থেকে আরম্ভ হবে, না গোড়া থেকে আরম্ভ হবে? যদি গোড়া থেকে আরম্ভ হয় তবে চাটগাঁর ৮১৩ খানা প্রাইমারি স্কুল ছাটাই করা হয়েছে কেন? প্রাইমারি শিক্ষকেরা ছয় মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না। বেতন না পেয়ে নাসিরাবাদের প্রাইমারি শিক্ষক নজির আহমদ সাহেব না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। ১০ টাকা বেতনে তারা কী করে জীবিকা নির্বাহ করে তা ভেবে দেখেছেন কি কোনদিন? পাকিস্তান হওয়ার দীর্ঘ ৩ বৎসর শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে কয়টা হাইস্কুল বা কলেজ খুলেছেন? অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যখন প্রাইমারী স্কুল তালা দেওয়া হচ্ছে, তখন ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করে আরবি হরফ প্রবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানের তামুদ্দুনিক প্রগতিকে ধ্বংস করা কি জাতিদ্রোহিতা তথা রাষ্ট্রদ্রোহিতা না? সপত্নীক বিলাতে গিয়ে আপনি অনর্থক যে সাত লক্ষ টাকা খরচ করেছেন তা দিয়ে সাতটা কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা যেত না?। [৭]

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও সরকার এ বিষয়ে একেবারে নীরব থাকে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ১৯৫০ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository
জেলায় মোট ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করে। কেন্দ্রীয় খরচে আরবি হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে। আরবি হরফে বাংলা বই রচনাকারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শিশুদের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরবিহরফে বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ সদস্যের পূর্ব বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার কমিটি আরবি হরফে বাংলা লিখার বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে মত দেন। ফলে সরকার কমিশনের প্রতিবেদন কোনদিন প্রকাশ করেনি।[৮]

১৯৫০ সালে দেখা যায় একমাত্র রাজশাহী জেলায় ৩৬০টি প্রাথমিক বালক এবং ৩০০টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় অবলুপ্ত হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকে বেঁচে থাকার তাগিদে পেশা পরিবর্তন করে কেউ কেউ চাষী, কেউ বা দিনমজুরে পরিণত হন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ১২৬৬টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৫৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে মাত্র ৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৪টি মহাবিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। এসব বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শহর বন্দর এলাকায় অথচ শতকরা ৯২জন লোক বাস করতেন পল্লী এলাকায়। [৯]
১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্টের প্রচার পুস্তিকায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে অবহেলো এবং বৈষম্য তা স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ এবং আরো স্কুল বন্ধ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষকগণকে অপর্যাপ্ত বেতন অনিয়মিতভাবে এবং স্কুলের আসবাবপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে বরাদ্দ করা হলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। [১০]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচটি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এত স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে এতগুলো ক্লাশ চালানো এবং সুষ্ঠভাবে শিক্ষাদান সম্ভব নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়(১৯৫৫-৬০) প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ভিক্ষুক দল সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু হয় না। আরবি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তা দ্বারা তকবীর দেওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না। পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেন্ট সদস্য এ. এফ.এম. আব্দুল জলিল উক্তিটি করেন এবং সদস্য আমীর আলী খানও তার বক্তব্য সমর্থন করেন। [১১]
পূর্ব পাকিস্তান সরকার একদিকে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস করেছে, অন্যদিকে সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কথা বলছে। ১৯৫৬ সালে সরকার পরিকল্পনা বোর্ডের নিকট প্রদেশে ১২ হাজার উন্নত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যাতে আড়াইশত ছাত্র পড়তে পারে তার ব্যবস্থা, ক্রমে ক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষক নিযুক্ত করার কথা বলে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাস করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষার আসল চিত্র হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা একান্তভাবে অবহেলিত। এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব দেখা যায়। কারণ শিক্ষার্থীর জীবনে শৈশবকালই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। শিশু-শিক্ষার্থীর জন্য সর্বাধিক বিচক্ষণ ও জ্ঞানী শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষাকে আদর্শ স্থানীয় না করা হলে উপরের স্তরে মজবুত হয় না। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত, অনভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলা হবে। দুই একটি প্রিপারেটরী স্কুল ও পাবলিক স্কুল দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। [১২]

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে সর্বশেষ বাজেট পেশের পর পুনরায় বাজেট পেশ করা হয় ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। এই বাজেটে প্রথম বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাজেট পেশ করা হয়। দীর্ঘ নয় বৎসর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শাসিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে যার প্রভাব পড়ে বাজেটে। পরিষদ সদস্য মি এ. এফ.এম আব্দুল জলিল এই বাজেটকে একটি মিউনিসিপ্যালিটির বাজেটের সাথে তুলনা করেন। বাজেটে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় প্রয়োজনের তুলনায় কোথায় আংশিক, কোথায় সিকি বা অর্ধেক। তিনি বলেন, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন লোক বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে এবং রাজস্বের শতকরা ৭২ ভাগ জোগায় পূর্ব পাকিস্তান। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বাজেট ৩১/৩২ কোটি টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৪৪ জনের জন্য বাজেট ৫৮ কোটি টাকা। [১২ক]

ময়মনসিংহ জিলা শিক্ষক সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে সভাপতি ইব্রাহীম খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ সংকটের কথা তুলে ধরেন। এখানে বলা হয় নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ সর্বস্তরেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছে। শিক্ষকদের পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় নেই, চিত্তে শান্তি নেই এমনকি সমাজে ইজ্জত নেই তাই এরূপ পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ছাড়া দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সংকটময় অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্থানীয় এম.এল.এ.দের এবং অভিভাবকদের মাধ্যমে সরকারকে বোঝাতে হবে। আইন পরিষদে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন প্রতিনিধি আছেন তেমনি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য পৃথক প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করলে শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে সরকার অবহিতোহতে পারবেন। দেশের প্রতিটি স্তর থেকে সমস্যার বিষয়গুলি তুলে ধরলে সরকার প্রতিকার করতে বাধ্য হবে। সভাপতির ভাষণে ইব্রাহিম খাঁ আরো বলেন, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় ত্রুটির প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষাদানে অব্যবস্থা এবং সে অব্যবস্থা দূর করতে হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতি স্তরে চাই উপযুক্ত বেতনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ। [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে মাত্র ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যার মধ্যে ১১টি মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে বাকীগুলো অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে। এত সামান্য সংখ্যক স্কুল দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অভাব পূরণ হতে পারে না। টাকার অভাবে মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটাতে পারেনি। ঢাকা শহরে অন্তত দুই থেকে আড়াইশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। গ্রামীণ অঞ্চলের অবস্থাও একই রকম। দেশ বিভাগের পর বহুসংখ্যক হিন্দু ভারতে চলে গেলে তাদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতা স্থানীয় গরীব মুসলমানদের ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে এমন উদাহরণ আছে যে, যেখানে স্থানীয় লোকেরা স্কুল পরিচালনা করতে পারছে না সেখানে সরকারিভাবে সাহায্য দেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে এমন অনেক জেলা আছে যেখানে সরকারি স্কুল নাই। যেমন কুষ্টিয়া জেলা।[১৪] দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করে মিস ফাতেমা জিন্নাহ তার বক্তৃতায় বলেন, 'দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত রয়েছে তাহা সুস্থ্য মনোভাব সম্পন্ন ও স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সমাজ গঠনের সহায়ক নহে এবং উহা জাতীয় ঐক্য ও সেবার মনোভাব গড়ে না তুলে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। তিনি আরো বলেন, একটি স্বাধীন দেশে অনুরূপ শিক্ষা পদ্ধতির কোন স্থান থাকতে পারে না। [১৫]

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকর সংসদের একসভা ময়মনসিংহ জেলা সমিতির অফিসে আব্দুল ফাতাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির ২৬-১০-১৯৫৫ হতে ৩০-১২-১৯৫৬ পর্যন্ত হিসাব মঞ্জুর এবং ১৯৫৭ সালের বাজেট গৃহীত হয়। পাকিস্তান সরকারের বাজেটের পূর্বে বর্তমান শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের দাবির পক্ষে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জেলায়, প্রতি মহকুমায় মহকুমায় সম্মেলন ও জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৬] ১৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সমগ্র পাবনা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের জন্য নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৭ জানুয়ারি-	:	মিলাদ ও আলোচনা, নিরক্ষরতা দূর করার শপথ, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা।
১৮ জানুয়ারি-	:	শিক্ষকগণের নেতৃত্বে শিক্ষা বিষয়ক শ্লোগান, শোভাযাত্রা।
১৯ জানুয়ারি-	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের যোগদান।
২০ জানুয়ারি-	:	শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে মহাপুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা।
২১ জানুয়ারি-	:	বাধ্যতামূলক এলাকার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য শক্তিশালী উপদেষ্টা হাজিরা কমিটি ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রতিবাদসহ কার্যবিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২২ জানুয়ারি- : সকল আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে শ্লোগান-

১। নিরক্ষরতা দূর কর;

২। শিক্ষার দিকে নজর দাও;

৩। গ্রামের স্কুল ভাল কর;

৪। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দাও;

৫। বিদ্যালয়ে ছাত্র দাও;

৬। খাদ্যের সাথে শিক্ষা চাই;

৭। শিক্ষা সপ্তাহ জিন্দাবাদ। [১৭]

১৩ জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে বর্ধমান হাউসে ছাত্র সংসদের তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেগম মাহমুদ তার অভিভাষণে বলেন, "অবিলম্বে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে, অন্যথায় দেশে শুধু কেরানি আর দারোগাই সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলেন, জীবন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এবং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য আমাদের দেশের মেরুদণ্ড গ্রাম এলাকায় এ কাজ শুরু করতে হবে।" [১৮] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদের তিন দিনব্যাপী প্রাদেশিক সম্মেলন ১৫ জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে শেষ হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্পে সিলেবাস পরিবর্তন, স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি, ছাত্রী নিবাস প্রতিষ্ঠা, বেতন বৃদ্ধি রোধ, ছাত্রদের জন্য উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দান, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা, স্ত্রী শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকারি কমিশন গঠন, শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন, ইডেন কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধান, বেগম রোকেয়া শাখাওয়াতের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত ছাত্রী নিবাসের এবং তৎসংলগ্ন রাস্তার নামকরণের দাবি জানান হয়। সর্বোপরি উচ্চ শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি জানান হয়। [১৯]

১৯৫৭ সালের শিক্ষা সংস্কার কমিটি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যহীনতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং একটি উদার শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তাব ছিল এই কমিটির সুপারিশে। ১৯৫১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। প্রতিবছর পাঁচ হাজার প্রাথমিক স্কুল বাধ্যতামূলক স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হবে বলা হয়। দশ বৎসরে সমগ্র প্রদেশের পঁচিশ হাজার স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের স্কীম হাতে নেয়া হলেও দুই বছর পর ১৯৫৩ সালে তা স্থগিত করা হয়। পরে ১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রহিতোহয়। [২০] ১৯৫৭ সালের সংস্কার কমিটি তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, জনগণের জীবনযাত্রা ও প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে একটি আদর্শ ও জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ণের জন্য কমিশনকে

Dhaka University Institutional Repository
দায়িত্ব দেয়। কমিশন খুব অল্প সময়ে জাতীয় আদর্শ শিশু কিশোর ও তরুণদের মানসিকতার উপর নির্ভর করে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে একটি রিপোর্ট পেশ করে ও সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে মানবিক ও উদার শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ এই রিপোর্টকে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী বলে সভা সমিতি ও পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেয় এবং গণমানুষের অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে পুর্ব পাকিস্তানে কোন উদার শিক্ষানীতি গড়ে উঠতে পারেনি [২১]

ঢাকায় পর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ৩দিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তী উপলক্ষে পল্টনে আব্দুল মোমেন তালুকদারের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করার স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ছুটি ঘোষণা এবং আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যনীতির নিন্দা করা হয়।[২২]

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ বলেন, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা সমস্যা, আর শিক্ষা সমস্যার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনের মান উন্নয়নের সমস্যা। প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিকারই হয়নি এ যাবৎ। তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের বহুবার উচ্চারিত দাবি দাওয়াগুলি পুনরায় সরকারের কাছে পেশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হলো

১। কম্পলসারি ও অকম্পলসারি স্কীম উঠিয়ে দেয়া কারণ এই স্কীম মিথ্যা, অবান্তর, ক্ষতিজনক।

২। শিক্ষকদের বেতন ১৫০ টাকার স্কেলে বৃদ্ধি করা।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সরকারি কর্মচারি বলে গণ্য করা।

৪। বয়োবৃদ্ধি ও আযোগ্যতার দরুন অপসারিত শিক্ষকগণকে গ্রাচুইটি দেয়ার ব্যবস্থা করা।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সন্তানদের বিনাবেতনে স্কুল কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করা।

৬। বাংলাভাষায় হরফ, ব্যাকরণ, বানান সংস্কার প্রবর্তন করা।[২৩]

শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষা সমস্যার অন্যতম সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। সমাজের প্রতিভাবান ও ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা কখনো শিক্ষক হতে চান না। কারণ বৃত্তি হিসেবে শিক্ষকতা পেশা আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা এবং সামাজিক মর্যাদা দিতে পারে না। প্রচলিত পরিবেশে সমাজে আর্থিক স্বচ্ছলতাই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। যাদের জীবিকা অর্জনের অন্য

Dhaka University Institutional Repository

পথ সম্পূর্ণ বন্ধ তারাই কতকটা নিরূপায় হয়েই শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ভাল ছাত্ররা,C.S.P, EPCS, উকিল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভাবান যোগ্য লোকের অভাবে শিক্ষার মান ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায় । উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকরা যখন দেখেন যে, Lecturer অপেক্ষা কম বিদ্বান Sub Deputy রাতারাতি Deputy হন। Lecturer গণ Matriclate Undergraduate বা Simple Graduate Deputy হতে কম বেতন পান সমাজে ঐ ভাগ্যবানদেরই কদর বেশি তখন তাদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দেয়। [২৪]

প্রাদেশিক গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে পল্টন ময়দানে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন এবং তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকদের পক্ষে দারিদ্র্য কোন অপরাধ বা লজ্জার বিষয় নয়। তাছাড়া তিনি সৎ ও পবিত্র কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাতে শিক্ষকরা সর্বদাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র কারণ শিক্ষকরা জ্ঞান সাধনার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা চাকুরি শেষে কোনরূপ পেনশন বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ পান না। ফলে জীবন সাধনার শেষে তাদের অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই প্রাথমিক শিক্ষাকে কম প্রাধান্য দিয়েছিল। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা, প্রচলিত মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় বাতিল এবং প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস সংক্ষিপ্ত ও পুস্তকের মূল্য হ্রাসের দাবি জানান হয়। [২৫]

পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সরকারি সমর্থক একটি গোষ্ঠী ভিন্ন মত পোষণ করেন। পাকিস্তান শাসনামলে পুরো সময়টা ধরে শাসকশ্রেণীর বাহিরে একটি শ্রেণী সরকারি সমর্থনপুষ্ঠ হয়ে শিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতেও শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে অধিকতর ইসলামি করণের দিকে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। যেমন আবুল ফজল আখতারুদ-দীন *দৈনিক আজাদের* ৬/৩/১৯৫৮ সালে আমাদের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধান অধ্যায়ে বলেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে একমাত্র জোড়া তালি ছাড়া যে বিশেষ কিছুই হয়নি আজ পর্যন্ত তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাইমারিতে কম্পলসারি- নন কম্পলসারি তারতম্য উঠিয়ে দিয়ে নতুন করে মডেল-নন-মডেলের বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামের আদর্শকে ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বাংলা রাষ্ট্র ও মাতৃভাষা সুতরাং থাকতে বাধ্য, উর্দু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা সুতরাং তা ছাড়া যায় না। বাংলা, উর্দু ও আরবি এ তিনটি ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষকদের ৬ দফা দাবি

পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের ছয় দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো:

১। বরিশাল ও রংপুর জেলার খাদ্য বিভাগীয় কন্ট্রোলারদ্বয় প্রাথমিক শিক্ষকগণকে সরকারি কর্মচারী গণ্য না করে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশন বন্ধ করে দেয়। প্রতিনিধিদল অবিলম্বে উক্ত অঞ্চলগুলির প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা রেশন পুনরায় বরাদ্দের দাবি জানান।

২। প্রতিনিধিদল সকল মহকুমা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন প্রদানের দাবি জানান। কারণ জেলা শিক্ষা অফিস থেকে বেতন নিতে যে নিয়ম চালু রয়েছে তাতে বেতন নিতে শিক্ষকদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।

৩। প্রতিনিধিদল প্রাথমিক শিক্ষকদের পোষ্যদের বিনাবেতনে ডিগ্রী ক্লাশ অবধি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থার দাবি জানান।

৫। ট্রেনিংকালে শিক্ষকগণকে বেতনসহ পঞ্চাশ টাকা ভাতা প্রদানের দাবি জানান।

৬। ম্যাট্রিক ও নন-ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের বেতনের মধ্যে ৫/- টাকার যে পার্থক্য রযেছে উহা রহিতের দাবি জানান হয়।[২৯]

প্রথম থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবি উঠলেও এবং বিভিন্ন সংস্কার কমিটি এ ব্যাপারে সুপারিশ পেশ করলেও স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১৭-১৮ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়নি। সরকারিভাবে প্রচার করা হয় ১৯৭৫ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হবে। ১৯৫৮ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশন ১৯৬০ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হলে সরকারি পক্ষ থেকে জানান হয় ১৯৭০ সালের মধ্যে উভয় অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। কিছুদিন পর এই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৯৭২ সালে বর্ধিত করা হয়। ১৯৬৬ সালে বলা হয় ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানে ছয় থেকে এগার বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি এবং তাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা রয়েছে মাত্র ২৬ হাজারের মতো। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের এক তৃতীয়াংশ মাত্র স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নড়বড়ে চালাঘর, বেড়া এবং চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী ইত্যাদি উপকরণ নেই। এই বিদ্যালয়গুলি গুরু মশাইয়ের পাঠশালা রয়ে গেছে। এগুলি আবার প্রতিনিয়ত বন্যা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৫ সালের জলোচ্ছ্বাসে ও ঘূর্ণিঝড়ে একমাত্র চট্টগ্রাম জেলায়ই দেড় হাজার

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিনষ্ট হয় বলে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্যেই জানা যায়। ১৯৬৬ সালের বন্যায় একমাত্র মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতেই তিনশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য বন্যাকবলিত এলাকার অবস্থা একইরূপ। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলি আর পুনর্নির্মাণ করা হয় না। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯০ ভাগই প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এভাবে গুরুমশাইয়ের পাঠশালাগুলি ধ্বংস হয় কিন্তু নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। প্রথম পঞ্চমবার্ষিক (১৯৫৫-৬০) পরিকল্পনাকালে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের কোন স্কীম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার ১৭/১৮ বৎসর অতিক্রম করলেও স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউটের সংখ্যা ছিল ৯৩টি। দশ বৎসর পর সে সংখ্যা কমে ৪৭টিতে নেমে আসে।[৩০] প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আর একটি অন্তরায় হচ্ছে ক্রমাগতভাবে ছাত্র বেতনের হার বৃদ্ধি, পুস্তকের উচ্চমূল্য, প্রতিবছর প্রায় প্রতিটি ক্লাশে অধিকাংশ পুস্তক পরিবর্তনের কারণে সাধারণ নাগরিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি অর্থনৈতিক কারণে সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারছে না।[৩১]

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের অগ্রগতিতে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তান স্কুলগামী ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও অবহেলো াজনিত এক সচেতন নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায় অথচ উপরোক্ত একই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫০ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানিশিশুদের একটি উন্নততর শিক্ষার সুযোগ দানের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ সেক্ষেত্রে ২০ বছরে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুণ আর পশ্চিম পাকিস্তানে তা বেড়েছে ৩০গুণ।[৩২]

ঝরে পড়ার (Drop-out) কারণ:

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের ঝরে পড়া (Drop-out)-এর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। নিম্নের সারণিতে ২ ও ৩ -এ বিভিন্ন বছরের ঝরে পড়া (Drop-out)-এর সংখ্যা দেখান হলো[৩৩]

সারণি-৩০

১৯৫৮-১৯৫৯		
বৎসর/লিঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
MF	৫৬.৪	৩৬.৩
M	৫৪.৫	৩২.৩
F	৬০.৭	৫০.২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩-১৯৬৪		
বৎসর/লিঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
MF	৫২.৯	৩০.৬
M	৫২.৪	২৯.৮
F	৫৪.৩	৩৩.৪

পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ঝরে পড়া (Drop-out)-এর হার বেশ কম। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ১০০জন শিক্ষার্থীর ভেতর নিবন্ধন হার ছিল ২১.২% যারা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছায় অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ একই সময়ে এ হার ছিল ৪৩.৮%। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৫-৬৬ সালে বালিকাদের প্রথম গ্রেড থেকে দ্বিতীয় গ্রেড পর্যন্ত ঝরে পড়ার (Drop-out)-এর হার ছিল ৪৯% এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এর হার ছিল ৮০%।

নিম্নের তালিকায় ১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ঝরে পড়ার (Drop-out) শতকরা হার:

সারণি-৩১

১৯৫৮-১৯৬২		
সময়/লিঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
MF	৮১.৮	৫৭.৬
M	৭৯.০	৫৪.৭
F	৮৮.৪	৬৭.৮

১৯৬০-১৯৬৪		
সময়/লিঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
MF	৭৮.৮	৫৬.২
M	৭৭.৩	৫৬.৩
F	৮২.৫	৭০.১

ঢাকা এবং নোয়াখালীতে গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫১জন শিক্ষার্থীর উপর গবেষণার ফলাফলে এর প্রধান কারণ হিসেবে পারিবারিক সমস্যা যেমন বাবা-মার অবহেলা, দারিদ্র্য, বিদ্যালয়ের ব্যর্থতা, বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহের অভাব, বেশি বয়সে স্কুলে গমন, বাল্য বিবাহ, মাদ্রাসায় ভর্তি যাতায়াতের জন্য যানবাহনের অপ্রতুলতাকে দায়ি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ হতে ১৯৬৭-৬৮ সময়কালে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ঝরে পড়ার সংখ্যা দেওয়া হলো [৩৩ক]

সারণি-৩২

উৎসর	বিবরণ	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী
১৯৪৭-৪৮	বালক	১১৬৫৪৭৩	৪০২৩৮৫	২৬৭৪৪৪	১৮৬০৬৪	৮৮৯৫২
	বলিকা	৪১৬৩৪৭	১২০৫৬১	৬৫৩৬৯	৩৭৯১৪	৬২২০
	মোট	১৫৮১৮২০	৫২২৯৪৬	৩৩২৮১৩	২২৩৯৬৮	৯৫১৭২
১৯৪৮-৪৯	বালক	১১৭১১৪১	৪০২৬৬১	২৭৫২২৪	১৯৮২৮৮	৭৯৩১২
	বলিকা	৭৩৭৫৮৪	১১৫৫৩৩	৬৫৬১৫	৩৭৩২৩	৬৪৩০
	মোট	১৬০৮৭২৫	৫১৮১৯৪	৩৪০৮৩৯	২৩৫৬১১	৮৫৭৪২
১৯৪৯-৫০	বালক	১০৫৮২৮১	৩৭৯৮১০	২৬৬২৯৬	১৯৯৫৮৩	৮০৫৯৮
	বলিকা	৩৭৫৭৯৬	১১০৭৪৪	৬৩৩৭৫	৩৭৭৭১	৬১৩৩
	মোট	১৪৩৪০৭৭	৪৯০৫৫৪	৩২৯৬৭১	২৩৭৩৫৪	৮৬৭৩১
১৯৫০-৫১	বালক	১০৯৬৭১৪	৪০৫১১৭	২৬৪৪১৪	১৯৮১৬৯	৮৪১০৪
	বলিকা	২৯০৮৩২	৯৮৯৫৯	৫৯০১৩	৩৬২১৮	৫৭৬৬
	মোট	১৩৮৭৫৪৬	৫০৪০৭৬	৩২৩৪২৭	২২৩৪৩৮৭	৮৯৮৭০
১৯৫১-৫২	বালক	১০৬৪৯৪৩	৩৯৪০০৫	২৬২২০৫	১৮৪৭৯২	১২১৪৬৮
	বলিকা	৩৯১২৪৮	১১৮০৫৮	৭১৪৩৭	৪০৪১৫	১৭১৬৪
	মোট	১৪৫৬১৯১	৫১২০৬৩	৩৩৩৬৪২	২২৫২০৭	১৩৮৬৩২
১৯৫২-৫৩	বালক	১১১৮৭৯৩	৪০৯৮১৩	২৬৪৪১৩	১৭৬৯৫১	১৩৩১৬৩
	বলিকা	৪৩৯১৫৪	৪০৯৮১৩	৬৯৮৫৫	৪৪০৪৫	২৩৭৪০
	মোট	১৫৫৭৯৪৭	১২২২৭৮	৩৩৪২৬৮	২২০৯৯৬	১৫৬৯০৩
১৯৫৩-৫৪	বালক	১০৮১২৭৭	৪১২০৩০	২৬১৯২১	১৯০৮৫৪	১৪৩৫৯২
	বলিকা	৪১৫৩৬১	১৩০০৩৫	৭৮৪৪৫	৪৮০১৭	২৫৬১২
	মোট	১৪৯৬৬৩৮	৫৪২০৬৫	৩৪০৩৬৬	২৩৮৮৭১	১৬৯২০৪
১৯৫৪-৫৫	বালক	১০০২৩৮৭	৪১৩০৮৯	২৬৯৭১১	১৯৮৪৯৬	১৪৮৪০৪
	বলিকা	৪০৪২৬৮	১২৯৬৯৩	৭৯৮৬৭	৫১৭৬৭	৩১০৯৫
	মোট	১৪০৬৬৫৫	৫৪২৭৮২	৩৪৯৫৭৮	২৫০২৬৩	১৭৯৪৯৯
১৯৫৫-৫৬	বালক	৯৭৫৪৫১	৪৪৭৩৮৮	২৬৯৭৯৮	১৯৯৮৪৬	১৪৫৮৫৭
	বলিকা	৪১৩১২০	১৫৩৮৯৩	৮৩৬৯৯	৫২৩৯৪	৩২৫৯৩
	মোট	১৩৮৮৫৭১	৬০১২৮১	৩৫৩৪৯৭	২৫২২৪০	১৭৮৪৫০
১৯৫৬-৫৭	বালক	১০২৬৮৪২	৪১৩৫৪৪	২৭৬১২৬	২০৭৫০২	১৫৮৮৫৯
	বলিকা	১৩৩১৮১	১৫০৭০০	৮৮৪৪৪	৫৬৬৬৪	৩৫৩৯২
	মোট	১৪৬০০২৩	৫৬৪২৪৪	৩৬৪৫৭০	২৬৪১৬৬	১৯৪৪৫১
১৯৫৭-৫৮	বালক	৯৯৬৯৭৪	৪১৭৭৯৮	২৯৫৯৫৩	২২৭২৭২	১৭৮০৬৪
	বলিকা	৪২২১৬৫	১৫৬৩০৪	৯৮২২২	৬৭০৯০	৪২৬৪৩
	মোট	১৪১৯১৩৯	৫৭৪১০২	৩৯৪১৭৫	২৯৪৩৫২	২২০৭০৭
১৯৫৮-৫৯	বালক	১৬৫৫৫৯২	৪৫৩২১৫	৩০৪৪৫১	২৩৩৫৫৪	১৮৯২৪৬
	বলিকা	১৭৩১৯২	১৬৫৭৬৮	৯৫৬৬৩	৬৪৫৮২	৪৩৬৭৫
	মোট	১৫২৮৭৮৪	৬১৮৯৮৩	৪০০১১৪	২৯৮১৩৬	২৩২৯২১
১৯৫৯-৬০	বালক	১১৮৬৫৫৩	৪৮৭৫৭৩	৩০০৩০২	২৩৭১৭৭	১৯৩৫২৯

Dhaka University Institutional Repository

	বলিকা	৪৭৭৬৮৪	১৭১২১১	১০৬০৬৬	৭১৩৮২	৪৫৫৩২
	মোট	১৬৬৪২৩৭	৬৫৮৭৮৪	৪০৬৩৬৮	৩০৮৫৫৭	২৩৯০৬১
১৯৬০-৬১	বালক	১২০৯৭২৭	৪৯৩৫৪৬	৩২২৭৩০	২৫৩৭০৫	২০১১২০
	বলিকা	৫৩৪২৯৪	১৯৫২৩২	১১১৭৬৯	৬৭০৬৬	৪৬১১৯
	মোট	১৭৪৪০২১	৬৮৮৭৭৭	৪৩৪৪৯৯	৩২০৭৭১	২৪৭২৩৯
১৯৬১-৬২	বালক	১২০৮৮২৯	৫৩৩০৯৫	৩৪৯০৫৮	২৬৭৮১৯	২০৯৪৭৭
	বলিকা	৫১০৭৯৪	২০৩৫৮৮	১১৯৭৪৭	৭৫১৭০	৪৯১৫২
	মোট	১৭১৯৬২৩	৭৩৬৬৮৩	৪৬৮৮০৫	৩৪২৯৮৯	২৫৮৬২৯
১৯৬২-৬৩	বালক	১২২৬৮৯৫	৫৮৫০৩৬	৩৬৫৩৬২	২৯৭৩৬৫	২৪০২৯২
	বলিকা	৫৩৫৮৮৬	২১৬১৫৫	১২৩১২৮	৭৯৭৭৭	৫৭১৫৩
	মোট	১৭৬২৭৮১	৮০১১৯১	৪৮৮৪৯০	৩৭৭১৪২	২৯৭৪৪৫
১৯৬৩-৬৪	বালক	১১৭১৩১৭	৫৮৩৯৯৯	৪০৪১৮৩	৩৪২৩৫৬	২৬৯৩২৯
	বলিকা	৫৭০৮১৩	২৪৫৪০০	১৬৪০৭১	১১৯৬৭৫	৮৩৭৩৫
	মোট	১৭৪২১৩০	৮২৯৩৯৯	৫৬৮২৫৪	৪৬২০৩১	৩৫৩০৬৪
১৯৬৪-৬৫	বালক	১১৭৬৩৭৬	৫৯১৭৫৮	৪১৬৩১২	৩৮৬৬০০	৩৩০৬৬৫
	বলিকা	৫৪৮০৯৮	২৬১৩১৯	১৯২০৩৭	১৪৮০৩৫	১০৭৩১৪
	মোট	১৭২৪৪৭৪	৮৫৩০৭৭	৬০৮৩৪৯	৫৩৪৬৩৫	৪৩৭৯৭৯
১৯৬৫-৬৬	বালক	১০৭৫২৭৭	৬১৯২৩২	৪৯৯৯৭৯	৪১৩৯৯৭	৩৬৬১১৩
	বলিকা	৫৫৭৫৮২	২৮৩৭২১	২০৭৯৫৮	১৫১৮৮৪	১০৮৩৪৯
	মোট	১৬৩২৮৫৯	৯০২৯৫৩	৭০৭৯৩৭	৫৬৫৮৮১	৪৭৪৪৬২
১৯৬৬-৬৭	বালক	১১৭১৯৮১	৬৬৪৩৯৬	৫৫৪৯২২	৪৩০৫৬৯	৩৫৯৭৫৩
	বলিকা	৫৭৭৫৪৭	৩১২৮০৬	২২৮৯০১	১৭৬৪২৯	১২৯০৬৬
	মোট	১৭৪৯৫২৮	৯৭৭২০২	৭৮৩৮২৩	৫০৬৯৯৮	৪৮৮৮১৯
১৯৬৭-৬৮	বালক	১৩৫৯০৪৬	৭৮৭৬৯৯	৫৮৮৮৩৭	৪৮০৩৪২	৩৭৬৬৫৮
	বলিকা	৬২০১২৯	৩৬৩৬০৯	২৬৭৩৭২	১৯৯৫৭৭	১৫৩০৭৩
	মোট	১৯৭৯১৭৫	১১৫১৩০৮	৮৫৬২০৯	৬৭৯৯১৯	৫২৯৭৩১

মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ব্রিটিশ আমলে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মতোই পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল চরমভাবে অবহেলিত। মাধ্যমিক শিক্ষা জাতির বহুমুখী প্রয়োজন মিটানোর জন্য শিক্ষার্থীকে নৈপুন্য ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। পাকিস্তান সরকার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে পুনর্গঠনের জন্য মাঝে মাঝে কমিটি ও কমিশন গঠন করলেও শেষ পর্যন্ত সরকারের অবহেলো া, ঔদাসীন্যতা, গুরুত্বপ্রদানের অভাবহেতু মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১০ বছরের মেয়াদকে ১২ বছর করা ছাড়া কার্যত কিছু হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশিকা পাসের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮২ হাজার। দশ বৎসর পর ১৯৬১ সালে সে সংখ্যা দাড়ায় তিন লক্ষ। অর্থাৎ দশ বৎসরে পূর্বপাকিস্তানে প্রবেশিকা পাশের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬.৩ ভাগ। কার্যত কিন্তু এর সংখ্যা বাড়েনি। কেননা এই দশ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ। এছাড়াও ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে প্রবেশিকার সংখ্যা কিছু বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ১০ হাজার। ১৯৫৯ সালে সে সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার দাড়ায়। অর্থাৎ নয়-দশ বৎসরে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে বরং শতকরা ৫ ভাগ কমে যায়। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার আর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজারের মতো। ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা নেমে য়ায় তিন হাজারে এবং শিক্ষকের সংখ্যা নেমে যায় ২১ হাজারের নীচে। অর্থাৎ দশ বছরে প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৩ ভাগ আর মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা কমেছে ১১ ভাগ [৩৪] ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ছেলে ও মেয়েদের **জন্য** ৩৫টি । ৩৫টি সরকারি স্কুলের জন্য ব্যয় করা হয় বছরে ২৩১৫০০০/- টাকা । কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলি অধিকাংশই সরকারি সাহায্য পায়নি। ফলে স্কুলগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারেনি।[৩৫]

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী আব্দুস সাত্তার ঢাকায় একটি পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং শিক্ষা বিভাগের সহকারি ডিরেক্টর ঢাকা রোটারি ক্লাবে পাবলিক স্কুলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। কিন্তু পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন মহলো থেকে প্রতিবাদ জানান হয়। তাদের ধারণা পূর্বে ইংল্যান্ডে এই ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানদের শিক্ষার জন্য । তাদের ধারণা পূর্ব পাকিস্তানে এই ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে একই ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। [৩৬]

১৯৪৯ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অনুমোদন প্রাপ্ত হাই ইংলিশ (HE) এবং মিডল ইংলিশ (ME) স্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৮৫ এবং ২১১৫টি। হাই ইংলিশ স্কুল (HE) অনুদানের পরিমাণ বালক ৮৪২৯৯০/- রুপি এবং বালিকা ১৭৫৪৪০/- রুপি । মিডল ইংলিশ স্কুলে (ME) অনুদানের পরিমাণ বালক ১৮১২১৪ রুপি এবং বালিকা ১২৪৭০০/- রুপি । চট্টগ্রাম জেলায় (HE) স্কুলের সংখ্যা ৮ এবং ME স্কুলের সংখ্যা ১৩৫টি। নোয়াখালী জেলায় HE স্কুলের সংখ্যা ৫৬ এবং ME স্কুলের সংখ্যা ১১৯টি; টিপেরা জেলায় HE স্কুলের সংখ্যা ১২৮ এবং ME স্কুলের সংখ্যা ১৩৫টি; পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে HE স্কুলের সংখ্যা ১ এবং ME স্কুলের সংখ্যা ১৪টি; চট্টগ্রাম জেলায় HE স্কুলে অনুদানের পরিমাণ ৫৪৭২০ রুপি এবং ME স্কুলের জন্য ৮৪০০/- রুপি । নোয়াখালী জেলায় HE স্কুলের জন্য ৩৯৯০০/- রুপি এবং ME স্কুলের **জন্য** ১২৮৮৮/-রুপি । টিপেরা জেলায় HE স্কুলের জন্য ৬৬৭২০/- রুপি এবং ME স্কুলের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

১২৯২৪/-রুপি । সিলেট জেলায় HE স্কুলের জন্য ১১৫০৮৩/- রুপি এবং ME স্কুলের জন্য ৪৫৭৫২/- রুপি রুপি প্রদান করে সরকার। প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ অনেক কম। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে অনুদান বণ্টন করা হয়। অনুদানের জন্য স্কুলগুলির সাধারণ যোগ্যতা ধরা হয় যেমন রেজাল্ট, স্কুলের যন্ত্রপাতি, পাঠাগার সুবিধা ও স্টাফদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে।[৩৭]

সিলেট জেলায় বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু বিভাগ পূর্ব সময়ে আসাম সরকারের কাছ থেকে খুব সামান্যই সাহায্য পাওয়া যেত। এই স্কুলগুলি অনেক কষ্টে ছাত্র বেতনে চলত। কিন্তু বিভাগ পরবর্তীকালে ছাত্ররা কলকাতা ও অন্যত্র চলে গেলে ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া আয় কমে যায়। ফলে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।[৩৮]

৪ নভেম্বর ১৯৫৭ সালে বখশী বাজারে নবকুমার ইনিস্টিটিউটের সামনে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলন শুরু হয়। সভাপতির ভাষণে প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান খান জাতির জীবনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন যে, নিঃস্বার্থ মনোভাব ও শিক্ষার মহান আদর্শই শিক্ষকদের জীবনের ব্রত। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ বলেন যে, শিক্ষার সহিতোশিক্ষকের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষকের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের প্রশ্ন বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন আজ যেখানে শিক্ষকদের কোনক্রমে বেঁচে থাকার ন্যুনতম প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো হয় না। সেখানে জাতির সেবা বড় বড় বুলি আওড়ানো তাদের অবহেলিত ভাগ্যের প্রতি মর্মান্তিক উপহাসের শামিল। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। এদের মধ্যে ২০ জন মহিলো ।। সম্মেলনে বক্তারা বলেন শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার সময় অর্থের প্রশ্ন উঠে কিন্তু এম.পি.দের বেতন বৃদ্ধির সময় সে প্রশ্ন উঠে না। কাজি আবুল কাশেম বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য প্রদেশের শতকরা ৪২ ভাগ স্কুলের অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছেন।[৩৯] সম্মেলনে শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া জানুয়ারি ১৯৫৮ সালের মধ্যে পুরণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান হয়। অন্যথায় ৪ ফেব্রুয়ারি হতে শিক্ষকরা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করবেন বলে ঘোষণা দেন। এই সম্মেলনে যে দাবি জানান হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: শিক্ষা কমিশন গঠন এবং তাতে শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি; বেসরকারি বিদ্যালয় গুলিকে সরকারি বিদ্যালয়ের সাথে একই পর্যায়ভুক্ত করা; গ্রাম এবং শহর এলাকায় রেশন প্রদান; শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি; অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন বা এককালীন অর্থ প্রদান, স্কুল সমূহের অনুমোদন আশু বাতিল না করে আর্থিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলি আর্থিক সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধ, শিক্ষকদের পুত্র কন্যাদের বি.এ. পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান, স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে প্রধান শিক্ষককে কমিটির সেক্রেটারি, পঞ্চম শ্রেণীকে প্রাথমিক বিভাগ হতে মাধ্যমিক বিভাগে অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বৎসর নির্ধারণ; প্রশ্নপত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়নকারী পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক শিক্ষকদের মধ্যে হতে গ্রহণ; শাসনতন্ত্রে শিক্ষালাভের অধিকারমূলক ঘোষণা সন্নিবেশিত করা; ৯২(ক) ধারার আমলে যেসব শিক্ষক প্লানিং কমিটির সুপারিশে সাময়িকভাবে চাকরি হারিয়েছেন তাদের উপরোক্ত সময়ের জন্য বেতন দান এবং শিক্ষা ডিরেক্টর ও সেক্রেটারিয়েটের একত্রিকরণের দাবি জানান হয়। [৪০]

মাধ্যমিক শিক্ষকদের স্মারকলিপ্পি প্রদান

১৯৫৮ সালে ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি প্রাদেশিক মন্ত্রী আতাউর রহমানের কাছে নিম্নোক্ত স্মারকলিপি পেশ করেন

১। সরকার বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে প্রদেশের সকল বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

২। সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কেরানি, লাইব্রেরিয়ান, দারোয়ান ও দফতরীদের মহার্ঘ্যভাতা ন্যূনতম পক্ষে ৩০টাকা নির্ধারণ।

৩। সরকার শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড টাকা প্রতি দুই আনা করে সরকারি সাহায্য দানের ব্যবস্থা এবং সমগ্র প্রদেশে প্রত্যেকটি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম চালু করে উক্ত দুই আনা হারে সরকারি সাহায্য দানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪। সরকার প্রদেশের মফস্বল এলাকাভুক্ত সমুদয় বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রেশন দানের ব্যবস্থা করা;

৫। সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও বেসরকারি কলেজগুলির ন্যায় বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে পদাধিকার বলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কার্যনির্বাহী কমিটির সেক্রেটারি পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা করা এবং এডুকেশন কোডে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর দ্বারা উক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যনির্বাহক কমিটিকে কেবলমাত্র উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে কাজ করার ব্যবস্থা করা, সমস্ত বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে বিভাগীয় ইনসপেকটরের নিকট সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের ন্যায় দায়ি থাকার ব্যবস্থা করা;

৬। প্রদেশের সমুদয় বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর ছেলে-মেয়েরা যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ পায় তজ্জন্য সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

৭। পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তৃপক্ষ বহু বিঘোষিত সরকারি নীতির উপেক্ষা করে ৭/৮ বৎসর পূর্বে গঠিত তথাকথিত এডুকেশন রিকনস্ট্রাকশন কমিটির দ্বারা সন্নিবেশিত বিদেশ হতে হুবহু নকল সিলেবাস গোপনে চালু করে সরকারি নীতির চরম অবমাননা করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় সৃষ্টি করে উহাকে পঙ্গু করবার ব্যবস্থা করে। সরকার অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের প্রতিরোধ কল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮। সরকার অবিলম্বে মাধ্যমিক স্কুল সমূহের শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদি নিয়োগের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। সরকার অবিলম্বে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সমবায়ে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পুনর্গঠিত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। [৪১]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা ও সমাধান নিয়ে অনেক সময় ভিন্ন মত দেখা যায়। শাসক শ্রেণীর বাহিরেও একটি শ্রেণী শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামি করণের দিকে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। যেমন– আবুল ফজল আখতারু-দ-দীন দৈনিক আজাদের ৬/৩/১৯৫৮ তারিখে আমাদের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধান প্রবন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষার সিলেবাস সম্বন্ধে বলেন–

ষষ্ঠ শ্রেণী	:	বাংলা, উর্দু, আরবি, ফিকাহ ও অংক এবং ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞান এ তিনটির যে কোন ১টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে।
৭ম শ্রেণী	:	বাংলা, উর্দু, আরবী, ফিকাহ ও আকায়েদের যে কোন একটি এবং গণিত, আমপারার তফসীর। ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান-এ তিনটির একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে।
৮ম শ্রেণী	:	৭ম শ্রেণীর অনুরূপ। কেবলমাত্র আমপারার স্থলে কোরানের প্রথম ৩ পারার তফসীর।
৯ম ও ১০ম শ্রেণী	:	বাংলা, উর্দু, আরবি, গণিত, কোরানের তাফসীর ১০ পারা পর্যন্ত, ফিকাহ বা আকায়েদ। ইতিহাস,ভূগোল ও বিজ্ঞান থেকে যে কোন একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে। [৪২]

পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পক্ষকাল ব্যাপী শিক্ষা সেমিনারের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা ডিরেক্টর শামসুল হক ৩১ অক্টোবর ১৯৫৯ সালে বলেন, সৃষ্টি ধর্মীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়েজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ কারণ ইহা প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষক এবং উচ্চতর ও পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সরবরাহ করে থাকে। তিনি দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। [৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার (Dropout) কারণ

১৯৬৫-৬৬ সালের তথ্য অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ঝরে পড়ার (Drop-out) এর হার ছিল ৫৫%। বালকদের জন্য এই হার ৫১.৪% এবং বালিকাদের জন ৭৩.৬%। পঞ্চম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত Drop-out এর হার সবচেয়ে বেশি ৪৭.৭%। নিম্নের সারণিতে ধরে রাখা বা Rentention-এর হার দেখান হলো[৪৪]

সারণি-৩৩

১৯৫৯-১৯৬৪ পর্যন্ত

পূর্ব পাকিস্তান

	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
MF	১০০	৫২.৩	৪৩.৮১	৩৯.৬৫	৪০.১৭	৩৪.৭০
M	১০০	৫৪.৪৬	৪৯.১৪	৪৪.৯১	৪৫.৬৬	৩৯.২২
F	১০০	৩০.০০	২০.৭২	১৬.৮৫	১৬.৩৬	১৫.১৩

পশ্চিম পাকিস্তান

	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
MF	১০০	৯৩.৯৮	৭৭.৫৯	৭৭.৯৯	৭০.৫৪	৫৩.৩৭
M	১০০	৯৯.৮৮	৮১.২৭	৭৫.১২	৭০.৫৬	৪৯.৯৮
F	১০০	৬৮.৭৪	৬১.৮৮	৫৬.৮৭	৭০.৪২	৬৭.৮৯

ঢাকা শহরের মাধ্যমিক পর্যায়ের ঝরে পড়া শিশুদের উপর এক জরিপে দেখা যায় ১৪২৭ জন শিক্ষার্থী যারা ১৯৬১ সালে ৭ম শ্রেণীতে ছিল তাদের ভেতর ১৯৬৫ সালে মাত্র ৫৪৪ জন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ছাত্রদের কিছু পূর্ববর্তী শ্রেণীতে রয়ে যায় এবং বাকীরা Drop-out হয়। এর কারণ স্কুলের পাওনা পরিশোধ না করা, বই ক্রয়ের জন্য অর্থের অভাব, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, যানবাহনের অপ্রতুলতা, অসুস্থ্যতা, সামাজিক বাধানিষেধ ইত্যাদি।[৪৪]

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ হতে ১৯৬৭-৬৮ সময়কালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ঝড়ে (Drop-out) পড়ার সংখ্যা দেওয়া হলো : [৪৪ক]

সারণি-৩৪

বৎসর	বিবরণ	৬ষ্ঠ শ্রেণী	৭ম শ্রেণী	৮ম শ্রেণী	৯ম শ্রেণী	১০ম শ্রেণী
১৯৪৭-৪৮	বালক	৭৩০৩৭	৫৪৫৬৪	৪৭৩২৪	৩৮২২৮	৩৫৪২৫
	বলিকা	৪৩৩৫	১৯০৭	১৫০৮	৯৯৯	৯২৬
	মোট	৭৭৩৭২	৫৬৪৭১	৪৮৮৩২	৩৯২২৭	৩৬৩৫১
১৯৪৮-৪৯	বালক	৬৬৪৭২	৬৯৫৫৪	৫৬৪৩৭	৪৬৯১৩	৩৯৭৪৪
	বলিকা	৪৯৮৪	৩০৩১	১৬৬২	১১৮২	৮৫০
	মোট	৭১৪৫৬	৭২৫৮৫	৫৮০৯৯	৪৮০৯৫	৪০৫৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯-৫০	বালক	৭৪১৮৫	৫৩৪৬৮	৪৭২৬৪	৪১০৮৩	৩৬০১৭
	বালিকা	৪৫৩০	২০৪০	১৫১১	১১০৯	৮৬৯
	মোট	৭৮৭১৫	৫৫৫০৮	৪৮৭৭৯	৪২১৯২	৩৬৮৮৬
১৯৫০-৫১	বালক	৬৮৯৫২	৫২০৬৪	৪৫০৪১	৩৯৬৫৬	৫৩৫০৩
	বালিকা	৪১১৬	১৮৮৮	১৩২৪	৯৫৭	৭২৪
	মোট	৭৩০৬৮	৫৩৯৫২	৪৬৩৬৫	৪০৬১৩	৫৪২২৭
১৯৫১-৫২	বালক	৭১৯৮৩	৬৬৫৭২	৫২৪১১	৪৪৭৮৬	৪০১৫০
	বালিকা	৪৮০৩	৩৫৯৩	২১১৮	১৪২৬	১২৫৩
	মোট	৭৬৭৮৬	৭০১৬৫	৫৪৫২৯	৪৬২১২	৪১৪০৩
১৯৫২-৫৩	বালক	৭৪১৩৯	৬৯৬৬৬	৫৮৬৩৫	৪৭৩০২	৩৯৭৯৮
	বালিকা	৫৯৯২	৪২৭৫	২৮৮৪	১৯৯৪	১৪০৬
	মোট	৮০১৩১	৭৩৯৪১	৬১৫১৯	৪৯২৯৬	৪১২০৪
১৯৫৩-৫৪	বালক	৮০৬৪১	৬৭৫১২	৫৬২১৮	৪৫০৭০	৪২৮৮০
	বালিকা	৫৯০৩	৩৮৪৬	২৯০৭	১৫৯৩	১১৯৬
	মোট	৮৬৫৪৪	৭১৩৫৮	৫৯১২৫	৪৬৬৬৩	৪৪০৭৬
১৯৫৪-৫৫	বালক	৮৭০৮৬	৭০৬৮৫	৬১৯৫৮	৪৯৯০৫	৪৭২০০
	বালিকা	৭০৫৪	২৭৬৯	২৯৬১	১৮২১	১৪৫০
	মোট	৯৪১৪০	৭৩৪৫৪	৬৪৯১৯	৫১৭২৬	৪৮৬৫০
১৯৫৫-৫৬	বালক	৮৩৩২০	৭৬৮৯০	৬৪৩২৬	৫৩১৫৫	৪৬৭৭৫
	বালিকা	৮৫৯৪	৪৩৬৯	৩২০৭	২১৪৭	২৩৩৬
	মোট	৯১৯১৪	৮১২৫৯	৬৭৫৩৩	৫৫৩০২	৪৯১১১
১৯৫৬-৫৭	বালক	৮৮৬২৭	৭৫৯৯৪	৬৮৩৮৪	৫৭৪৪১	৫০৩৫৫
	বালিকা	৭৬৮৮	৫৩৫১	৩৮১৩	২৫৪২	১৯৪০
	মোট	৯৬৩১৫	৮১৩৪৫	৭২১৯৭	৫৯৯৮৩	৫২২৭৫
১৯৫৭-৫৮	বালক	৯৩৩২৫	৮১২১১	৭২১২৬	৫৬৬৮৬	৫১৪৩১
	বালিকা	৯৮৬০	৬৮৫৫	৫২৮৪	৩৯০৩	২৭৯৪
	মোট	১০৩১৮৫	৮৮০৬৬	৭৭৪১০	৬০৫৮৯	৫৪২২৫
১৯৫৮-৫৯	বালক	১০২৩৮২	৮৫৮৯২	৭২৪৯০	৫৮৫৬০	৫০৯০৫
	বালিকা	১১৭৮৩	৭১৮২	৫৩৭৪	৩৯৩১	২৮৫৮
	মোট	১১৪১৬৫	৯৩০৭৪	৭৭৮৬৪	৬২৪৯১	৫৩৭৬৩
১৯৫৯-৬০	বালক	১০৮৭৩৪	৮৮৯২৬	৭৮৬৬২	৬২৫৫১	৬০২৭৭
	বালিকা	১৩০৯৭	৮১০৩	৫৯৮৫	৪৩৯৬	৩১০২
	মোট	১২১৮৩১	৯৭০২৯	৮৪৬৪৭	৬৬৯৪৭	৬৩৩৭৯
১৯৬০-৬১	বালক	১১০৮৫০	৯৩২৬২	৮১৮১৩	৬৬২৮৭	৪৮৪৩৭
	বালিকা	১৪৮৩০	৯০৩৯	৬৫২৮	৪৩৬৪	২৩৬৪
	মোট	১২৫৬৮০	১০২৩০১	৮৮৩৪১	৭০৬৫১	৫০৮০১
১৯৬১-৬২	বালক	১২৩৪৫৯	১০০৭২২	৮৫০২৬	৬৬৮৭৬	৫৭৫৯৬
	বালিকা	১৪১০৮	১০১১৩	৭৩৮৬	৪৮৩১	৩৩৮৮
	মোট	১৩৭৫৬৭	১১০৮৩৫	৯২৪১২	৭১৭০৭	৬০৯৮৪
১৯৬২-৬৩	বালক	১৪৭৪৮৫	১২০০৮২	৯৯৮৭৬	৮৬৪৯৭	৬১৫২১
	বালিকা	১৯৩০২	১৩১৮৫	৯৯৭৬	৭৩১২	৫৩৬৩
	মোট	১৬৬৭৮৫	১৩৩২৬৭	১০৯৮৫২	৯৩৮০৯	৬৬৮৮৪
১৯৬৩-৬৪	বালক	১৬১৭৭৬	১৩৮০৭২	১২০২০৪	৯৪৬৩০	৭৪৩২৪
	বালিকা	২১৭৫৫	১৬৫২০	১৩৫৬২	৮৬০৫	৬৬০৮
	মোট	১৮৩৫৩১	১৫৪৫৯২	১৩৩৭৬৬	১০৩২৩৫	৮০৯৩২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪-৬৫	বালক	১৭৪৬৭৪	১৪৩১২২	১৩২৩৯৪	১০৭২৪২	৯০৪২৪
	বলিকা	২১৭৫৫	১৬৫২০	১৩৫৬২	৮৬০৫	৬৬০৮
	মোট	১৯৬৪২৯	১৫৯৬৪২	১৪৫৯৫৬	১১৫৮৪৭	৯৭০৩২
১৯৬৫-৬৬	বালক	২০০০১৭	১৬৯০২৩	১৫৪০২৪	১১৮৫২২	৯৭২৬৬
	বলিকা	৩৭৯৬১	২৮১৯৬	১৯৪৮৪	১২৮৩৯	১০০৯১
	মোট	২৩৭৯৭৮	১৯৭২১৯	১৭৩৫০৮	১৩১৪৯১	১০৭৩৫৭
১৯৬৬-৬৭	বালক	২১০২০৬	১৭৫৬৬৩	১৫৩৯৮৩	১৩৬০৩৩	১১৩৪০৩
	বলিকা	৪২০২৫	৩৩৬৮৩	২৭০২৭	১৪৬৪৬	১০৬১৫
	মোট	২৫২২৩১	২০৯৩৪৬	১৮১০১০	১৫০৬৭৯	১২৪০১৮
১৯৬৭-৬৮	বালক	২৩৮৫১৩	২১০২১৮	১৯৬৭৪০	১৪২৫৬০	১১৮৭৫৮
	বলিকা	৪৯৭২৯	৪০০২৯	৩৩৭৭২	২০৮৮১	১৫০৫৪
	মোট	২৮৮২৪২	২৫০২৪৭	২৩০৫১২	১৬৩৪৪১	১৩৩৮১২

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণ

শিক্ষা সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্য হচ্ছে বিপুল সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে। অনেকে এই অকৃতকার্যতার জন্য নিম্নলিখিত কারণকে দায়ি করেন যেমন-

১. রাজনৈতিক কারণ

ছাত্ররা দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়াশুনায় অমনযোগী হয়ে পড়ে।

২. পুস্তক সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের বই পুস্তকে অসংখ্য ভুল থাকে। পুস্তকের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ছাত্ররা সুলভ মূল্যে ভাল বই পায় না। তাই তারা ভালভাবে পড়াশুনা করতে পারে না। তাছাড়া বই ঘন ঘন পরিবর্তিত হয় এবং পুস্তক প্রকাশে কোন নিয়মানুবর্তিতা না থাকায় শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পুস্তক কিনতে পারা যায় না। ঘন ঘন পুস্তক পরিবর্তন হওয়ায় প্রতিবছরই ছাত্রদের নতুন বই কিনতে হয় ফলে দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে সময়মত বই ক্রয় সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় পুস্তক বিক্রেতারা নোটবই ছাড়া টেক্সট বুক বিক্রি করতে চায় না। বাজারে Key book, Sure Success, Made Easy ছড়াছড়ি।

৩. শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষকগণ মিশনারী মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন না। জীবিকার্জনের অন্যসব পথ বন্ধ হয়ে গেলেই শুধু শিক্ষকতা করতে আসেন। শিক্ষকতার দিকে প্রবণতা আছে কিনা সেটা যাচাই না করেই অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে অধ্যাপনা করতে পারেন না। স্বল্প বেতনের কারণে সরকারি বেসরকরি প্রায় সকল স্কুলের শিক্ষকই প্রাইভেট পড়ান। ফলে তাদের শক্তি সমর্থ নষ্ট হয়ে যায়। স্বল্প বেতনের কারণে মেধাবীরা শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতে চান না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সিলেবাস সমস্যা

ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন এবং সিলেবাসের বোঝা এত বেশি যে, ছাত্ররা অনেক কিছু পড়তে গিয়ে সব মনে রাখতে পারে না। তারা না বুঝে কেবল মুখস্ত করে। ফলে মেধার প্রকৃত বিকাশ ঘটে না। তাছাড়া ইংরেজ আমলের কারিকুলাম ও সিলেবাসকেই জোড়াতালি দিয়ে চালান হয়। [৪৫]

৫. পাঠাগার সমূহের সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের পাঠাগার সমূহের অবস্থা ও উহার বিভিন্ন সমস্যার প্রতি শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান পাঠাগার সমিতির পক্ষ থেকে কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠাগার সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পাঠাগার নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নামমাত্র পাঠাগার রয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা সমস্যায় জর্জরিত। স্মারকলিপিতে পাঠাগার সমূহের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে প্রধানত ৪টি মূল সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়-

১। পাঠাগারের জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাব;

২। উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মচারির অভাব;

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব;

৪। পুস্তক সংগ্রহ ও পরিচালন ব্যবস্থার অসুবিধা।

স্মারকলিপিতে সাধারণ পাঠাগার এবং প্রচলিত পাঠাগার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করা হয়।[৪৬]

পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল সমূহের শিক্ষা সেশন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

৯ জুন ১৯৬০ সালে প্রাদেশিক গভর্নর লে. জে. মোহাম্মদ আযম খানের সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৯৬১ সাল হতে প্রদেশের স্কুল সমূহের শিক্ষা সেশন জানুয়ারি-ডিসেম্বরের পরিবর্তে জুলাই-জুনে পরিবর্তনের সিদ্ধান গৃহীত হয়। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী হাবিবুর রহমান, শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি এস.এম.শরীফ প্রাদেশিক চীপ সেক্রেটারি এম. আজফার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ পৃথকীকরণ সম্পর্কিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কার্যকরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তনের দাবি

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে জুলাই-জুন শিক্ষাবর্ষ চালু করায় শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে সম্মেলনে পূর্বের ন্যায় জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু করার দাবি জানান সরকারের কাছে। সম্মেলনে মফস্বল এলাকার হাইস্কুল সমূহের বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়। কারিকুলাম হতে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ফলে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সবাই হিমশিম খাচ্ছে। শিক্ষক সমিতি পাঠ্যপুস্তকের ভুল সংশোধনীর জন্য সংশোধনী কমিটি নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে।[৪৮]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের সমস্ত বেসরকারি স্কুলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে কলেজ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সরকারি অফিসারদের। বেসরকারি অনেক স্কুল টাকার অভাবে বন্ধ হলেও সরকার তার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নতুন নতুন শর্ত আরোপ করা হয়। এছাড়া শর্ত পূরণ করলেও কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিতে অনেক সময় গড়িমসি করে। সরকার নবম শ্রেণীর জন্য সেন্ট্রাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে আবার এক বছরের মধ্যে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ছাত্রদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় কারণ ছাত্রদের সার্টিফিকেট নিয়ে অন্যত্র গিয়ে ভর্তি হতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ছাত্র এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ উভয়েই সমস্যায় পড়ে। এছাড়া সমগ্র প্রদেশে ৩০ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে দিন কাটান। ইসলামি শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাত্রদের প্রতি সরকারের দমনমূলক নীতি ছাত্র সমাজকে বিপন্ন করে তুলে। বিভিন্ন জায়গায় হোস্টেল বন্ধ, লাইট, পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসার হোস্টেল থেকে ছাত্রদের বের করে দেওয়া হয়। নোয়াখালী ইসলামিক কেরামতিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করে তাদের Grant-in-Aid কেটে দেয়া হয়েছে তা প্রদানের জন্য। এই খবরটি পাকিস্তান আবজারভারে প্রকাশিত হয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ A.D.I.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাদের জানান হয় উপরের কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে এটি বাতিল করা হয়েছে।[৪৯]

প্রাদেশিক সরকার ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে অভিহিতোকরা হয়। এই অধ্যাদেশের নীতিমালা অনুসারে এই অধ্যাদেশের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য একটি বোর্ড স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। বোর্ড এর নামকরণ করা হয় Board of Intermediate and Secondary Educatin. East Pakistan পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবেন এবং তার মর্যাদা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সমপর্যায়ের। বোর্ড এর সদস্য সংখ্যা হবে ১২জন যা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। ১২জন সদস্যের ভেতর থাকবেন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যাকে তিনি নির্বাচন করবেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর যাকে তিনি নির্বাচন করবেন, ডি.পি.আই এবং পরিচালক, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তার ইচ্ছানুযায়ী দপ্তরের কার্যক্রম তহবিল এবং বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষাসমূহ তদন্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং একইভাবে বোর্ডকে যে কোন ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে তদন্ত রিপোর্ট বোর্ডকে জানান ও উপদেশ দিতে পারবেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী এবং বোর্ডের বিজ্ঞতম কর্মকর্তা যিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং তিনি তিন বছর তার পদে বহাল থাকবেন। প্রথম মেয়াদের পর তিনি পুণঃনিয়োগও লাভ করতে পারবেন। বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা এবং উন্নয়ন করার ক্ষমতা রাখবে। এছাড়াও বোর্ড পরীক্ষার জন্য কোর্স নির্দেশ করা, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলের পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কোন গ্রান্ট অনুমোদন, স্থগিত বা উঠিয়ে নিতে পারবে। ইন্টারমিডিয়েট এবং মাধ্যমিক স্কুল এবং শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে বোর্ড মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সমস্যার সমাধান করবেন। বোর্ড মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ট্রান্সফারের ব্যাপারে বিভিন্ন শর্তারোপ এবং মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট সমাপনান্তে পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। বোর্ডের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১৭টি কমিটি নিয়োগ করা হয়।[৫০]

বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা সমস্যা

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলা অনেক পিছিয়ে ছিল। বিশেষ করে বিল অঞ্চলে অবস্থিত যেমন আত্রাই থানা, সিংড়া থানা, রানীনগর থানা, গুরুদাসপুর থানার লোকেরা নিজস্ব উদ্যোগে স্কুল নির্মাণ করলেও তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় স্কুলগুলি টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। এই স্কুলগুলি কোন সরকারি সাহায্য না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই স্কুলগুলির মধ্যে আত্রাই থানায় পাঁচটি স্কুল ছিল। স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা সংকুলান না হওয়ায় ২টি শিফ্‌ট চালু ছিল। Nachurel থানার কোন মাধ্যমিক স্কুল ছিল না। অথচ ৩০ হাজার লোক সেখানে বাস করে। দেশ বিভাগের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও সরকারি তরফ থেকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও চরমভাবে অবহেলিত। যেমন- নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানায় পৌণে তিন লক্ষ লোকের বাস

Dhaka University Institutional Repository

অথচ সেখানে ছেলেদের জন্য ২০টি হাইস্কুল থাকলেও মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২/১টি স্কুল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হলেও সরকারি স্বীকৃতি এবং সাহায্য না পাওয়ায় মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।[৫১]

শিক্ষার অবনতি

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের হার ত্রিশের কোঠায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষা সমূহে শতকরা ষাট–সত্তরজন ছাত্র ফেল করে। হিন্দু শিক্ষকদের দেশ ত্যাগের ফলে শিক্ষা বিভাগের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনভিজ্ঞ এমনকি অনুপযুক্ত শিক্ষক দিয়ে শূণ্যস্থান পুরণ করা হয়। স্বাধীনতার পর কয়েক বছর ধরে দেশরক্ষা, পুনর্বাসন, অফিসসমূহের স্থান সংকুলানের ব্যাপারে সরকার এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে, শিক্ষা বিভাগের প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেয়নি। এমনকি বহু জায়গায় স্কুল কলেজ বা হোস্টেল রিকুইজিশন করে সরকারি অফিস বানান হয়। এভাবে সরকারি উদাসীনতা , শিক্ষকদের অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতার ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামতে থাকে। ইংরেজ আমলের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শুধু কেরানি তৈরি করা এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ছাড়া শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার কথা স্বাধীনতার পর থেকে শোনা গেলেও সরকারি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে আরও একটি বড় সমস্যা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ না করা। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দেশের লোককে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। পৃথিবীর প্রত্যেকটি আধুনিক শিক্ষিত দেশেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অথচ স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পার হলেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে সরকারি আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কয়েকবছর পূর্বেই উর্দুতে পরীক্ষা দিচ্ছে। মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা ও পরীক্ষার সুযোগ পেলে বিভিন্ন পুস্তক বাংলায় অনুদিত হবে এবং শিক্ষার মান বাড়বে। বেশিরভাগ ছাত্রই ইংরেজিতে ফেল করে। বিষয়টি জানা থাকলেও প্রশ্ন ঠিকমত বুঝতে না পারাই এই অকৃতকার্যতার কারণ। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ই সবচেয়ে বেশি ছাত্র ফেল করে। কারণ প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা অথচ কলেজে গিয়ে সব বিষয়ে ইংরেজিতে পড়তে হয়। হঠাৎ করে বাংলা থেকে ইংরেজি পড়তে গিয়ে ছাত্ররা হিমশিম খায় ফলে পরীক্ষায় ফেল করে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নানাবিধ সমস্যা রয়েছে যেমন– প্রায় সব ক্ষেত্রে বেসরকারি হাইস্কুলসমূহ অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ বেসরকারি হাইস্কুলে দু-একজন মাত্র পাশকরা গ্র্যাজুয়েট থাকেন। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না, পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, বইপত্র, ভাল লাইব্রেরি না থাকা প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভাল পড়াশুনা হয় না স্কুলগুলিতে। যে দেশে শিক্ষকের চেয়ে শাসকের মর্যাদা বেশি, যে দেশে শিক্ষকের মর্যাদা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশি নয় সে দেশে শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

টেক্সট বই নির্বাচনে সরকারি নীতিমালা

সহকারি স্কুল পরিদর্শক, খুলনা এবং খুলনায় কর্মরত তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনার পর খুলনা কারোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং সেক্রেটারি স্কুলের জন্য তিনটি বই নির্বাচন করেন। বই তিনটি হচ্ছে-

১। আদর্শ বাংলা বচন ও অনুবাদ;

২। এই দেশেরই মেয়ে ও

৩। রামায়নর গল্প।

উল্লেখ্য যে, বাজারে নির্বাচিত বই না পাওয়ায় হিন্দু লেখকের এই তিনটি বই নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর এবং ২ মার্চ ১৯৪৯ সালে আপত্তির কারণে বইগুলি উঠিয়ে নেয়া হয়। এই তিনটি বই এর মধ্যে *এই দেশেরই মেয়ে* বইয়ের একটি অধ্যায়ে লেখা নিয়ে আপত্তি উঠে। *এই দেশেরই মেয়ে* বইটির লেখক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, কলকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রী পরাণচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উপমহাদেশে যত কৃতী বীর নারী রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দী বিশেষ করে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত তাদের কৃতিত্বের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। এই বইয়ের ৪৮ তম অধ্যায়ে ১৯৪৬ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়- শ্রী যুক্ত কৃপালীনির কৃতিত্ব (সুকুমার রায় লিখিত, নোয়াখালীতে মহাত্মা হতে সংকলিত)। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমে নিবেদিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, বাঙালি ছিলেন। বাংলার মুসলমান গভর্নমেন্টের প্রশ্রয়ে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয় নোয়াখালীতে এবং তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মুসলমান গুণ্ডাদের বর্বরোচিত আচরণ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন হিন্দু মেয়েদের জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা হচ্ছে এবং হিন্দুদেরকে মুসলমান ধর্মাচরণে যোগ দিতে ও গোমাংশ ভক্ষণে বাধ্য করা হয়। এই বিষয়টি জানার পর জেলা প্রশাসক প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে এদেশেরই মেয়েসহ তিনটি বই বাতিল করার নির্দেশ দেন এবং তদস্থলে মুসলমান লেখকদের বই অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন যার মেমো নং ১১৫ এম, তারিখ: ১৫ জুলাই ১৯৫০। সরকার খুলনা করোনেশন হাইস্কুলের অনুদান বাতিল করেন। পরে বইগুলি বাতিল করার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গ্রান্ট ইন এইড চালু করা হয়। সরকার টেক্সট বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেন

১। প্রস্তাবিত বই এর তালিকা প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার পর অনুমোদনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।

২। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের পর নির্বাচিত বই এর এক কপি শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন কর্মকর্তার নিকট এবং আর এক কপি সংশ্লিষ্ট মহকুমা অফিসারের নিকট পাঠাতে হবে। [৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান আলীনূর বলেন, পাকিস্তানের মতো অনুন্নত দেশে শিক্ষা বিস্তারে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, আজাদী লাভের পর পাকিস্তানিআদর্শ ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বর্তমান সিলেবাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ভাল লাইব্রেরি সুবিধা এবং সভা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে গ্রন্থকার ও লেখকদের পুস্তক প্রণয়নের কৌশল আয়ত্ত করার সুযোগ দানের সাথে আমেরিকার ন্যায় পাকিস্তানে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। [৫৪]

বিভাগ পূর্ব সময়ে পূর্ব বাংলার লেখকগণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পাঠ্যপুস্তক লিখতেন এবং ডি.পি.আই. এগুলির ভিতর থেকে অনুমোদন দিতেন। এর ফলে পাঠ্যপুস্তক লিখার একটা প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু বিভাগ পরবর্তী সময়ে টেক্সটবুক বোর্ড এই দায়িত্ব পালন করে। এ সময়ে বাজারে যে সমস্ত বই প্রচলিত ছিল তার মধ্যে অনেক ভুল থাকত। উল্লেখ্য প্রবেশিকার একটি বইয়ে ১১ হাজার ভাষাগত ভুল (Linguistic Mistakes) পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বই লিখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নামে চালান হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই-এ লাল রং এর নিশান ছেপে বলা হয় এই আমাদের পাকিস্তানের নিশান অথচ টেক্সট বুক বোর্ড বইটি পড়ানোর অনুমতি দেয়। [৫৪ক]

বিভাগ পূর্বে বেসরকারি স্কুলের জন্য বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ (Education allotment) ছিল তিন কোটি টাকা। হাইস্কুল, এম.ই. স্কুল (মিডল ইংলিশ স্কুল) ও জুনিয়র মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ১৯৬২ সালের জুন মাসের বাজেটে শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাইস্কুল এম.ই. স্কুল ও জুনিয়র মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করা হয় ৭০ লক্ষ টাকা। বিভাগ পূর্ব সময়ে হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১২০০ এবং এম.ই. স্কুল ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪০০টি। ১৯৬২ সালে হাইস্কুলের সংখ্যা ১৯০০টি ও এম.ই স্কুল ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ১০০০টি। টাকা কিছু বাড়লেও স্কুল অনুপাতে বাড়েনি, তাছাড়া এ সময় জিনিসপত্রের মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পায়। মফস্বল স্কুলের রিকারিং বরাদ্দ বাড়ান হয়নি। [৫৪খ]

বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি পূরণ না হওয়ায় পরিষদ সদস্য আব্দুল মালেক উকিল পরিষদে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, ৮০ বা ১০০ জন ছাত্রের জন্য ৬/৭টি বেঞ্চ, একটা আলমারী ও একখানা ভাঙা ব্ল্যাকবোর্ড আবার কোন কোন স্কুলে এসব সরঞ্জামাদিও নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুল তো দূরের কথা অনেক বেসরকারি স্কুলেও সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারে না। সীটের ব্যবস্থা না থাকায় মেয়েদের ভর্তি করা হয় না। যারা ঢাকায় থাকেন তারাই শুধু মেয়েদের পড়াতে পারেন। তিনি আরও বলেন, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা জেলায় ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত 8 বার সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস হয়েছে এবং সরকারি হিসেবে বলা হয়েছে এসব প্রাকৃতিক দূর্যোগে প্রায় ৯৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্র্যান্ট বাড়ানোর আবেদন করেন সরকারের কাছে। প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার কথা তুলে ধরে পরিষদ সদস্য মি. আব্দুল মান্নান হাজী বলেন, কয়েক বৎসর ধরে শিক্ষা ব্যবস্থার বার বার পরিবর্তন ও বিভিন্ন কোর্স পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্তির কারণে ছাত্ররা বিপাকে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে একদল শিক্ষাবিদ ব্রিটেন বা আমেরিকা গিয়ে সেখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখে তা দেশে প্রচলনের চেষ্টা করেন। অন্য দল গিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এক বা দুই বছর পর পর এভাবে কোর্স পরিবর্তন করায় ছাত্রদের পড়াশুনায় অসুবিধা হয়। তিনি আরও বলেন প্রত্যেক ডিভিশনে ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বেড়ে গেলেও পাঁচ বৎসরেও একটি স্কুল পরিদর্শন হয় না বলে অনেকে অভিযোগ করেন। সামরিক শাসনের পর থেকে ডেপুটি কমিশনারকে স্কুল সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ফলে ইন্সপেক্টর ও ডেপুটি কমিশনারের মধ্যে কাজের সমন্বয় না থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহতোহয়। তিনি টেক্সটবুক বোর্ড-এর বইয়ের অসংখ্য ভুল ও পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বেশি মূল্য দিয়ে আমেরিকার সিলভার বার্ডেট কোম্পানির বই কিনতে ছাত্রদের বাধ্য করারও সমালোচনা করেন।[৫৪]

বৃত্তি প্রদান

পূর্ব পাকিস্তানের চারটি বোর্ডের মধ্যে রাজশাহী বোর্ড ছাড়া অন্য সকল বোর্ডের কলা, বাণিজ্য, ও বিজ্ঞান প্রত্যেকটি বিভাগেই পৃথক পৃথক ভাবে মেধানুসারে বৃত্তি ও স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু রাজশাহী বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞান শাখা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য হয়ে মানবিক বিভাগে পড়তে হয়। রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ৬৩০ নম্বরের কম পেলে কোন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পাবে না।[৫৫] অন্যান্য বিভাগের তুলনায় মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৬৩০ নম্বর পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানিশাসকগোষ্ঠী শিক্ষার প্রতি দরদ প্রকাশ করে আসছে এবং এই ব্যাপারে দেশবাসীকে প্রচুর প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তাদের আমলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজ, শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিন্তু সরকারের এই প্রচারণার সাথে বাস্তবের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা যেখানে অর্থাভাবে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য সরকার পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে। উদাহরণ স্বরূপ ভিখারুন্নিসা স্কুলের জন্য সরকার ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এবং এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রীর বেতন ১৫ আনা। পূর্ব পাকিস্তানের মোট আদায়ি রাজস্বের ২৭ কোটি টাকার মধ্যে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় সিভিল ও পুলিশ খাতে। আর সরকারি স্কুল কলেজের জন্য যে ব্যয় করা হয় তার অর্ধেকও বেসরকারি স্কুল কলেজের জন্য ব্যয় করা হয় না।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে কয়েক বছরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে। যেমন– পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি, পূর্বপাকিস্তানে ২টি, পশ্চিম পাকিস্তানে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫টি, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে ১টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা ৩টি পূর্ব পাকিস্তানে ১টি এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে টেক্সটাইল কলেজ ৮টি, ফরেষ্টারী কলেজ ২টি, হাসপাতাল ৯টি, এই ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে ছিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে একটিও সরকারি পাঠাগার বা স্টেট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ সমস্ত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে। নারী শিক্ষার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ বা আধুনিক ছাত্রী নিবাস রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি মহিলো াদের কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য যে ইমারত তৈরি করা হয়েছিল সরকার সেটিকে সেক্রেটারিয়েট ভবন হিসেবে ব্যবহার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও কয়েকবছর কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে বিফল হয়। অন্যদিকে সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও করাচীর জন্য ফেডারেল ইউনিভার্সিটি করা হয়েছে।[৫৭] যোগ্য শিক্ষকের অভাবে যেখানে ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাহতোহচ্ছে অথচ সরকারি অনিচ্ছার কারণে অনেক অধ্যাপককে চাকুরী হারাতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা ভারতে চাকুরির ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের চাকুরি থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। এবং এদের কয়েকজন তাদের ইচ্ছা বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে চাইলে সরকার তা গ্রহণ করেনি। অথচ যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের পড়াশুনার অসুবিধা হয় এবং অনেকে কলেজ ছেড়ে চলে যায়।[৫৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকার ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ফজলে আকবরকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ২৭-০৭-১৯৫৬ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। চারশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে একটি পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে। রিপোর্টে সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, অধ্যাপনার মান উন্নয়ন, অধিক সংখ্যক বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগ, শিক্ষার প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণের বিষয় উল্লেখ করা হয়। অধিক সংখ্যক ছাত্রাবাস নির্মাণ, বৃত্তি এবং স্টাইপেন্ডের সংখ্যা ও উহার টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিদেশে ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শহর এলাকা থেকে অন্যত্র অপসারণে কোন সুপারিশ করেনি। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, এমপি,এ. ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মাদানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. ডব্লিউ. এ. জেঙ্কিন্স। উল্লেখ্য কমিটি রিপোর্ট প্রণয়নের পূর্বে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে সরকার। উর্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পরীক্ষা নেয়া হয় এবং এটিকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা হয়। এই কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার দেড়কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। ১২ মে ১৯৬৪ সালে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কলেজটির নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তানে বকসী বাজারের এক জরাজীর্ণ ভবনে বাংলা কলেজ স্থাপিত হলেও এটি পরিচালিত হয় বেসরকারি উদ্যোগে। দুই-তিন বছর যাবৎ সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন লাভ হয়নি। অন্যদিকে করাচীর উর্দু কলেজের জন্য সরকার ২৪ একর জমি বরাদ্দ করে। [৬০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৫৬ সালে বিভিন্ন অনার্স কোর্সে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করেন। আর্টস-এ ইংরেজি, বাংলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি কোর্সে ত্রিশজনের অধিক ছাত্র ভর্তি করেনি। দর্শন বিভাগের জন্য ১০জন ছাত্র ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের অভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যাপকগণ কম ছাত্র ভর্তির বিরোধী ছিলেন এবং তারা বিষয়টি ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন কলেজে অনার্স পড়ার নিয়ম ছিল না। অনার্স নিয়ে পড়তে হলে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হতো। [৬১]

সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মনীতি না থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের হার শতকরা ৪০%করতে গ্রেস মার্ক দিতে হয়। আই.এ; আই.এস,সিতে গ্রেসমার্কের পর ও ২৫%-৩০% এর বেশি পাশ করেনি বি.এস.সিতে শতকরা পাশের হার ২৬ এবং ১৯৫৬ সালে বি.এ. পরীক্ষায় কোন ছাত্র ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। স্কুল কলেজের সংখ্যা হ্রাস এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সংকোচন করার ক্ষেত্রে সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল তা প্রাক্তন অস্থায়ী গভর্নর স্যার টমার্স ইলিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেন। ভাইস চ্যান্সেলর ডা. জেঙ্কিন্সও অনুরূপ মত পোষণ করেন। সরকারি মতামত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে হলে শিক্ষা সংকোচন ছাড়া গত্যন্তর নাই [৬২]।

বৃত্তি প্রদান

পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন পূর্ববঙ্গ এর কার্যালয় থেকে ১৮-০২-১৯৪৮ তারিখে সচিব পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের পত্র নং ২০৩ T, EDN তাং ১০ অক্টোবর ১৯৩৯ এর প্রেক্ষিতে জানান হয় যে, ১ম বর্ষের মুসলিম ছাত্রের জন্য ৬ রুপি এবং ৩য় বর্ষের মুসলমান ছাত্রদের জন্য ৮ রুপি করে অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হবে যা প্রতি দুই বছর ধরে চলবে। ভারত বিভক্তির পর সিলেটকে পূর্ব বাংলার সংগে একত্রিত করা হলে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পুর্ব বঙ্গের গরীব ছাত্র ছাত্রীদের প্রচলিত বৃত্তি পর্যাপ্ত নয় বিধায় সরকার বৃত্তির পারিমাণ বৃদ্ধি করে যদিও এই বৃত্তির পরিমাণ খুবই সামান্য। সহকারি সচিব পূর্ববঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার থেকে পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন পূর্ববঙ্গকে জানান হয় যে, পত্র নং ১৯৪ তারিখ ১২-০২-১৯৪৮ সরকার ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে পাঠরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজে পাঠরত মুসলিম শিক্ষার্থীদের দুই বছর মেয়াদে বৃত্তি প্রদানের অনুমতি দান করে। নিম্নে বৃত্তির পরিমাণ ছকে দেখান হলো[৬৩]:

সারণি-৩৫

ক্র: নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্বের বৃত্তির সংখ্যা		পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তির সংখ্যা	
		১ম বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	৩য় বর্ষ
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	×	৬০টি এক বছরের জন্য	×	৬০টি এক বছরের জন্য
২.	ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	১০	×	১৩	×
৩.	চিটাগাং কলেজ	৭	৪	১০	৮
৪.	রাজশাহী কলেজ	১০	৮	১৩	১২
৫.	এম.সি কলেজ, সিলেট	×	×	৮	৮
৬.	বি.এম কলেজ, বরিশাল	১২	৬	১২	৮
৭.	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	৮	৪	৮	৪
৮.	এডওয়ার্ড কলেজ	৩	২	৩	২
৯.	ফেনী কলেজ	৭	৪	৭	৪
১০.	জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	৪		৪	×
১১.	করটিয়া কলেজ	৬		৬	১
১২.	ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ	৪	২	৪	৩
১৩.	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ	১০	৪	১১	৬
১৪.	ময়মনসিংহ এ.এম কলেজ	৭	৫	৭	৬
১৫.	পি.সি. কলেজ বাগেরহাট, খুলনা	৩	৩	৩	৩
১৬.	দৌলতপুর কলেজ	২	১	২	৩
১৭.	নড়াইল কলেজ	১	×	১	×
১৮.	ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	২	×	২	×
১৯.	যশোর কলেজ	×	×	২	×
২০.	চাখার কলেজ	×	×	২	×
২১.	চান্দপুর কলেজ	×	×	২	×
২২.	বগুড়া কলেজ	×	×	১	×
২৩.	বৃন্দাবন কলেজ হবিগঞ্জ	×	×	১	×
২৪.	মদনমোহন কলেজ সিলেট	×	×	১	×
২৫.	সুনামগঞ্জ কলেজ	×	×	১	×
	মোট-	৯৬টি	১০৪টি	১২৬টি	১২৯টি

৬ রুপি হারে ১ম বর্ষের ছাত্রদের জন্য মাত্র ৩০টি এবং ৮ রুপি হারে ৩য় বর্ষের জন্য ২৫টি অতিরিক্ত বৃত্তি সরকার প্রদান করে। ছাত্র এবং প্রদেশ অনুপাতে এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল অপ্রতুল।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশি বৃত্তি

প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে পার্লামেন্টের একজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা দপ্তর থেকে জানান হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত মোট ২৭৯ জন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশিবৃত্তি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কোন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়নি। যে সব বিষয়ে বৃত্তি প্রদান করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. For Education in Technical Lines

১৯৫১ সালে ২ জন, ১৯৫২ সালে ৩জন, ১৯৫৩ সালে ২ জন, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে ৩ জন, ১৯৫৬ সালে ২ জন, ১৯৫৭ সালে ৫ জন, ১৯৫৮ সালে ২ জন, ১৯৫৯ সালে ৩ জন, ১৯৬০ সালে ২ জন, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে ৪ জনসহ মোট ৩৫জন।

২. For General Education

১৯৪৯ সালে ৪ জন, ১৯৫০ সালে ২ জন, ১৯৫১ সালে ৬ জন, ১৯৫২ সালে ৫ জন, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে ৪ জন, ১৯৫৫ সালে ১ জন, ১৯৫৬ সালে ৪ জন, ১৯৫৭ সালে ৩ জন, ১৯৫৮ সালে ২ জন, ১৯৫৯ সালে ৪ জন, ১৯৬০ সালে ৫ জন, ১৯৬১ সালে ৬জন, ১৯৬২ সালে ১০ জনসহ মোট = ৬০জন।

৩. For Leagal Education

কোন বৃত্তি প্রদান করা হয়নি।

৪. For Scientific Education

১৯৪৯সালে ২ জন, ১৯৫০ সালে ১ জন, ১৯৫১ সালে ৫ জন, ১৯৫২ সালে ৬ জন, ১৯৫৩ সালে ৩ জন, ১৯৫৪ সালে ৫ জন, ১৯৫৫ সালে ৪ জন, ১৯৫৬ সালে ৪ জন, ১৯৫৭ সালে ৩ জন, ১৯৫৮ সালে ১ জন, ১৯৫৯ সালে ৩ জন, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে ৪ জন, ১৯৬২ সালে ১১ জনসহ মোট = ৫২জন।

৫. For Administrative Education

১৯৫১ সালে ১ জন, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৬ সালে ২ জন, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬২ সালে ১ জন করে মোট ১০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. For Education Training such as B.Ed. M.A. in Education Etc.

১৯৪৯ সালে ৪ জন, ১৯৫১ সালে ২ জন, ১৯৫২ সালে ১ জন, ১৯৫৩ সালে ৩ জন, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে ২ জন, ১৯৫৬ সালে ৪জন, ১৯৫৭ সালে ৪ জন, ১৯৫৮ সালে ২ জন, ১৯৫৯ সালে ৫ জন, ১৯৬০ সালে ৬ জন, ১৯৬১ সালে ৭ জন, ১৯৬২ সালে ১০ জনসহ মোট = ৫২ জন।

৭. For Engineering Training

১৯৪৯ সালে ১ জন, ১৯৫১ সালে ৩ জন, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে ২ জন করে, ১৯৫৪ সালে ৩ জন, ১৯৫৫ সালে ৭ জন, ১৯৫৬ সালে ৮ জন, ১৯৫৭ সালে ৪ জন, ১৯৫৮ সালে ৮ জন, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ৬ জন, ১৯৬১ সালে ৭ জন, ১৯৬২ সালে ১২ জন সহ মোট = ৭০ জন।

এসকল ছাত্রদের মধ্যে কিছু ছাত্র Aid Programme এবং বাকী অর্থ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়।[৬৪]

কলেজ শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা

কলেজ শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুধীবৃন্দ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত: কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার সমস্যাবলী কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষানুরাগী দেশ বাসীর সম্মুখে তুলে ধরেন। পাঠ্যসূচী ও শিক্ষার মাধ্যম হতে শুরু করে ছাত্র- শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও চাকুরির নিরাপত্তা পর্যন্ত বহুবিদ সমস্যা সম্মেলনে আলোচিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বেশ কয়েকটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার কোন বলিষ্ঠ উদ্যোগ এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। শিক্ষা কমিশনের অনেক রিপোর্টই সরকার প্রকাশ করেনি। সামরিক শাসনামলে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও উহার গণবিরোধী, পশ্চাদমুখী ও শিক্ষা সংকোচনমূলক চরিত্রের জন্য দেশবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকরিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সারা প্রদেশে উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পুলিশী ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতি বিধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে রিপোর্ট বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে। সরকার শিক্ষাখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে বলে দাবি করে। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিকল্পনার মোট অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারের অবিবেচনার দরুন বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই ভবন নির্মাণ প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জৌলুস বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান বা শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রের শিক্ষার অবলম্বন বেসরকারি কলেজ সমূহ উপেক্ষিত, আবার সরকারি কলেজে ছাত্র বেতন শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের সামর্থের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি উদ্যোগে নুতন নুতন উন্নতমানের কলেজ স্থাপনের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছল ও উন্নত শ্রেণীর কলেজ সমুহকে প্রাদেশিকীকরণের দ্বারা সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বেসরকরি কলেজ- শিক্ষকদের এমনকি সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন ভাতা নিতান্ত সামান্য, চাকুরির নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এই অবস্থায় শিক্ষকদের পেশায় মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যায় না। ফলে দিন দিন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। তাই কলেজ শিক্ষকবৃন্দ নিম্নলিখিত দাবি পেশ করে।

কলেজ শিক্ষকদের দাবি

২৯ ও ৩০ আগষ্ট ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির ২ দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ:

১. পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির এ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কলেজ প্রাদেশিকীকরণের (সরকারিকরণ) নীতি গভীর হতাশার সাথে লক্ষ্য করছে। ঐতিহাসিক কারণে এদেশের উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি কলেজ সমুহের উপর ন্যস্ত এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই হেতু প্রাদেশিকীকরণ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং যেহেতু প্রাদেশিকীকরণ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুবিধ জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি করছে সেহেতু এই সভা পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে বর্তমানের প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিহার পূর্বক প্রদেশে প্রায় দেড়শত বেসরকারি কলেজকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরিদানের দাবি করছে যাতে এই কলেজসমূহ উহাদের শিক্ষক ও ছাত্রদের সরকারি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের সমপর্যায়ে সুযোগ দান করতে পারে। অন্যথায় এই প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার হার ও মান শংকাজনকভাবে নিম্নগামী হতে বাধ্য। এই অধিবেশনে প্রত্যেকটি কলেজকে ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে অর্থ মঞ্জুরি দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানায়।

২. পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির এই বার্ষিক অধিবেশন শিক্ষাকে একটি জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি কলেজ সমুহের উন্নয়নের জন্য সরাসরি অর্থ মঞ্জুরি দানের দাবি করে।

৩. এই অধিবেশন গভীর উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, যদিও প্রাদেশিক সরকার সরকারি কর্মচারি তথা সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা তিন বৎসর পূর্বে বৃদ্ধি করেছেন তথাপি অদ্যাবধি বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন আয়োজন দেখা যায়নি। নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের আকাশচুম্বী দাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকগণ একটা ভয়াবহ আর্থিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় বেসরকারি কলেজ সমূহের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের বেতনের হারে (৪০০-৩৫-৫৪০-৯০০-৫-১১০০-১২৫০) বর্ধিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের বাসস্থানের সুবিধাদানের অনুরোধ জানায়।

৪. এই অধিবেশন ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছে যে, পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতি ও প্রাদেশিক বিভিন্ন কলেজ সমূহের ক্রমাগত অনুরোধ সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঢাকাস্থ কায়েদে আজম কলেজের ১১জন বরখাস্তকৃত সিনিয়র শিক্ষকের চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হয়নি। সমিতির এই অধিবেশন উক্ত বরখাস্তকৃত শিক্ষকদের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকুরিতে পুনর্বহালের জোর দাবি জানায়। অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতি এই ছাঁটাই নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলবে।

৫. এই অধিবেশন গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছে যে, প্রাদেশিক সরকার কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার ও শিক্ষকদের মধ্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করার উদ্দেশ্যে এডিশন্যাল গ্রান্ট নামে যে অর্থ মঞ্জুর করছেন, বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ মঞ্জুরির শর্তাবলির অস্পষ্টতা ও অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করে কলেজ শিক্ষকদের উক্ত মঞ্জুরির ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করছে। ইহার ফলে কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। এই অধিবেশন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমূহকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে উপযুক্ত তদন্ত করে যাতে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকগণ উক্ত অর্থ মঞ্জুরীর ন্যায্য অংশ পেতে পারে তার যথাবিহিতোব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানায়।

৬. এই অধিবেশন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কলেজ গভর্নিং বডি সমূহের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ গভীর শংকার সাথে লক্ষ্য করছে। ফলে শিক্ষকদের পেশাগত স্বাধীনতা ক্রমাগত ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এই সভা এ সকল অন্যায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানায় এবং কলেজ গভর্নিং বডিসমূহের দুইজনের স্থলে ৪ জন শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি জানায়। এই প্রসঙ্গে যে সকল কলেজে বিভাগীয়করণ প্রথা চালু করা হয়েছে সেই সকল কলেজের ইন্টারমিডিয়েট এর শিক্ষকদের গভর্নিং বডিতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও ভোটদানের অধিকার দাবি করে।

৭. এই অধিবেশন প্রদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের উপযুক্ত সুযোগদানের দাবি জানায় এবং এই উদ্দেশ্যে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্য হতে অধিকতর সংখ্যায় সিলেবাস কমিটিতে, কারিকুলাম কমিটিতে গ্রহণ ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার ও পরীক্ষক হিসেবে গ্রহণ করার দাবি জানায়। এই প্রসঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনের সরকারি বৃত্তি সমূহের শতকরা ৬০ ভাগ বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংরক্ষণ করার দাবি জানায়।

৮. এই অধিবেশন কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে কলেজ সমূহের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানায়।

৯. এই সভা পাবনার সিরাজগঞ্জ কলেজের কতিপয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। এবং অবিলম্বে উক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ বন্ধ করার দাবি জানায়।

১০. এই অধিবেশন প্রদেশের বেসরকারি কলেজে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সমস্ত কলেজে একই ধরনের চাকুরি বিধি প্রচলনের দাবি জানায় এবং এই মর্মে সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করার দাবি জানায়।

১১. এই অধিবেশন সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বাসস্থানের সংস্থান ও চিকিৎসা বন্দোবস্ত করার দাবি জানায়। অন্যথায় বাসগৃহ ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা দাবি করে।

১২. এই অধিবেশন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক দুঃখজনক ঘটনাসহ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকদের উপর হামলার গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় গভীরভাবে উৎকণ্ঠা বোধ করে। এই অধিবেশন প্রদেশের জনসাধারণ তথা ছাত্র সমাজের নিকট এই সকল অশোভন, দুঃখজনক ঘটনাসমূহ প্রতিরোধ করে একটা সুস্থ্য শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার আবেদন জানায়।

১৩. এই সভা ভিয়েতনামে মার্কিন সরকারের বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা জানায় এবং বিশ্বশান্তির খাতিরে অবিলম্বে ভিয়েতনাম হতে সমস্ত বিদেশি সৈন্য অপসারণ ও যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায়।

১৪. এই সভা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা অবসানের দাবি জানায় এবং অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

১৫. এই সভা যে সকল কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হচ্ছে সেই সব কলেজের ডেমনেস্ট্রেটর সহ সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের বেতন ও পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানায়।[৬৫]

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও অন্যান্য সমস্যা

প্রতিবছর প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সীট সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য সংখ্যক সীটের বিপরীতে কয়েক সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রী ভিড় জমায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সীটের সংখ্যা নিম্নরূপ: পদার্থ বিজ্ঞানে ৫০টি, রসায়নে -৪০টি, জীববিজ্ঞানে-২৫টি, ফার্মেসী বিভাগে-৩০টি, মৃত্তিকা বিভাগে ২৫টি, উদ্ভিদ বিভাগে-২৫টি, প্রাণীবিদ্যায়-২০টি, স্থাপত্য বিভাগে-৪টি।

কলা অনুষদ

ইংরেজি বিভাগে-৬৫টি, বাংলায়-৬০টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে-৭৫টি, ইতিহাসে-৬০টি, সমাজবিজ্ঞানে-৬০টি, দর্শনে-৫০টি, ইসলামের ইতিহাসে-৩০টি, ইসলামিক স্টাডিজে-১০টি, অর্থনীতিতে-৮০টি। বাণিজ্য বিভাগে-৬০টি, সংস্কৃত বিভাগে ১১টি, উর্দু বিভাগে ১০টি, পার্শী বিভাগে-১০টি, আরবিবিভাগে-১৫টি।[৬৬] ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী ভাষণ দানকালে প্রাদেশিক গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানও স্বীকার করেন পূর্ব পাকিস্তানে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের নৈরাশ্যজনক অবস্থার কথা। তিনি বলেন, দেশের পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে ডাক্তারের সংখ্যা চারগুণ ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ। তিনি তুলনামূলক সংখ্যা উল্লেখ করে বলেন এমবিবিএস ডাক্তার পূর্বাঞ্চলে ২ হাজার একশ ৬৪ জন। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে ৮ হাজার ৭ শত ৩৬ জন। ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে দুই হাজার পাঁচশত এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ হাজার ৫ শত ৫০ জন।[৬৭] শিক্ষা সপ্তাহ দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম. গণি তাঁর বর্কৃতায় বলেন, "দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্প্রসারণ হয় নাই। ফলে বহু ছাত্রকে ফিরিয়ে দিতে হয়। তিনি আরো বলেন, দেশে আরও অধিক সংখ্যক সর্ব বিষয়ে উন্নতমানের ইউনিভার্সিটি ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।"[৬৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (২-১১-১৯৬৯-২০-১-১৯৭২)বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমাবেশে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় বলেন যে, এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি গণতান্ত্রিক পর্যায়ে পরিচালিত হইবে এবং সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাক ভারত উপমহাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে নিজেকে চিহ্নিত করার গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য হতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, এশিয়া মহাদেশ প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু অতীতের সেই গৌরব ও ঐহিত্য আজ অস্তমিত প্রায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সেই সুমহান অতীত গৌরব ও ঐহিত্য অমলিন ও অক্ষয় রাখা সম্ভব হয়নি। এই সময়কালে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্বিতল অট্টালিকার স্থান দখল করছে আলিশান চতুর্থতলা ইমারত, ছাত্র-ছাত্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে চক্রবৃদ্ধি হারে। সন্তানদের পড়াশুনার জন্য অভিভাবকদের মাসিক ব্যয় আট দশ বৎসর পূর্বের ষাট-পঁয়ষট্টি টাকার স্থলে দেড়শত পৌনে দুইশত টাকায় পৌছেছে কিন্তু আসল কাজ শিক্ষার উন্নয়নই হয়নি। শিক্ষার যথার্থ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ না থাকাও এর জন্য দায়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বাহিরের হস্তক্ষেপ, ছাত্ররাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি দায়ি।[৬৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পার হলেও উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উৎসাহ ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয় শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের মধ্যে। সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নাম দেওয়া হয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা শহর থেকে দূরে লোকবসতিহীন নির্জনে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সমালোচনার মুখে সরকার কাজটি সমাধা করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় শহরের মাঝখানে বলে ছাত্র অধ্যাপকরা রাজনীতি করবেন, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শোভা ও শোভা যাত্রা, বিক্ষোভ করবে তাই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় গণহত্যার শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আঘাত ।[৭০]

শিক্ষা বাজেট

পাকিস্তানের স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষাখাতে বাজেটের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। অথচ নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষাই হওয়া উচিত ছিল জাতি গঠনের প্রথম সোপান। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। যুক্তবঙ্গে ১৮৪৩-৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা অন্য দিকে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা অথচ দেশের শিল্প, কৃষি, নৈতিক চরিত্র ও সর্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র দুই কোটি কয়েক লক্ষ টাকা [৭১] ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয় ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা হ্রাস করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট হতে আরো হ্রাস করে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেটে সরাসরি সাহায্যের জন্য ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং স্কুল বোর্ডের মধ্যস্থতায় ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সংশোধিত বাজেটে তা হ্রাস করে সরাসরি সাহায্যের খাতে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ আসল বাজেট হতে ৫০ হাজার টাকা কমনো হয়। ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় সরাসরি সাহায্যের জন্য ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় যা গত বৎসরের বাজেটের চেয়ে ৮৯ হাজার টাকা কম বরাদ্দ করা হয়। ধর্ম শিক্ষা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এই খাতে যুক্ত বাংলায় ২৭৫০০০ টাকা দেয়া হতো কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে ধর্ম শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়। Adult Education এর ব্যাপারে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।[৭২]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট যে কৃত্রিম এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল তা নিম্নের ছকটি থেকে বোঝা যায়। ১৯৫০-৫১ সময়ে উদ্ধৃত্ত বাজেটের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপ [৭৩]

করাচী	:	৪০ লক্ষ ১৪ হাজার	মাথাপিছু ৪টাকা ৩ আনা ৩ পাই।
সিন্ধু	:	১০ লক্ষ	মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই।
সীমান্ত প্রদেশ	:	১১ লক্ষ	মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই।
পূর্ববাংলা	:	৭১ হাজার	মাথাপিছু ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ।

নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাধীনে উল্লেখিত অর্থ-শিক্ষা প্রকল্পে ১-১-১৯৫৩ থেকে ৩১-১২-১৯৫৩ সময়ের জন্য ব্যয় করার অনুমোদন দান করা হয়: [৭৪]

সারণি-৩৬

ক্র:নং	কর্তৃপক্ষের নাম	---------	ননরিকারিং ব্যয়
১.	পূর্ববঙ্গ	---------	৭৩০০০০০/-
২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	---------	৫০০০০০/-
৩.	বেলুচিস্তান প্রশাসন	---------	৪০৫০০০/-
৪.	করাচী বিশ্ববিদ্যালয়	---------	১০০০০০০/-
৫.	পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	---------	৪৩০০০০০/-
৬.	সিন্ধু	---------	৩০০০০০/-
৭.	সোয়াট স্টেট	---------	১০০০০০/-

১৯৫৫-৫৬ সালের প্রাদেশিক বাজেটে বরাদ্দ ছিল মোট ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩২ কোটি ৯২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা কিন্তু শিক্ষা খাতে পূর্বের বছরের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার করা হয়। অথচ শতকরা ৪৪% লোকের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে বাজেট বরাদ্দ করা হয় ৫৮ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাস করে। বৌদ্ধরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত। দেশ বিভাগের পূর্বে বৌদ্ধদের শিক্ষার জন্য মাত্র ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। অথচ দেশ বিভাগের অনেক বছর পরও বৌদ্ধদের শিক্ষার জন্য পূর্বের ন্যায় ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। [৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বাজেট ১৯৬৩-৬৪

১৯৬৩-৬৪ অর্থ বছরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ধরা হয় ১৪.৩৮ কোটি টাকা। সাধারণ শিক্ষার জন্য ১১.১৯ কোটি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য ৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তী বছরে ২২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ২.৩৯ কোটি টাকার সরবরাহ করা হয়। গৃহীত ১১১টি বিদ্যালয়সহ ৪৩৮টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ২০ লক্ষ টাকা সরবরাহ করা হয়। পরবর্তী বছরের জন্য ১১২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উন্নয়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ গুলোর মধ্যে ৩০২টি বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ উন্নয়ন, ১১৮টি বিদ্যালয়ের ভেতর ৬০টি দ্বিমুখী এবং একটি বহুমুখী বিদ্যালয়কে আংশিক ভাবে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে উন্নয়ন এবং পরবর্তী বছরের জন্য ১০টি বেসরকারি মহাবিদ্যালয়কে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ডিগ্রী কলেজের ক্ষেত্রে ছয়টি এবং ২১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ১০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মোট ২২৯ লক্ষ টাকা ১৯৬৩-৬৪ অর্থ বছরের বাজেটের যা চলমান বছরের রিভাইজড বাজেটের ১৯০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সরবরাহ করা হয়। ১৫টি নতুন সরকারি বিদ্যালয়-এর মধ্যে ১০টি ছাত্রদের এবং ৫টি ছাত্রীদের জন্য ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা এবং নারায়নগঞ্জে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এর জন্য ব্যয় ধরা হয় ৩০ লক্ষ টাকা। ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে ৩টি ক্যাডেট কলেজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ২৫ লক্ষ টাকা। চিটাগাং-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ১৫ লক্ষ টাকা। রাজশাহীতে কারিগরি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৬.২৭ লক্ষ টাকা, চিটাগাং পলিটেকনিকের জন্য ২৪.৪০ লক্ষ টাকা এবং খুলনা পলিটেকনিকের জন্য ৩০.৫৬ লক্ষ টাকা পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেটের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। ৮টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪১ লক্ষ টাকা এবং ৩৫টি ভকেশনাল বিদ্যালয়ের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এর সাথে সাথে ঢাকার প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫৬.৫ লক্ষ টাকা এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।[৭৬] পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানা যায়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই অর্থ পর্যাপ্ত ছিল না।

পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত সমূহ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়। শাসক শ্রেণীর ঔপনিবেশিক শোষণ চিরস্থায়ী রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। হামুদুর রহমান কমিশনের শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয় " স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু গত ১০ বছরের অবাস্তব শিক্ষানীতির ফলে সেখানকার অবস্থার দারুণ অবনতি হয়েছে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সরকারের একরোখা নীতিই এরজন্য দায়ি। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছাত্রের সংখ্যা ১৭,৬৯০০০ জন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ১৭ লক্ষ। ম্যাট্রিক পাশের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭১৭৫ জন, পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৮১৮১১ জন। ইন্টারিমিডিয়েট পাশের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে কমে এসে ৫২,৭৯৩ জনে অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯০২৩৭১ জনে। মোট স্নাতকের সংখ্যা শতকরা ৩২.০ হারে কমে এসে দাড়িয়েছে ২৮০৭০ জনে। অথচ ১০ বৎসরে পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে স্নাতকের সংখ্যা শতকরা ২১.৩ হারে বেড়ে ৫৪ হাজারে পৌঁছেছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই সংখ্যা আরো কম ছিল। স্নাতকোত্তরের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ১২% হারে কমে বর্তমানে দাড়িয়েছে ৭১৪৬ জনে। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৬৮.৬% হারে বেড়ে হয়েছে ২৪৩২৪ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৭ গুণ বেড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে মহিলা স্নাতকোত্তরের সংখ্যা যথাক্রমে ১২,১৭৬ ও ৩৩৪ জন অপর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭০৫০ ও ২৭৪৯জন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের এই পরিসংখ্যান পাকিস্তানিশাসকবর্গের স্বার্থপরতা ও পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা প্রসারের উপর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পিত বাঁধা নিষেধ আরোপের চক্রান্তই প্রকাশ করে।[৭৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামি রাষ্ট্রের অজুহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ভাব, ভাষা ও বিষয় বস্তুতে পাকিস্তানীকরণ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। এর ফলে কেবল রবীন্দ্রনাথ কিংবা পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক-ই বাদ পড়েননি, এ দেশের প্রতিভাবান ও সৃজনশীল লেখকরাও বঞ্চিত হন। পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় ইসলামিকরণের জন্য বিষয়বস্তু প্রধানত আরব জগৎ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়। শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ২৯৬৩৩টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে তা ২৮,৯০৮টি ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তা ৪৩ হাজারে বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বাধীন চিন্তাধারার সংকোচন এবং ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনে শিক্ষকদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সত্যিকারের পণ্ডিত ও বাঙালি সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের অপসারণ করে নিজেদের সমমনা ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহতোথাকে।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে উভয় পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (মিলিয়ন রুপিতে) দেখানো হলো[৭৯]

সারণি-৩৭

বছর	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	প্রাদেশিক বাজেটের%	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	প্রাদেশিক বাজেটের%
১৯৫৫-৫৬	৮৪.৬	১৬.৫৭	২৬.৫	৯.১৯
১৯৫৬-৫৭	১০০৬১৬.৪১	২২.৫	৭.৪১	০
১৯৫৭-৫৮	১০২.৮	১৬.৮৩	৩৯.৯	১২.৭০
১৯৫৮-৫৯	১৩৬.৬	১৫.৫০	৩৪.৪	৬.৫৮
১৯৫৯-৬০	১১৫.৭	১৪.৩৭	২৫.২	৬.২৫
১৯৬০-৬১	১২১.৬	১৪.৩৫	৬১.৯	১২.৬৫
১৯৬১-৬২	১৫৫.৭	১৪.৩৭	৬৭.২	১০.৭৬
১৯৬২-৬৩	২০৩.৪	১৫.০৭	৭৬.৫	১০.২৭
১৯৬৩-৬৪	২২৯.১	১৪.৫৮	৮৮.৩	৮.৮৭
১৯৬৪-৬৫	২৬৪.৫	১৫.৩৯	৯৫.৪	৮.৩২
১৯৬৫-৬৬	২৮২.০	১৬.৮৭	১২১.৮	১০.৬৯
১৯৬৬-৬৭	২৮৮.০	১৬.১৫	১৮৩.০	১০.৮৫
মোট-	২০৮৪.৬	১৫.৫০	৭৯৭.৬	৯.৬৫

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের অগ্রগতিতে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে স্কুল বয়সী ছাত্র সংখ্যা বাড়লেও অবহেলো জনিত এক সচেতন নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায়। একই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫০ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানিশিশুদের একটি উন্নততর শিক্ষার সুযোগ দানের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুণ আর পশ্চিম পাকিস্তানে তা বেড়েছে ৩০গুণ।[৮০]

তথ্য নির্দেশিকা

১. *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১

২. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. Assembly Proceedings Official Report, *East Bengal Legislative Assembly*, March 1949, pp.95-109.

৬. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education* File No IIC-30, 1949, Proceedings 341 and 342, Bundle No.99.

৬ক. Speech by Mr. Provas Chandra Lahiri, *Assembly Proceedings Official Report*. East Bengal Legislative Assembly. Third Session March 25, 1949.

৬খ. Speech by Mr. Benode Behari Choudhury, *Assembly Proceedings Official Report*. East Bengal Legislative Assembly. Third Session March 25th , 1949

৬গ. Speech by Moulana Khondoker Abdur Rashid Torkabagish and Dr. Abdul Ahad, *Assembly Proceedings Official Report*. East Bengal Legislative Assembly. Third Session March 25th, 1949

৭. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, মে-২০০০, পৃ.১২২

৮. ঐ, পৃ.১২২-১২৩

৯. ঐ, পৃ.১২৩-১২৪

১০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮২, পৃ.৩৮৩-৩৮৪

১১. *Assembly Proceedings Official Repor,t East Bengal Legislative Assembly*, Third Session 1956. 17th to 23rd September 1956. p.133.

১২. *দৈনিক আজাদ*, ১২ এপ্রিল ১৯৫৬

১২ ক. Speech by Mr. A.F.M. Abdul Jalil, *Assembly Proceedings Official Report*, East Bengal Legislative Assembly, 17th September 1956, Vol. Xv.No.1)

১৩. ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, সভাপতি ইব্রাহীম খাঁ। পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ঢাকা-৫ এবং ৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ.৩-১৫

১৪. *Assembly Proceedings Official Report*, East Bengal Legislative Assembly, Third Session, 24th to 27th September 1956. pp.179-210.

১৫. *দৈনিক আজাদ*, ৬ আগষ্ট ১৯৫৬

১৬. ঐ, ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৭

১৭. ঐ, ৯ জানুয়ারি, ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ঐ, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৫৭

১৯. ঐ, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৭

২০. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা*, তিষা বুক ট্রেড, ঢাকা: ২০০৩, পৃ.১২৯

২১. ঐ, পৃ.১২৯-১৩০

২২. *দৈনিক আজাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৫৭

২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

২৪. *দৈনিক আজাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

২৫. ঐ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫৭

২৬. ঐ, ৬ মার্চ ১৯৫৮

২৭. *দৈনিক সংবাদ*, ৯ আগষ্ট ১৯৬৬

২৮. *দৈনিক আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

২৯. ঐ, ৪ অক্টোবর ১৯৬৬

৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মে ১৯৬৬

৩১. *দৈনিক আজাদ*, ১ আগষ্ট ১৯৬৭

৩২. দূর্গাপ্রসাদ ধর, *বাংলাদেশের* উদ্ভব, বাংলাদেশ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ.৪৯

৩৩. D. Monjur Ahmed. *Education is Progress Proceedings of the Symposia East Pakistan Education Week*, 1968, pp.93-102.

৩৩ক. Education is Salvation. Statistical Information of Education is East Pakistan Directory of Public Instruction. The East Pakistan Education Week 1970, Table. Viii. pp.11-12.

৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মে ১৯৬৬

৩৫. *Assembly Proceedings Official Report*, East Bengal Legislative Assembly, third Session 1956, 24th to 27th September 1956. pp.179-120.

৩৬. *দৈনিক আজাদ*, ১১ আগষ্ট ১৯৫৬

৩৭. *Government of East Bengal, B-Proceedings Education*, File No. 11c-41 of 1949, Proceedings no 63 to 70. Bundle no. 99.

৩৮. *Assembly Proceedings official Report*. East Bengal Legislative Assembly, March 1949, pp.95-109.

৩৯. *দৈনিক আজাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৫৭

৪০. ঐ, ৭ নভেম্বর ১৯৫৭

৪১. ঐ, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৪২. ঐ, ৬ মার্চ ১৯৫৮

৪৩. ঐ, ১ নভেম্বর ১৯৫৯

৪৪. Dr. Monjur Ahmed, *Education is Progress Proceedings of the Symposia* East Bengal Education Week, 1968, pp.93-102.

৪৪ক. Education is Salvation. Statistical Information of Education is East Pakistan Directory of Public Instruction. The East Pakistan Education Week 1970, Table. ix. pp.13-14

৪৫. *দৈনিক আজাদ*, ২২ নভেম্বর ১৯৫৯

৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৫৯

৪৭. ঐ, ১০ জুন ১৯৬১

৪৮. *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৬২

৪৯. *East Pakistan Assembly Proceedings Official Report of the Budge*t Session, 25 June in 1964, Vol-xxvi-No-5, pp.164-174.

৫০. *Pakistan Observer*, 13 October 1961.

৫১. *East Pakistan Assembly Proceedings Official Report of the Budget* Session, 26 June in 1965, Vol-xxvi-No-5, pp.181-188.

৫২. দৈনিক আজাদ, ৫ আগষ্ট ১৯৫৬

৫৩. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education,* File No. 4B-7 of 1949, Proceedings no 118 to 129.

৫৪. *দৈনিক আজাদ*, ৩১-০৭-১৯৫৭

৫৪.ক. *Speech by Mr. Abdul Wadud. Assembly Proceedings Official Report* East Bengal Legislative Assembly first Session, 1962, Vol. 21, 17-25th June 1962.

৫৪.খ. Speech by Mohammad Hasanuzzaman Moulvi. Ibid.

৫৪.গ. *Speech by Abdul Malek Ukil and Mr. Abdul Mannan Hazi, Assembly* Proceedings Official Reprot. East Bengal Legislative Assembly 25th June 1962.)

৫৫. *দৈনিক আজাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৬৬

৫৬. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র*,১ম খণ্ড, পৃ.৩৮৪

৫৭. ঐ, পৃ.৩৮৩-৩৮৪

৫৮. *Assembly Proceedings Official Report, East Bengal Legislative Assembly,* September 1949. pp.95-109

৫৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৮-৭-১৯৫৬

৬০. *East Pakistan Assembly Proceedings Official Report of the Budget* session 26 June in 1965. Vol-xxvi-No-5, pp.1181-188.

৬১. *দৈনিক আজাদ*, ১৮ জুলাই ১৯৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৬২. ঐ, ১৮ জুলাই ১৯৫৬

৬৩. Government of East Bengal, *B-Proceedings Education*, File No. 45 of 1949, Proceedings 544 of 547, B, Bundle no. 89.

৬৪. *Assembly Proceedings Official Report*, East Pakistan Provincial Assembly, Third Session 1963, pp.94-95.

৬৫. দৈনিক সংবাদ, ৩১ আগষ্ট ১৯৬৬

৬৬. ঐ, ১১ আগষ্ট ১৯৬৬

৬৭. ঐ, ৫ মার্চ ১৯৬৭

৬৮. ঐ, ১১ মার্চ ১৯৬৭

৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, জানুয়ারি ১৯৭০

৭০. ড. সিরাজুল ইসলাম, *স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবেদের ভূমিকা*, বাংলাদেশের ১ম বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ, তথ্যমন্ত্রণালয়, ১৬ ডিসেম্বর১৯৭২, পৃ.৭৭

৭১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮২, পৃ.৭৩

৭২. *Assembly Proceedings Official Report*, East Bengal legislative Assembly, Third Session 1949. pp.259.

৭৩. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে-২০০০, পৃ.১২৫-১২৫

৭৪. Government of Pakistan, Ministry of Education Proceedings, 6th Meeting, *The Advisory Board of Education for Pakistan*, Held at Peshawar at 2-5 March 1954, p.34.

৭৫. *Assembly Proceedings Official Report*, East Pakistan Assembly, Third Session 24th to 27th September 1956, pp.179-210.

৭৬. *Assembly Proceedings official Report*, East Pakistan Provincial Assembly, Second Session 9th Jun 1963, pp.125-127.

৭৭. *Report of the Commission on the Student Problems and Welfare*, 1966, p.232

৭৮. নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন*, বাংলাদেশ, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭২, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৮৪-৮৫

৭৯. মোহাম্মদ আবুল কাশেম ও অন্যান্য, *হিস্টরি অব মুভমেন্ট ইন ইস্ট বেঙ্গল এ্যান এ্যানালিটিক্যাল স্ট্যাডি*, ১৯৪৭-১৯৬৯, কলকাতা ১৯৯২, পৃ.৯৪

৮০. দুর্গাদাস ধর, *বাংলাদেশের* উদ্ভব, বাংলাদেশ বিজয় দিবস সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ.৫০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কমিশন সমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা (১৯৪৭-৭১)

ভূমিকা: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা ছিল না। পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ সালে তার চৌদ্দ দফার ১২নং দফাতে উল্লেখ করেন: "মুসলমানের ধর্ম, ব্যক্তিগত আইনের রক্ষা এবং শিক্ষা, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য শাসনতন্ত্রে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" [১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে একটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচীতে উচ্চ পর্যায়ের এক সম্মেলন আহবান করা হয়। এই সম্মেলনে আশা করা হয়েছিল পাকিস্তান সরকার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে জাতীয় স্বার্থে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কমিশন গঠনসহ ব্যাপক সংস্কারের সুপারিশ করবে। কিন্তু করাচীতে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। এই শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব না করে শুধুমাত্র উর্দু ও ইংরেজি ভাষার প্রসার এবং এই ভাষা দু'টিকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন না করায় পাকিস্তান শাসনের পুরো সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তর থেকে প্রতিবাদ অব্যাহতো ছিল। ছাত্র এবং সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক গণআন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি এবং তিনটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটি এবং কমিশনসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করলেও কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে সমালোচিত হয়। কারণ এই সমস্ত সুপারিশে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনটি কমিশন গঠিত হয়, কমিশনসমূহ হলো

১। জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৯। এই কমিশন শরীফ শিক্ষা কমিশন নামেও পরিচিত

২। ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পকীয় কমিশন ১৯৬৬ বা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট

৩। পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি বা এয়ার মার্শাল এম. নূর খান কমিশন ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত ৫টি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিসমূহ হলো

১। পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি বা মওলানা আকরাম খান কমিটি ১৯৪৯-৫১

২।পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি বা আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৬। এই কমিটি মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়

৩। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন বা আতাউর রহমান খান কমিশন ১৯৫৭

৪। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বা মুয়ায্যাম হোসাইন কমিটি ১৯৬৩-৬৪

৫। পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি বা শামসুল হক কমিটি-১৯৭০

শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি বা মওলানা আকরাম খান কমিটি

ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। তাদের কাছে একটি বিদেশি সরকারের রেখে যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে পাকিস্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই যথাসময়ে পূর্ব বাংলার সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের অভিপ্রায়ে এবং সকল ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানকে (১৮৬৮-১৯৬৮) সভাপতি করে সতের সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। সাধারণ দায়িত্ব পালনের বাইরে এ.এফ.এম. আব্দুল হক এবং মৌলভী আলী নূরকে কমিটির যগ্ম সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষা বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য তাদের নির্ধারিত কার্যাবলি ছিল নিম্নরূপ

১। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী সম্পর্কে সুপারিশ;

২। উৎকৃষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি নিরুপণ এবং পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা, পুনর্গঠিত মাদ্রাসা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক পাঠ্যসূচীর সকল উপাদান সুসমন্বিত করা এবং ইসলামি ভাবধারা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো।

৩। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে একটি উন্নততর পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে যার উদ্দেশ্য হবে সঠিক পাঠ এবং বোঝার উপরে গুরুত্ব আরোপ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ণয় করা যাতে পাঠ্যক্রমে এবং নিয়ন্ত্রণে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।[২]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকার খুশি হয়ে সাধারণ কমিটিকে সাহায্যের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করেন:

১। মিস এল.এ. বাকের, স্কুল পরিদর্শক, পূর্ববঙ্গ

২। মিসেস রাবেয়া খাতুন,

৩। মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ,

৪। বেগম সুফিয়া কামাল

৫। মিসেস ডব্লিউ. এ. সাদামী,

৬। মিসেস ফজিলাতুন নেছা জোহা

৭। মিস আনসারী, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, রমনা প্রিপারেটরী স্কুল

কমিটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন মিস বাকের এবং সচিব হিসেবে কাজ করবেন শামসুন্নাহার মাহমুদ।[৩]

কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রদেশের শিক্ষা সংস্কারের সাথে যেসব সমস্যা জড়িত সেসব ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হবে এবং এটি ব্যাপকভাবে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানে প্রচার করতে হবে। কমিটি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হয় যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উপর প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা যা ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন তৈরি করে তার বিপরীতে প্রাপ্ত উত্তরমালাও কমিটি বিবেচনায় নেবে।

সাব কমিটি গঠন

কমিটির উপর ন্যস্ত সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয় এবং এতে নতুন সদস্য ও উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয় যাদের সাহায্যে কমিটির কাজে সুফল বয়ে আনবে। প্রত্যেক সাব-কমিটির কনভেনারকে সাধারণ কমিটির নিকট অতিসত্বর তথ্য উপস্থাপন করার ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়।[৪] আকরাম খান কমিটি বহু মূল্যবান সুপারিশ পেশ করলেও সুপারিশ সমূহের অধিকাংশই সরকারি উদাসীনতার কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ এই কমিটি সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের এই দাবি পূরণে সরকারের ইচ্ছা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি বা আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি ১৯৫৬

পূর্ববাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আশরাফুদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নাম দেওয়া হয় 'পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি'। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল একুশ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ

১। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কী কী ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা চিহ্নিত করে দূরীকরণ ও দেশের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করা।

২। দেশের উভয় ধারার শিক্ষা সমন্বিত করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন স্তর প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের সমান হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কীভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমাবেশ ঘটানো যায় সে ব্যাপারেও সুপারিশ করা, যাতে এ ধারার শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষা সমাপনান্তে সম্মানজনকভাবে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়।[৫]

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন বা আতাউর রহমান খান কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৭

যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। যুক্তফ্রন্টের শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বে ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করার জন্য একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এই সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং সদস্য ছিলেন ছয়জন। এই সংস্কার কমিশন একুশ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক রিপোর্ট পেশ করে। এছাড়াও কমিশন শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কমিশন গঠিত হয়

১। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান- চেয়ারম্যান

২। ড. মাহমুদ হাসান, চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পূর্ব পাকিস্তান।

৩। ড. এম. কিউ, খুদা, পরিচালক, রিজিওনাল ল্যাবরেটরীজ, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। আক্তার হামিদ খান, অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

৫। আবুল লায়েস, পাবলিক ইন্সট্রাকশন, পরিচালক (অব:), অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার কলেজ।

৬। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। পরিচালক, পাবলিক ইন্সট্রাকশন, পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এ দেশে চালু করার উদ্দেশ্যে দেশের বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ সুপারিশ করে। প্রথমে নগরে শিল্পাঞ্চলে ও পরে গ্রামে নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালু করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করে যে, সক্রিয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে এবং সম্ভব হলে আলাদাভাবে এই নার্সারি স্কুল গড়ে তুলতে হবে। প্রথমে সরকারি উদ্যোগে এই ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে পরবর্তীকালে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত হয়ে বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এসব স্কুলের শিক্ষক হিসেবে মহিলো দের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালুর সুপারিশ এবং গ্রাম ও শহর অঞ্চলে একই ধরণের শিক্ষা চালুর পরামর্শ দেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভাষা না পড়ানো এবং তৃতীয় শ্রেণীর আগে ধর্মশিক্ষা চালু না করার কথাও কমিশন বলে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা তুলে দিয়ে ৬ বছরের মাধ্যমিক কোর্স অর্থাৎ একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ধর্ম বাধ্যতামূলক না করে ধর্মের পরিবর্তে নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক কারিগরি ও কৃষি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব, স্কুলগুলিতে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করা, মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করা। ঢাকায় সংস্কৃত ও পালি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম, সকল ডিগ্রী কলেজে অনার্স কোর্স, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত হোস্টেল নির্মাণ, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের প্রস্তাব করে। বয়স্কদের স্বাক্ষরজ্ঞান করার প্রস্তাব এবং প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক সামগ্রী রাখার প্রস্তাব করে। কমিশন ৩১ মার্চ ১৯৫৭ সালের পূর্বেই সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।[৬] কিন্তু শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের কয়েক মাস পরই আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে রিপোর্টটি গণমুখী হলেও তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১৯৬৩-৬৪

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের ৩১ মে পূর্ব পাকিস্তান সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. এস.এম. হোসেনকে চেয়ারম্যান করে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। চেয়ারম্যানের নামানুসারে এটি'মুয়ায্যাম হোসাইন কমিটি' নামেও পরিচিত। এই কমিটি ১৯৬৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রিপোর্ট জমা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ

১। বর্তমানে মাদ্রাসা প্রদত্ত ইসলামি শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার বৃহত্তম আঙ্গিকে সমন্বয় সাধন করতে হবে। সেই সঙ্গে যাতে বাস্তব ইসলামি শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

২। কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সর্বস্তরে আনতে হবে যাতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে সম্মানজনক ভাবে কর্মে নিয়োজিত হয়ে সমাজে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং এর কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

৩। ইসলামি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং ইসলামি বিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪। দেশে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক স্থাপন ও এই লক্ষ্যে পৌঁছতে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুপারিশ পেশ করতে হবে।[৭]

পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি বা শামসুল হক কমিটি

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর জাতীয় বেতার ভাষণে এবং এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার অতীতের তুলনায় অধিক হারে সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করছে এবং শিক্ষার সমস্যা নিরসনে, শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে ও চাহিদা পূরণে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করবে। শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে কয়েকটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করা হয়। এই পর্যালোচনার আলোকে নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা পোষণ করেন যে, এভাবে প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতির উপর যাতে দেশের সর্বস্তরের সকল পেশার শিক্ষানুরাগীগণ মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পনের হাজার প্রশ্নমালা তৈরি করে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং জনগণের পাঠানো মন্তব্য, সুপারিশ ও সমালোচনা লিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়। এগুলোর পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার জন্য বিভিন্ন পেশার দক্ষ আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত স্টাডিগ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করেন যাতে রিপোর্টটিতে অধিকাংশ সদস্যের মতামত প্রতিফলিত হয়। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি সংশোধিত প্রস্তাবগুলোর পুনর্বিচেনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যারা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পেশ করবে। রিপোর্টটি ১৯৭০ সালের ১৩ ও ২৬ মার্চ মন্ত্রী সভায় গৃহীত হয় এবং ২৬ মার্চ ১৯৭০ সালে চূড়ান্তভাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ

পাকিস্তান সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপারে স্থির সংকল্প। এই নীতিটি ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের রাষ্ট্রীয় নীতির একটি মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৬০ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্বজনীনও অবৈতনিক ন্যূনতম সাত বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাস্ত বায়নের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। তবে সময় অতিক্রমের সাথে সাথে এই লক্ষ্য অর্জন থেকে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ নিরক্ষরতার হারের দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান হয়ে ওঠে অন্যতম। প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী না হওয়ায় সাক্ষরতা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে সহায়ক নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল ৮ বছর। তাই কমিটি ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৮ বছর করার সুপারিশ করে।[৯]

কমিটির উদ্দেশ্য ছিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭০-৭৫) মেয়াদে প্রাথমিক স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৭০ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় আনা। এই সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির হার সংশ্লিষ্টদের শতকরা ২৪ জনে উন্নীত করতে বাড়তি সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে যাতে ১৯৮০ সালের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।[১০]

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেগুলো নিম্নরূপ

১. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ১৯৮০ সালের মধ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

২. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি হওয়া সকল শিক্ষার্থীই যেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকে সে ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. যেখানে যতটা সম্ভব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং অধিক সংখ্যক মহিলো। শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল অর্জন করতে পারে এবং প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন সম্পূর্ণ করার পর প্রয়োজনের তাগিদে কর্মজীবন শুরু করে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের উপর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নির্ভরশীল। এই পর্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই স্তরের শিক্ষায় একদিকে থাকবে উচ্চ জ্ঞান আহরণের সুযোগ অন্যদিকে থাকবে জীবন ও জীবিকার লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক করার প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর অনুপাত স্বাভাবিকভাবে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দাঁড়ায় ৪০:৬০। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের (নবম ও দশম শ্রেণীতে) অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৪,৩৫,০০০ যাতে এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১.২২ মিলিয়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার পর্যাপ্ত উপকরণসহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।[১২]

উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ

ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে এবং সমাজ ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অধিক। জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে উচ্চ শিক্ষাই প্রধান অবলম্বন। মানুষের চিত্তকে সাহসী ও নির্ভীক করার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা সুস্পষ্ট। বর্তমানে দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরম সংকটের সম্মুখীন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মান কমে গেছে। কোন কোন স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে যোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে শিক্ষাঙ্গনগুলো কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়

১. ক) স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণাকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করতে হবে। পিএইচ.ডি এবং অন্যান্য গবেষণা কর্মসূচী বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমতার ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) জাতীয় গবেষণা বৃত্তি প্রকল্প শুরু ও গবেষণা বিষয়ে ফান্ড সৃষ্টি করে গবেষকদের ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে অর্থায়ন করার সুপারিশ করা হয়। একই সাথে একটি জাতীয় প্রফেসরশীপ প্রকল্প প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করা হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়ন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

২. জাতীয় চাহিদার নিরিখে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. আধুনিক ভাষা শিক্ষার জন্য ভাষা বিভাগের উন্নয়ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব মর্ডান ল্যাংগুয়েজ' নামে দু'টি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার প্রয়োজনীয় চাহিদার ভিত্তিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হয়।

৬. সকল প্রদেশের কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করা হয়।

৭. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজসমূহের অনুমোদন দান অব্যাহতোরাখার পাশাপাশি যেসব কলেজ দীর্ঘ যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন (Self-governing) প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। সহযোগিতার ভিত্তিতে শহরের কিছু কলেজকে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার অনুমতি দিতে হবে।

৮. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের উচ্চ শিক্ষা দানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন স্কেল বর্ধিত করতে হবে এবং তাদের চাকুরির সুযোগ সুবিধাও বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের উৎসাহ দানের লক্ষ্যে তাদের বেতন স্কেলের ভিত্তি হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গবেষণা কর্মের উপর।

৯. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকারি চাকুরিজীবীদের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ গ্রুপ ইন্সুরেন্স ফান্ড প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের আবাসিক সুযোগ কিংবা ভর্তুকীসহ ভাড়াবাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলা বিধির পূর্ণ পর্যালোচনা করতে হবে এবং যে কোন অযৌক্তিক অংশ বাদ দিতে হবে।

১১. পাকিস্তানের প্রদেশগুলো কমিশন প্রদত্ত মডেল অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্থাপন করবে।

১২. প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর করা হবে–

ক) সিনেট পুনরুদ্ধারের জন্য;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিউনিটির সকল শাখার স্বচ্ছ প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচনী নীতিমালার ব্যবস্থা করা হবে।

গ) ডিগ্রী প্রত্যাহারের নিয়ম বাতিল এবং

ঘ) শিক্ষার কেন্দ্র মূল্যবোধ ও আদর্শের সূতিকারগার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উন্নীত করতে হবে যা চর্চা করা হবে একটি স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

বিভাগোত্তর সময়ে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও নবগঠিত রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে এক সম্মেলন আহবান করা হয়। এই অধিবেশনে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

" শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষার প্রকৃত কাঠামোকে অতিগুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বিদেশি শাসনাধীনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা যদি প্রকৃত গতিশীল এবং বাস্তবধর্মী উন্নয়ন আশা করি, তবে আমাদেরকে এ সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে। এই মতে আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে জনগণের মেধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে সারা বিশ্বে শিক্ষার যে উন্নয়ন ঘটেছে তার অনুরূপ উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কী ধরনের শিক্ষা আমরা আমাদের সন্তানদের দান করছি এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ হিসেবে তাদের গড়ে তুলছি তার উপর। শিক্ষার অর্থ শুধুই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বরং তাৎক্ষণিক এবং জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষকে বৈজ্ঞানিক এবং পরিপূর্ণ শিক্ষাদান করা যাতে করে তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিনির্মানে অবদান রাখতে পারে। আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের প্রাতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "একই সাথে আমাদের বংশধরদের চরিত্রও গঠন করতে হবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের ভেতর সর্বোচ্চ সম্মানবোধ, সততা, দায়িত্ববোধ ও জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা জাগে। আমরা দেখতে চাই তারা পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছে এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এমন গুণের পরিচয় দিয়েছে যার ফলে তারা পাকিস্তানকে সমন্বিত করবে" [১৪]

শিক্ষা সম্মেলনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

১.সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে যাতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাথে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ধৈয্য ও ন্যায় বিচারের আদর্শের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২. অবৈতনিক এবং রাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে পাঁচ বছর মেয়াদী বা ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হবে আট বছর মেয়াদে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা হবে সহ-শিক্ষা (Co-education) বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী।

৪. কারিগরী শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী মেধাবী জনগণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং রাজ্য সরকারগুলো এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দান করে। [১৫] শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সিকি শতাব্দী ধরেও বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত যা কিছু অগ্রগতি তার সবই পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষার বিষয়টিও পাকিস্তান শাসনের পুরো সময় জুড়ে উপেক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক আইন-১৯৫১

১৯৫১ সালে প্রাদেশিক পরিষদে বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন (ইস্ট বেঙ্গল অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে দশ বৎসর মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য দশ বৎসরের একটি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালের ১৬ই আগস্ট প্রদেশের সকল গ্রামীণ অঞ্চলে (চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত) প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এই ধারা মোতাবেক প্রতি বছর্র প্রত্যেক থানায় একটি করে ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয় এবং এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা স্কুল বোর্ডকে যা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে থাকবে। ২৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয় ও ১৫০০০ শিক্ষক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসে। কিন্তু দুই বছর পর এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।[১৬] ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে একুশ দফার জনপ্রিয় দাবি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন তার মধ্যে একটি দাবি ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। এই সরকারও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারেনি নানা কারণে, তবে এর মধ্যে অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দের যে প্রত্যাশা করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা পাওয়া যায়নি। এর ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যেমন- বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির অভাব, প্রতি স্কুলে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য মাত্র তিনজন শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক সুসমন্বিত প্রস্তুতির অভাব। ১৯৫৭ সাল থেকে বাধ্যতামূলক এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ' মডেল' ও 'নন-মডেল' স্কুলে পরিণত করা হয়।[১৬ক]

বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা (সিলেট) আইন ১৯৫১

পূর্ব বাংলার গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৫১ সালের ন্যায় ১৯৫১ সালে সিলেট জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৫১ পাস করা হয়। নির্বাচিত কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আবশ্যিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণভার প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণ করা হয়।[১৭]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ৬০০০টি বিদ্যালয়ের বস্তুগত উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। এই বস্তুগত উন্নয়নের মধ্যে ছিল প্রবেশিকা পাস শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং ভাল ইমরাত নির্মাণ। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৬০০০টি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব হয় তাহলে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে Village Aid-এর অধীনে অতিরিক্ত কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য স্থাপনের অথবা উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই সংযুক্তি এবং উন্নয়নের ফলে ছাত্রছাত্রী নিবন্ধনের পরিমাণ বাড়ানো হবে পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ লক্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৪ লক্ষ। [১৮]

পূর্ব পাকিস্তান (Rural) প্রাথমিক শিক্ষা (Supplimentary Provision) আইন ১৯৫৭

১৯৫১ সালের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা আইনের শেষে ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান (Rural প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়। এই সময়ে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় ছিল। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার পূর্ব পাকিস্তান (Rural) প্রাথমিক শিক্ষা (Supplimentary Provision) অর্ডিন্যান্স ১৯৫৭ (East Pakistan Ordinance No Xv of 1957) ঘোষণা করে। এই আইনে স্কুল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এই বিলটি প্রথমে ১৯৫৭ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর আইন পরিষদে উত্থাপন করেন। আইন পরিষদে দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৫৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এই আইনটি পাস হয়। এই আইন পাস হওয়ার ফলে দশ বছর মেয়াদী অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে।[১৯] এই আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের পক্ষে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পান এবং জেলা ইন্সপেক্টর বিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। [২০]

নিম্নের সারণিতে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো : [২১]

সারণি-৩৮

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা					
	১৯৫৮-৫৯		১৯৫৭-৫৮		বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-) ছেলেদের জন্য	বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-) মেয়েদের জন্য
	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য		
১.বিশ্ববিদ্যালয়	২	-	-	-	-	-
২. মানবিক ও বিজ্ঞান কলেজ	৬৯	৯	৭১	৯	-২	-
৩. পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয়	১৬	১	১৪	১	+২	-

Dhaka University Institutional Repository

৪. হাইস্কুল	১৬০৩	৮৯	১৫৫১	৮৭	+৫২	+২
৫. জুনিয়র হাইস্কুল	৩৯২	৪৩	৩২১	৩১	+৭১	+১২
৬. মিডল স্কুল	৭৮৩	১৫২	৮৭৯	১৬১	-৯৬	-৯
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬০৩	২০৮৫	২৪৪৬৫	২১১৪	-১৩৮	-২৯
৮. প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়	৫	১১	৫	৫		+৬
৯.বিশেষ বিদ্যালয়	৩০৬৭	৭৮	২৮৩৮	৭৯	+২২৯	-১
১০.অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২২	১৫	১১৯	৪৬	+৩	-৩১
মোট-	৩০৬৬২	২৪৮৩	৩০২৬৫	২৫৩৩	+৩৯৭	-৫০

১৯৫৮-৫৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পূর্বের ন্যায় সরাসরি শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গ্রামাঞ্চলে এটি স্থানীয় প্রতিনিধি ও শিক্ষা বিভাগের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে 'মডেল প্রাথমিক পরিকল্পনা' চালু করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রাথমিক পূর্ব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ২৬৭০৪টি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল ২৬৫৮৯টি। এই সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯,৮৬,৮৭০ জন এবং ২৭,৯৫,৯০৮ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭৭,২২২ জন, যাদের মধ্যে ৫২,৬২৭ জন ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৪৮২৬ জন যাদের মধ্যে ৫২৩২৫ জন ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ১৯৫৮-৫৯ সালে বিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যয় করা হয় ৪,৫৯,১৪,৯০৩ রুপি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে এই ব্যয় ছিল ৩,০৪,৪৭,৭৮৭ রুপি। [২২]

নিম্নের সারণিতে ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে (Recognised) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো: [২৩]

সারণি-৩৯

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা					
	১৯৫৯-৬০		১৯৫৮-৫৯		বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-) ছেলেদের জন্য	বৃদ্ধি(+)হ্রাস (- মেয়েদের জন্য
	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য		
১.বিশ্ববিদ্যালয়	২	-	-	-	-	-
২. মানবিক ও বিজ্ঞান কলেজ	৭২	১০	৬৯	৯	+৩	+১

E:\k.r15-02-2012\1-5 doc 13-01-12 doc

Dhaka University Institutional Repository

৩. পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয়	১৬	১	১৬	১	-	-
৪. হাইস্কুল	১৬৩৪	৯৫	১৬০৩	৮৯	+৩১	+৬
৫. জুনিয়র হাইস্কুল	৪৮৮	৫৪	৩৯২	৪৩	+৯৬	+১১
৬. মিডল স্কুল	৬৩৪	১৪৮	৭৮৩	১৫২	-১৪৯	-৪
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬১০	১৯৭৩	২৪৬০৩	২০৮৫	+৭	-১১২
৮. প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়	৬	১১	৫	১১	+১	-
৯.বিশেষ বিদ্যালয়	৩৪০১	৭১	৩০৬৭	৭৮	+৩৩৪	-৭
১০.অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭৩	২০	১২২	১৫	+৫১	+৫
মোট	৩১০৩৬	২৩৮৩	৩০৬৬২	২৪৮৩	+৩৭৪	-১০০

১৯৫৯-৬০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা শহর ও গ্রামাঞ্চলে পূর্বের ন্যায় একই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেই সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামাঞ্চলে পূর্বের ন্যায় সরাসরি শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অপরদিকে শহরাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের যৌথ নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল। পূর্বের ন্যায় মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। প্রাথমিক পূর্ব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৬৬০০, যা পূর্বের বছরে ছিল ২৬৭০৪টি। কিছু অনুদানপ্রাপ্ত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় বিভিন্ন কারণে যেমন, অর্থনৈতিক, সহশিক্ষা জনপ্রিয় হওয়া ইত্যাদির জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩১৮২২৯৩ জন। এদের মধ্যে বালিকা ছিল ৮,৪২,৬০৭ জন। অপরদিকে এর পূর্বের বছরে মোট শিক্ষার্থী ২৯,৮৬,৮৭০ জনের মধ্যে বালিকা ছিল ৮,১৫,৩৪৮ জন। ১৯৫৯-৬০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন ৭৮৫৬৭ জন, যাদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন ৫২,৫৪৪ জন। এর পূর্বের বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৭৭১২৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫২৫৩৬ জন ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ১৯৫৯-৬০ এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেলেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ব্যয় করা হয় ৩,৬৮,৯৮,৮৯৭ রুপি। যার মধ্যে ৩,৫৫,৩৮,৯২৬ রুপি আসে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে। পূর্ববর্তী বছরে এই ব্যয় ছিল ৪,৫৯,১৪,৯০৩ রুপি, যার ৪,৪২,৭৫,৭৫,২৬৯ রুপি আসে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় কমানো হয়। [২৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়

পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম থেকে পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদের (পূর্বের সিন্ধু প্রদেশের) সামান্য সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেদের এবং ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. সরকারি বিদ্যালয়

২. লোকাল বডি (District Board/ Municipal Committee) কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়,

৩. বেসরকারি বিদ্যালয় যা সরকারি সাহায্যে পরিচালিত এবং

৪. বেসরকারি বিদ্যালয় যা সরকারি সাহায্য ছাড়াই পরিচালিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোর অর্থায়ন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত হতোলোকাল বডি কর্তৃক। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো বেসরকারি সংস্থা দ্বারা যার প্রথমটি সরকারি অনুদান পেতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অনুদান পাওয়া না পাওয়ার ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়া হতো।

নিম্নের সারণিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৫৯-৬০ সময়ের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে লিঙ্গ ও .নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করে দেখানো হলো [২৫]

সারণি-৪০

বিদ্যালয়ের প্রকৃতি	মোট	বালক বিদ্যালয়	বালিকা বিদ্যালয়
১. সরকারি	৬৮৪৫	৬৩০২	৫৪৩
২. লোকাল বডি পরিচালিত	৯৭৫২	৭৩৬৭	২৩৮৫
৩. বেসরকারি	৯০৭	৭১৩	১৯৪
মোট	১৭৫০৪	১৪৩৮২	৩১২২

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ ছিল প্রায় ৫ গুণ বেশি। মোট বিদ্যালয়ের ৮২ শতাংশ ছিল ছেলেদের জন্য এবং মাত্র ১৮ শতাংশ ছিল মেয়েদের জন্য সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩৮ শতাংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাকি ৬২ শতাংশ বিদ্যালয় লোকাল বডি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হতো। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৯২ শতাংশ ছিল ছেলেদের জন্য এবং মাত্র ৮ শতাংশ ছিল মেয়েদের জন। [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থী নিবন্ধন

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪,৩৬,৫৯০ জন। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বিন্যাস দেখানো হলো ।[২৭]

সারণি-৪১

বিদ্যালয়ের প্রকৃতি	শিক্ষার্থী সংখ্যা	ছেলে	মেয়ে
১. সরকারি	৪,৬২,৪১৬	৪,০৪,২৯০	৫৮,১২৬
২. লোকাল বডি পরিচালিত	৮,৭৩,১২০	৭,০৪,৮০৭	১,৬৮,৩১৩
৩. বেসরকারি	১,০১,০৫৪	৭৭,১৫১	২৩,৯০৩
মোট	১৪,৩৬,৫৯০	১১,৮৬,২৪৮	২,৫০,৩৪২

উপরের তালিকায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের সংখ্যা ছিল মেয়েদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। মোট শিক্ষার্থীর ৮৩ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। সমগ্র শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। বাকি ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত লোকাল বডি পরিচালিত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের অনুপাত ছিল ৯০:১০[২৮]

শিক্ষক সংখ্যা

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪১,৫৩৮ জন। লিঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা নিম্নের সারণিতে দেখান হলো :[২৯]

সারণি-৪২

বিদ্যালয়ের প্রকৃতি	মোট শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
১. সরকারি	১৪৪৮৫	১৩২৫০	১২৩৫
২. লোকাল বডি পরিচালিত	২৪৩০৩	১৯২৫১	৫০৫২
৩. বেসরকারি	২৭৫০	২১৪৪	৬০৬
মোট	৪১৫৩৮	৩৪৬৪৫	৬৮৯৩

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, মোট শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ ও মহিলো ী যথাক্রমে ৮৩ এবং ১৭ শতাংশ। এদের মধ্যে মাত্র ৩৫ শতাংশ শিক্ষক সরকারি বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। বাকি ৬৫ শতাংশ শিক্ষক লোকাল বডি দ্বারা এবং বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলো ী শিক্ষকের অনুপাত ছিল ৯১:৯। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১:৩২ এবং ১:৩৬।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হতো। এগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি তহবিল, স্থানীয় তহবিল এবং বিবিধ (বেতন, চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি)। প্রশাসনিক ব্যয় বাদে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয় ছিল ৫,৬২,৯৮,০০০ রুপি। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৮৫:১৫। বিভিন্ন উৎস থেকে মোট আয়ের পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো : [৩১]

সারণি-৪৩

আয়ের উৎস	মোট আয়	বালক বিদ্যালয়	বালিকা বিদ্যালয়
১. সরকারি তহবিল	৪,৩৫,৮৩০০০	৩৭,৯০,৩০০০	৫৬,৭৯,০০০
২. স্থানীয় তহবিল	১,১৮,৭৭০০০	৯৩,২৬,০০০	৩৫,৫১,০০০
৩. বিবিধ	৮৩,৯,০০০	৬,৪৯,০০০	১,৯০,০০০
মোট	৫,৬২,৯৮,০০০	৪,৭৮,৭৮,০০০	৮৪,২০,০০০

উপরের তালিকায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট সরকারি ও বেসরকারি তহবিলের অনুপাত ৭৭:২৩

মূল্যায়ন

উপরের পরিসংখ্যান থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯৩৩৪টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল প্রায় ১১ হাজার কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সময় পূর্বের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমেছে, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে ৬ হাজারেরও বেশি। অর্থাৎ এ সময়ে (১৯৫৯-৬০) পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল (প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়সহ) ২৬,৬০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৭,৫০৪টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১,৮২,২৯৩ জন এবং ১৪,৩৬,৫৯০ জন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৮,৫৬৭ জন ৪১,৫৩৮ জন। পূর্ব প্যাকিস্তানে এ বছরে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করা হয় ৩,৬৮,৯৮,৮৯৭ রুপি; উল্লেখ্য পূর্বের বছরে এই ব্যয় ছিল ৪,৫৯,১৪,৯০৩ রুপি। পশ্চিম পাকিস্তানে এ বছরে ব্যয় করা হয় ৫,৬২,৯৮,০০০ রুপি। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৭৭:২৩। সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষায় কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ভার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ৩৮ শতাংশ বিদ্যালয় সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। নিম্নের সারণিতে ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬০-৬১ সালের (Recognised) পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো[৩২]

E:\[illegible].doc

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪৪

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা					
	১৯৬১-৬২		১৯৬০-৬১		বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-) ছেলেদের জন্য	বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-)মেয়েদের জন্য
	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য		
১.বিশ্ববিদ্যালয়	২	-	-	-	+২	-
২. মানবিক ও বিজ্ঞান কলেজ	৭৫ (এ)	১০(বি)	৭২	৯	+৩	+১
৩. পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয়	১৭ (এ)	২(বি)	১৬	১	+১	+১
৪. হাইস্কুল	১৭৪৬	১০৭	১৬৮৫	১০৩	+৬১	+৪
৫. জুনিয়র হাইস্কুল	৬৭৪	১০২	৫৫৩	৬৮	+১২১	+৩৪
৬. মিডল স্কুল	৪৯৯	১২৪	৫৮৯	১৪২	-৯০	-১৮
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯৫৪	১৭৯৩	২৪৭৫৪	১৯১১	+২০০	-১১৮
৮. প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়	১৭	১৫	৫	১৪	+১২	+১
৯.বিশেষ বিদ্যালয়	৩৭৫০	৮৩	৩৫২৪	৭২	+২২৬	+১১
১০.অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৯৯	২৭	৩১৬	৪৫	-১৭	-১৮
মোট	৩২০৩৫	২২৬৩	৩১৫১৬	২৩৬৫	+৫১৯	-১০২

বি:দ্র: (এ) নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ কর্ম ও ক্যাডেট কলেজসহ

(বি) নব প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১৯৬১-৬২ সময়কালে গ্রামে ও শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ পূর্বের ন্যায় একই কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল। নব প্রচলিত মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কিম গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৯৬১-৬২ সালে প্রাথমিক পূর্ব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৬৭৭৯টি যা পর্ববর্তী বছরে ছিল ২৪৬৮৪টি। এই সময়ে ৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ১৯৬০-৬১ সালেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫,২৮,৮০৪জন। এদের মধ্যে ছাত্রী ছিল ৯,৫৯,৫৭৯ জন। পূর্ববর্তী বছরে ৩৪,৩৭,৫৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৯,৫৫,৯৩৮জন। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮২৬৮২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫২৬৪৫ জন ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এর আগের বছরে ৮০,৬৪৮ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন ৫০৮৫৯ জন। ১৯৬১-৬২ সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করা হয় ৩,৮৯,৩৪,০৭২ রুপি যার মধ্যে ৩,৭৪,৫০,২০০রুপি আসে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে। পূর্ববর্তী বছরে এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩,৮৮,১৫,৫৬২ রুপি এবং এই অর্থের মধ্যে ৩,৭৪,২৯,১২৯ রুপি সরাসরি প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে খরচ করা হয়।[৩৩]

নিম্নের সারণিতে ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬১-৬২ সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রম-বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো : [৩৪]

সারণি-৪৫

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা					
	১৯৬২-৬৩		১৯৬১-৬২		বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-) ছেলেদের জন্য	বৃদ্ধি(+)হ্রাস (-)মেয়েদের জন্য
	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য		
১.বিশ্ববিদ্যালয়	৪	-	৪	-	-	-
২. মানবিক ও বিজ্ঞান কলেজ	৮২	১১	৭৫	১০	+৭	+১
৩. পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয়	৩০	২	১৭	২	+১৩	-
৪. হাইস্কুল	১৮০৫	১১৯	১৭৪৬	১০৭	+৫৯	+১২
৫. জুনিয়র হাইস্কুল	৮৩৫	১৬৬	৬৭৪	১০২	+১৬১	+৬৪
৬. মিডল স্কুল	৩৭১	৮৩	৪৯৯	১২৪	-১২৮	-৪১
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩৫১	১৮০৩	২৪৯৫৪	১৭৯৩	+৩৯৭	+১০
৮. প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়	৮	১৯	১৭	১৫	-৯	+৪
৯.বিশেষ বিদ্যালয়	৪২১০	৫৬	৩৭৫০	৮৩	+৪৬০	-২৭
১০.অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০১	১০	২৯৯	২৭	-৯৮	-১৭
মোট =	৩২৮৯৭	২২৬৯	৩২০৩৫	২২৬৩	+৮৬২	+৬

শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যয়

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা পূর্বের ন্যায় সরাসরি শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং শহরাঞ্চলে ছিল যৌথ ভাবে শিক্ষা বিভাগ ও স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট প্রাথমিক ও প্রাথমিক পূর্ব বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৭১৭৬টি পূর্বের বছরে ছিল ২৬৭৭৯টি। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৯৭টি। ১৯৬২-৬৩ সালে ৩৭,৩১,৩৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০,১৪,৭০৯ জন ছিল ছাত্রী। আগের বছরে ৩৫,২৮,৮০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৯,৫৯,৫৭৯ জন । এই সময়ে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৮৬৭৮৯ জন, এদের মধ্যে ৫৫২৬০ ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যার ৬২৬ জন মহিলো।। আগের বছরে ৮২৬৮২ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন ৫২৬৪৫ জন যার মধ্যে ৬০০ জন মহিলো।। প্রাথমিক শিক্ষায় ১৯৬২-৬৩ সালে ব্যয়কৃত ৪৮২৪৯৩১৮ রুপির মধ্যে ৪৬৬১৯২৮৪ রুপি আসে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে। পূর্ববর্তী বছরে এই ব্যয় ছিল ৩,৮৯,৩৪,১৪২ রুপি যার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকেই আসে ৩,৭৪,৫০,২০০০ রুপি। [৩৫]

নিম্নের সারণিতে ১৯৬২-৬৩ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হলো [৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪৬

বিবরণ	বালক বিদ্যালয়	বালিকা বিদ্যালয়	মোট
১.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১,৬২৩	৬,৭১৫	২৮,৩৩৮
২.শিক্ষার্থী নিবন্ধন	১৬,৬৮,১৪২	৪,১৮,০৮৬	২০,৮৬,২২৮
৩.শিক্ষক সংখ্যা	৫০,২৭৬	১৩,২৭৪	৬৩,৫৫০
৪.প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়	৬,৩৫,৪৬,০০০	২,০১,৪৫০০০	৮,৩৬,৮১,১০০

মূল্যায়ন

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২-৬৩ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ব্যয়ের সাথে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এই অগ্রগতি ছিল অনেক বেশি। যেমন, পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,০০০। ১৫-১৬ বছর পর সেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬২-৬৩ সালে দাঁড়ায় ২৮৩৩৮ টিতে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল২৯,৬৩৩ জন এবং শিক্ষার্থী নিবন্ধন ছিল ২৬,৬১,৫৪৭ জন। ১৯৬২-৬৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭১৭৬টি এবং শিক্ষার্থী নিবন্ধন ৩৭,৩১,৩৩৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অনেক গুণ বেশি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের ব্যবধানও ছিল অনেক বেশি। যেমন ১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় ৪,৮২,৪৯,৩১৮ রুপি। পশ্চিম পাকিস্তানে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮,৩৬,৮১,১০০ রুপি যা পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষার্থী অনুপাতে অনেক বেশি। এ থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণই প্রকাশ পায়।

জাতীয় কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৯ ও প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। যে প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশন নিযুক্ত করা হয় তার ভূমিকায় বলা হয়: "পাকিস্তানের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির অভাব পূরণের ও প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিতোসামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সংঘবদ্ধ ও সুষম উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানার্থে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের যথাযোগ্য পন্থা সুপারিশ করার জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"[৩৭] পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। তিনি কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রতি জোর দেন এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যায়নসমূহ যেন আরও সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সেরূপ একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুরোধ জানান। তিনি কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠন, উন্নত মানসিকতা অর্জন এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজের সমন্বয় সাধন এবং মানসিক প্রবণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করে বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তি ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন পদ্ধতির সকল দিক বিবেচনা করে একটি সর্বাত্মক প্রশ্নমালা ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের সর্বত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রেরণ করেন এবং সেই সাথে সংবাদপত্রেও প্রচার করেন। শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে অনেকে বিস্তারিত স্মারকলিপি পেশ করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিল পর্যন্ত কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও কমিশন চারজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে কয়েকটি বৈঠকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রন জানান। তাঁরা হলেন- যুক্তরাষ্ট্রের ব্লুমিংটনস্থিত ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডক্টর হারম্যান বি. ওয়েল্স এবং পিটসবার্গস্থিত কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর প্রেসিডেন্ট ডক্টর জন সি. ওয়ার্নার, পাকিস্তানের আই. এইচ. কোরেশী ও অধ্যাপক ডক্টর আব্দুস সালাম।[৩৮] এই চারজনেরই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে আদৌ সকল সদস্যের সমবেত ও সমন্বিত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের যুক্তি ছিল যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদে অধ্যয়ন করে। অন্যদিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু হয়ে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। বাধ্যতামূলক শিক্ষাই সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের উপায় এবং এই উপায়ে শিশুদের প্রতিভা নিরূপন করে পরবর্তী শিক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়। দক্ষ জনশক্তি ও বুদ্ধিমান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রয়োজন। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশুদেরকে এরূপ একটি স্তরে উন্নীত করা যায় যেখানে সে স্বাধীনভাবে এসব সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার ও দায়িত্ব পালন করতে পারবে। তাই উন্নত দেশের ন্যায় কমিশন আট বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করে। ১৯৪৭ সালে প্রথম নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেও দীর্ঘ এগার বছরেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় কমিশন সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেই সঙ্গে কমিশন সুপারিশ

Dhaka University Institutional Repository

করে যে প্রথমে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা এবং দশ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জিত হলে পরবর্তী পনের বছরের মধ্যে আট বছর মেয়াদী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে।[৩৯] শিশুদের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিন্তু দুই বা তিন বছরের মধ্যে অনেকে ঝরে পড়ে। কোন কোন অঞ্চলে ঝরে পড়ার হার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। এই সময়ে শিশুর অক্ষর জ্ঞানও হয় না অথচ সম্পদের অপচয় হয়। এ কারণে কমিশন মনে করে বিপুল সংখ্যক শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিশুরা ভর্তি হয়ে যাতে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন দুইটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেয়েদের নয় বছর বা দশ বছর অথবা তারও বেশি সময় অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করা; দ্বিতীয়ত, পাঁচ বছরে কিছু বেশি এবং দশ বছরের কিছু বেশি বয়সসীমার সকল শিশুর জন্য ক্রমান্বয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলে এর নিজস্ব পদ্ধতি নিরূপনের স্বাধীনতা থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরে সর্বনিম্ন ২০০ দিন কার্যদিবস হবে যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা সময় বিদ্যালয়ে ব্যয় করতে হবে।[৪০]

সদিচ্ছা ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় পরিপূর্ণ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৯৫৯) রিপোর্টে আপাত অনেক আশ্বাস থাকলেও যে সত্যটি গোপন থাকেনি তাহলো, এ সকল মৌলিক চিন্তার উৎস ছিল নতুন সামরিক সরকার যার পেছনে বৈধ কোন জনসমর্থন ছিল না। দশ-বারো বৎসরের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর সামরিক সরকার যে শক্ত হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে তার লক্ষ্য হবে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেখানে সামাজিক সুবিচার কায়েম হবে। এই দাবির শূন্যগর্ভতা প্রকাশ পায় তখনই যখন দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেও এর দায়দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলা হয়নি। গ্রাম-গঞ্জে স্কুল ঘর নির্মাণের ব্যয় গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র জনসাধারণকেই বহন করতে বলা হয়েছে। ভাষা বিতর্কিত প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। জোর সুপারিশ রাখা হয়েছে কতিপয় উন্নতমানের আবাসিক স্কুলের জন্য। বলা যায় কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র বলতে একটি সুবিধাভোগী কল্যাণকেই বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপক কাঠামোর কোনও গুণগত পরিবর্তন না ঘটিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমষ্টির স্বার্থ চাপা পড়ে অন্যদিকে কতিপয় ভাগ্যবানের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসিক ব্যয়বহুল বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- প্রতিটি সেনানিবাসে একটি করে বনেদি স্কুল উপঢৌকন পায় দেশের শিল্পপতিদের কাছ থেকে। শরীফ কমিশনের রিপোর্টে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্ত করতে গিয়ে পাকিস্তানের জাতিতত্ত্বের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এই কমিশনে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও উদ্বেগ প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। শরীফ কমিশনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্যের পটভূমিতে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অদূরদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি দূরদর্শী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায় না, এই ধারণা নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল না। কমিশনের শিক্ষা আলোচনায় প্রথমেই স্থান পেয়েছে উচ্চ শিক্ষা, তারপর মাধ্যমিক ও শেষে প্রাথমিক শিক্ষা।

ছাত্র কল্যাণ ও ছাত্র সমস্যা সম্পর্কিত কমিশন বা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও প্রাথমিক শিক্ষা

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা বিষয়ক নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রেসিডেন্ট ছাত্র বিক্ষোভের কারণসমূহ অনুসন্ধান ও শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার জন্য এই কমিশন গঠন করেন। কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট মুলতানে ঘোষণা করেন, " A high power commission would be appointed to investigate in to the Problems of the Students."[৪১] কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব বিশেষ করে ছাত্রদের ২২ দফা দাবির যুক্তি খণ্ডন করে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৯) বাস্তবায়নের পক্ষেই মতামত দেন। রিপোর্টের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত। এতে কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ রেখে এ গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ছাত্র সংসদের তৎপরতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে। ১৯৬২ সাল থেকে শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপারে কমিশন সরকার ও পুলিশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকেই পরোক্ষভাবে দায়ি করে। এ ক্ষেত্রে কমিশন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা এবং তা সম্ভব না হলে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করে। পাশাপাশি কমিশন ছাত্র সংগঠনকে সরকারি দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন করার বিধান জারি করার সুপারিশ করে।[৪২]

প্রাথমিক শিক্ষা

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করার দাবি জানায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের দাবি ছিল প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করতে হবে প্রবেশিকা পর্যন্ত, তবে এই বিষয়ে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের দাবি ছিল ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৭৫ সালে মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করতে হবে। উভয় পাকিস্তানের ছাত্ররাই কিন্ডার গার্টেন এবং ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় উঠিয়ে দিয়ে সব বিদ্যালয়ে একই শিক্ষাক্রম চালু করার আবেদন জানায়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল প্রায় ১৮০০০টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ২৬৩০০টি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫২০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ১৩৩০০টি বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উভয় অঞ্চলের সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯৭০ সালের মধ্যে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করার দাবি গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা ও সরকার মনে করে সেখানে দশ বছরের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শিক্ষাকে আবশ্যিক করা সম্ভব কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে পারলেও আবশ্যিক করা সম্ভব নয়। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বেশি। যেমন-১৯৬৪-৬৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২,৭৮,০০০ জন এর মধ্যে ৩২০০০০০ জন ঝরে পড়ে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি প্রতিরোধের কারণে এই ঝরে পড়ার হার অনেক কম।[৪৪]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৬০-৬৫) শেষে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৪০০০জন। ১৯৬২-৬৩ সালের শেষ নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৬৩৫৫০জন। ঐ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০০০০ ও ৯০৫৪ জন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৬৩০০টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮৩৩৮টি ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত ছিল। এর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৮৬২২৮ জন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পারিকল্পনার (১৯৬৫-৭০) অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭২ লাখ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৬০ লাখ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখা প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও এতে পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫ কোটি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ কোটি রুপি ব্যয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে এই অর্থের মধ্যে ৩২ কোটি রুপি দালান ও প্রাথমিক শিক্ষার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বাবদ ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[৪৫]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন:

পূর্ব পাকিস্তান

১. প্রবেশিকা পাস (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) রুপি ৮০-১-৯০-২-১০০

২. প্রবেশিকা পাস (প্রশিক্ষণ ব্যতীত) রুপি ৬০-১-৭০-২-৯০

৩. প্রবেশিকা পাস নন (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) রুপি ৫০-১-৬০-২-৮০

৪. প্রবেশিকা পাস নন (প্রশিক্ষণ ব্যতীত) রুপি ৪৫(নির্ধরিত)।

পশ্চিম পাকিস্তান

১. প্রবেশিকা পাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (Junior Vernacular) ১০০-৪-১৪০-৫-১৭৫ রুপি

২. প্রবেশিকা পাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (Senior Vernacular) ১১৫-৫-১৮০-৭-২১৫ রুপি

স্কেলে ১০% সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হতো শুধুমাত্র মিডল স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষকদের বেতন পর্যাপ্ত না হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় আসতে চাইত না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। তাই কমিশন দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের পর্যায়ে আনার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রবেশিকা পাস শিক্ষকদের বেতন স্কেল কমপক্ষে ১০০ রুপি এবং প্রশিক্ষণ ব্যতীত প্রবেশিকা পাস নন এমন শিক্ষকদের বেতন স্কেল অন্তত: ৭৫ রুপি করার সুপরিশ করে। এছাড়াও কমিশন দুই বা তিন বছরের মধ্যে শিক্ষকদের শিক্ষকতায় যোগ্যতা অর্জন করার প্রস্তাব করে।[৪৬]

কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের দ্বিতীয় দাবি ছিল ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা মানের বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে এবং দেশের সকল বিদ্যালয় একই নিয়মের আওতায় আনতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা আরও দাবি করে পুরনো ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জিনিসপত্র সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু কমিশন মনে করে তাদের দাবি যথার্থ নয়। কিছু সাধারণ বিদ্যালয় তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর বেশিরভাগই পরিচালিত হয় বেসরকারি ব্যক্তিদের বা সমাজপতিদের বা খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা। কমিশন আরও বলে, "একটি সম্পূর্ণ উন্নত রাষ্ট্র মনে করে শিক্ষার বিষয়টি বেসরকারি খাতে থাকা উচিত। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের সমাজ যেমন আমাদের দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ সরকারি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে একসঙ্গে কাজ করতে চায় না। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং এর শিক্ষা রাষ্ট্র বা জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী নয়। আমাদের হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যা প্রমাণ করে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপরোক্ত বিষয় দু'টির একটিও লঙ্ঘন করছে।"[৪৭] কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম বা ইংরেজি প্রকৃতির (Type) বিদ্যালয়গুলোর কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। কিন্তু এর অধিকাংশই বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যেহেতু এগুলো ব্যয়বহুল তাই এগুলোতে পড়তে আসত শুধুমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা। এখান থেকে যারা শিক্ষালাভ করে তারা অহংকারী হত। এ ব্যাপারে কমিশনের যুক্তি ছিল, যেসব বিদ্যালয়ে ৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আছে তাদের শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সাধারণভাবে এই অনুমোদনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো সরকারি অনুদান পায়। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে এবং মানসম্পন্ন। এগুলোতে রয়েছে শারীরিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কমিশনের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই যে এসব বিদ্যালয় অহংকারী শিক্ষার্থী তৈরি করছে। বরং তারা পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করছে। তাই কমিশন মনে করেন না যে, এসব বিদ্যালয় কোন গোত্রের জন্য ক্ষতিকর বলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যক্রমের ভিন্নতা

শিক্ষা কমিশন অনুমোদন করে যে, " শিশুর মৌলিক দক্ষতা এমনভাবে সন্নিবেশিত হতে হবে যা তার পর্যায়ে যথেষ্ট এবং তার প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।" সমাজ শিক্ষা, মৌলিক বিজ্ঞান, হাতের কাজ ও জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করে এমন সব জ্ঞান শিশুকে দেওয়ার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ১০০০০ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৫০০ স্কুলের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক কৃষিকাজ ও হস্তশিল্প শিক্ষা বিষয় দু'টি দ্রুত পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে কমিশন। [৪৯] উল্লেখ্য যে, এই সুপারিশেও কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে অধিকহারে শিশুদের কৃষিকাজ এবং হস্তশিল্পের মত শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে সুপারিশ করেছে।

শিক্ষার মাধ্যম

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় মাতৃভাষা অথবা দুটি জাতীয় ভাষার একটি পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

নয়া শিক্ষা নীতির জন্য প্রস্তাব (১৯৬৯) ও শিক্ষানীতি পরিবর্তনেরর প্রয়োজনীয়তা

কমিশন পাকিস্তানের নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন যে, পাকিস্তানে বর্তমানে দুইটি শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি চলমান রয়েছে। এটাকে আধুনিক এবং ক্লাসিক্যাল পদ্ধতি বলা যেতে পারে। আধুনিক ব্যবস্থাটি বৃটিশ কর্তৃক উন্নীত করে যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারি চাকরীর জন্য যুব সমাজকে প্রস্তুত করা, যা প্রধানত ছিল কেরানী তৈরি করা এবং এই ধারা স্বাধীন উন্নয়নশীল জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজন বিবর্জিত। তাই বর্তমানের জাতীয় প্রয়োজনের আলোকে পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির সংজ্ঞায়ন হওয়া প্রয়োজন। এই সংজ্ঞায়নের পূর্বে বর্তমান শিক্ষানীতি নিয়ে বিরাজমান অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ

ক) শিক্ষা জাতীয় ঐক্যমত উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে;

খ) জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

গ) শিক্ষিত যুবকদের মাঝে উচ্চ বেকারত্ব হার এবং

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক মান নিচু [৫০]

বিদ্যমান শিক্ষানীতির উপর অসন্তুষ্টির একটি কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক মান দূর্বল এবং তা বছরের পর বছর ধরে নিম্নগামী হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না দেওয়া। তবে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বল মানের জন্য এটি একমাত্র এমনকি বড় কারণ নয়। সবচেয়ে বড় কারণ হলো

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত ও বুর্জোয়া প্রশাসন যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষণাকর্মীদের পূর্ণ মেধা ও সামর্থকে যথোপযুক্তভাবে বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ থাকাকেও কমিশন অপর একটি কারণ বলে মনে করে।[৫১] কমিশন আরও মনে করে গত বিশ বছরে পাকিস্তান শিক্ষানীতি প্রণয়নে কোন জাতীয় ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তানে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়। এক শ্রেণী তাদের দৈনন্দিন কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করছে এবং অন্য একটি শ্রেণী ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেনি। স্বচ্ছল এবং দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একই নিয়ম চালু করা হয়নি।[৫২]

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা এবং এই প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কমিশনের সুপারিশ

১. ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা

কমিশনের মতে, পাকিস্তানে চলমান দু'টি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি বৃটিশদের দ্বারা উন্নীত যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারি চাকুরিতে কেরানি ও অফিসার তৈরি করা। অন্যটি ছিল গোঁড়া (Orthodox) ধর্মীয়। এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কমিশন মনে করে পাকিস্তানে থাকবে আদর্শের ঐক্য এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থা অখন্ড শিক্ষাব্যাবস্থা যা সাধারণ এক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের (Common set of Cultural Values) জন্ম দেবে, সেই সাথে এটি ইসলামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাপক অর্থে ইসলামিয়াতকে বাধ্যতামূলক করা হবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এবং এর পরবর্তী ধাপে এটি হবে ঐচ্ছিক। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামিক গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এবং এই গবেষণায় আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। মাদ্রাসাগুলোতে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহের উপর শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও আধুনিক শিক্ষার মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে ধরণের চাকরি করতে পারে মাদ্রাসায় শিক্ষিতরাও এই ধরণের চাকরির সুযোগ পায়। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও তা কার্যকর করার জন্য আইন পাস করে। পশ্চিম পাকিস্তানেও এটি করতে হবে। কমিশন মনে করে ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাপক মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, তাই নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণের কথা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা

কমিশনের মতে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত দেশের প্রশাসনের ভাষা ইংরেজি। অন্যদিকে জনসাধারণের ভাষা ভিন্ন। ফলে প্রশাসন জনগণের চাওয়া-পাওয়ার (Popular aspirations) ব্যাপারে উদাসীন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা শুধু শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধানই চিরস্থায়ী করেনি, বরং স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসা শিশুদেরও ক্ষতি করছে। সেই সঙ্গে মানব সম্পদের অপচয় হয়েছে। জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলে এই ক্ষতি হতোনা। কমিশন আরও মনে করেন, ভাষার প্রতিবন্ধকতা শুধুমাত্র শিক্ষানীতি দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। যতদিন সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি থাকবে এবং নেতৃবৃন্দ প্রাত্যহিক জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করবে ততদিন ভাষার প্রতিবন্ধকতা থাকবে। সরকার ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে জাতীয় ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা ঘোষণা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে।

৩. সুবিধাভোগীদের বাধা

কমিশন চিহ্নিত করে যে, দেশে প্রচলিত শিক্ষা নীতির ফলে দেশে দু'টি সুস্পষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এবং এদের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। তাই এগুলোর নিরসনের ব্যবস্থা না করলে সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এগুলো হলো-

ক. **শিক্ষার মাধ্যমঃ** উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির দাবি, যেসব শিক্ষার্থীর পিতামাতা ইংরেজি জানে না তাদের সাথে বিভেদ সৃষ্টি করবে।

খ. **ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদিঃ** কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের শিক্ষার মান সাধারণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উন্নত। এদের কিছু সরকারি এবং কিছু ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত। সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত এবং যাদের আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা নেই তাদের পূর্ণ বৃত্তি প্রদান করতে হবে। একইভাবে সকল ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়ে যেখানে ৩০ রুপির বেশি বেতন নেওয়া হয় প্রতিমাসে সেসব বিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করতে হবে এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

গ. **ভৌগলিকভাবে বিরাজমান অসমতা দূরীকরণঃ** শিক্ষার সুযোগ সারা দেশে সমান নয়। দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে যেমন, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল। তাই এসব এলাকার জনসাধারণ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব এলাকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (Elementary School) শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। নবম ও দশম শ্রেণী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (High School) শিক্ষার সুপারিশ করে কমিশন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৩-৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদ (Governing body) থাকবে। এই ৫ জন সদস্যের অন্তত: ২ জন হবেন বিদ্যালয়ে কর্মরত। এই পরিষদের বিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ এবং অনুমোদিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমূলক হবে। কমিশন বলেন, প্রতি জেলায় গড়ে ১০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭৫টি মিডল ও ৭৫টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে যার নিবন্ধন সংখ্যা প্রায় ১৭৫০০০ জন। ১৯৮০ সাল নাগাদ প্রতি জেলায় গড়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০০০০০ জন। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে ৬৭০০০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হবে ৬৩০০০টি যার নিবন্ধন সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৫.৬ মিলিয়ন এবং ১১.২ মিলিয়ন। কমিশন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক বলে মনে করে। এই উদ্দেশ্যে জেলা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্বায়ত্তশাসনের ন্যায় কাজ করার অধিকার দিতে হবে। তাদের কাজ হবে

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা,

২. সকল বিদ্যালয়ের প্রশাসন,পরিচালনা যা বর্তমানে সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

৩. সকল বেসরকারি বিদ্যালয়ের অনুদান অনুমোদন এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দান।

৪. প্রধান শিক্ষক নিয়োগ।

৫. জেলা শিক্ষা তহবিল খাতে সকল ফিস, সরকারি অনুদান জমা করা।

৬. সকল কর্তৃপক্ষের পরিদর্শক দল শিক্ষকদের দিক নির্দেশনা ও উপদেশ দান করবে এবং কারিগরী ও অন্যান্য প্রাথমিক সমস্যার সামাধান করবে। পরিদর্শকগণ শিক্ষার্থীদের ৮ম শ্রেণী থেকে জাতীয় যোগ্যতা যাচাই (National Aptitued Test) পরিচালনা করবে। এই কর্তৃপক্ষ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে। যেমন-চেয়ারম্যানসহ এক বা একাধিক সদস্য প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং দুইজন সদস্য প্রধান শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। জেলা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা কমিটি থাকবে যা জেলার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে। শিক্ষক, অভিভাবকদের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং তাদের কাজ হবে জেলা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।

৭. প্রাদেশিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক অধিদপ্তর থাকবে এবং এই অধিদপ্তরের প্রধান হবেন মহাপরিচালক। এছাড়াও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন বিভাগ থাকবে এবং তাদের দায়িত্ব হবে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় শিক্ষার মহাপরিচালকের নিকট জবাবদিহি করা। বিদ্যালয় পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাগণ সরাসরি বিদ্যালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। তারা মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে জেলা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রদান করবেন।[৫৪]

১৯৬৯ সালে গঠিত নূর খান কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণে যে সুপারিশ করে তা ছিল পূর্বে কমিশনসমূহের তুলনায় অনেকটা অগ্রসরমান। এর নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন সংক্রান্ত যে সুপারিশ ছিল তা গ্রহণযোগ্য মনে হয় তবে এই কমিশনে অনেক ভাল কথা থাকলেও ঊনসত্তর সালের চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এই কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হয়নি। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে শাসকের প্রতি যখন জনগণের কোন আস্থা থাকে না তখন সেই শাসক যতই দূরদর্শী নতুন বিধি প্রণয়ন করুন না কেন জনগণ সহজে তা মেনে নিতে পারে না।

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থী নিবন্ধন, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো ।[৫৫]

সারণি-৪৭

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট নিবন্ধন	মোট শিক্ষক	বাৎসরিক ব্যয়	
				মোট রুপি	সরকার কর্তৃক রুপি
১৯৪৭-৪৮	২৯,৬৩৩	২৬,৬১,৫৪৭	৭৫,৬২৬	১,৭৩,০০,৫৪৪	৭৭,৪৪,২৪২
১৯৪৮-'৪৯	২৮,৯৭৭	২৭,০৩,৩৬৯	৭০,৪০৩	১,৭১,১৫,৭৭২	৯৫,৬৮,১৭৬
১৯৪৯-'৫০	২৬,০৮৯	২৪,৯১,৬৫৬	৬৬,৮১৪	১,৬৭,৬৭,২৬৯	১,০১,৪৬,০৭৯
১৯৫০-'৫১	২৬,৩৫২	২৪,৪৯,৪৩৬	৬৪,৮১৫	১,৬৫,৮৩,১২৮	৯৭,১২,৬৮০
১৯৫১-'৫২	২৬,১৫৩	২৪,৭৪,৯১৭	৬১,৯৫৪	১,৮৫,৩০,৩৭৫	১,২৫,৯১,২১৭
১৯৫২-'৫৩	২৬,২৬০	২৬,৫৫,২৬৫	৬৭,০৮৮	২,২৫,৩৭,২৬২	১,৫৯,৮৯,০০২
১৯৫৩-'৫৪	২৬,২২৭	২৬,৫২,৭২৭	৭১,৮৮৮	২,৩৫,৩০,৪১২	১,৬৫,১১,১৬৯
১৯৫৪-'৫৫	২৬,০০০	২৬,০৪,৭৩৫	৭১,৪৭৭	২,৪৫,৬১,১২৩	১,৮১,৭৮,৭৩৩
১৯৫৫-'৫৬	২৬,২২০	২৬,৪৬,৯৫৫	৭১,৯৭৪	২,৫৮,৬৫,০০৯	১,৮৯,৪০,৭৩৭
১৯৫৬-'৫৭	২৬,২৮১	২৭,১১,৭৭০	৭১,৭১৮	২,৫৬,৬৬,৩৯৩	১,৮৩,৭৬,২০০
১৯৫৭-'৫৮	২৬,৫৭৯	২৭,৯৪,৯১৫	৭৪,৭২৫	৩,০৩,৯১,৬৭২	২,৯২,৫৭,৯৪১
১৯৫৮- '৫৯	২৬,৬৮৮	২৯,৮৫,২৫৮	৭,৭১,২৩	৪,৫৮,৪০,৩৮৯	৪,৪২,৫৬,৪৩১
১৯৫৯-'৬০	২৬,৫৮৩	৩১,৮০,৩৬৭	৭৮,৪৬২	৩,৬৮,৪৭,৭৮১	৩,৫৩,৩১,১৬৭
১৯৬০-'৬১	২৬,৬৬৫	৩৩,৩০,৫৮২	৮০,৫২৪	৩,৮৭,৬৭,৭৫৫	৩,৭৪,২২,৬৭৭
১৯৬১-'৬২	২৬,৭৪৭	৩৪,৩৪,২৮৪	৮২,৪৭৭	৩,৮৮,২৫,০৮৬	৩,৭৪,৪৩,০৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২-'৬৩	২৭,১৫৪	৩৬,৩৬,৬৩৭	৮৬,৬৩৫	৪,৮১,৩৪,৫৭৩	৪,৬৫,৯১,৪৫৪
১৯৬৩-'৬৪	২৭,৫৬২	৩৭,৫২,৩২২	৯২,৪৯৪	৫,৫২,৫২,৫১০	৫,৩১,৯৮,২০৯
১৯৬৪-'৬৫	২৭,৬৪৯	৪০,৪৪,১৭৯	৯৪,১৩৪	৫,৯০,৭৪,৩১৩	৫,৬৮,২৮৮৬৮
১৯৬৫-'৬৬	২৮,০৪২	৪১,৭৫,৩৩৩	৯৫,৬৯৫	৭,৭২,৩৯,৩৪৭	৭,৩৭,৭৬,০৩৭
১৯৬৬-'৬৭	২৮,২২৫	৪৪,৩৫,১৭২	৯৯,৩৬২	৮,৯২,৫০,৬১৩	৮,৫৪,৯৩,৮৪৪
১৯৬৭-'৬৮	২৮,৪৮৯	৫০,৩৭,১৩৮	১,০৬,৮০৫	১০,১৫,৩১,৭৪৪	৮,৮৫,০৪,৫২১
১৯৬৮-'৬৯	২৮,৯০৮	৫৫,০০,০০০	১,১০,০০০	১০,৪০,০০,০০০	৯,০০,০০,০০০
১৯৬৯-'৭০	২৯,৩০০	৫৬,০০,০০০	১,১৪,০০০	১০,৭০,০০,০০০	৯,২০,০০,০০০

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি। প্রায় সিকি শতাব্দী পর এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯,৩০০ টিতে। বিভিন্ন বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সময়ের সমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষার্থী নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণের বেশি। একই সাথে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরও অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। এছাড়াও ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক, সর্বজনীন ও অবৈতনিক করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পাকিস্তান শাসনের পুরো সময় ধরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি উপযোগী করে গড়ে তোলা। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মানের তেমন উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (Dr. Robert M. Hutchins) ড. রবার্ট এম. হুচিন বলেন, " Civilization can be served only by a moral, intellectual and spiritual revolution to match the scientific, technological and economic revoluton in which we are now living. If education contribute to a moral intelletual and spiritual revolution, them it offers a real hope of salvation to suffering humanity everywhere. If it cannot or will not contrubute to this revolution than it is irrelevant and its fate is immaterial"[৫৬] তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে শিক্ষা ছাত্রদের মনে তারুণ্য সৃষ্টি করবে যারা দেশে বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হবে। তারা হবে দেশের জন্য ইতিবাচক গণতান্ত্রিক নাগরিক। তারা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মাধ্যমে পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠবে এবং তারা হবে দেশের আদর্শ নাগরিক। কিন্তু দেশে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী সে পরিবর্তনের দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র ইসলামি আদর্শকেই বড় করে দেখেছেন। ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে মি. ফজুলর রহমান ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার সমালোচনা করে বলেন " Our existing educational system, as originally conceivede by Macaulay, was intended to serve a narrow, utilitarian purpose and its growth has been largely a matter of artificial improveisation. It has rightly been condemn for its lack or realism and its inability to adjust itself to the needs of a rapidly changing society its over literary bias and its utteirly uninspiring, soulless character. It has no common faith or a common body of principle to animate it and has conspicuously faild to inculcate and maintain the stern moral and intellcetual discipline which is the hall-mark of true education. Thus its production with their minds crammed with an unassimilated mass of unrelated ideas and facts possing for knowledge, have gone out into the world only to discover that they are unifitted for the business of living. " [৫৭]

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ছিল। সিন্ধু প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল ছিল চার বৎসর। পূর্ব বাংলায় ১৯৫১ সালে চার বৎসর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা পরিবর্তন করে পাঁচ বৎসর করা হয়। এন.ডব্লিউ. এফ.পি. বেলুচিস্তান এবং পাঞ্জাবে ছিল ৫ বৎসর। মাধ্যমিক শিক্ষা সিন্ধুতে ৭ বৎসর পূর্ব বাংলায় ৬ বৎসর। এন.ডব্লিউ. এফ.পি. ও বেলুিচিস্তানে ও পাঞ্জাবে ৫ বৎসর মেয়াদী ছিল। অর্থাৎ স্কুল কোর্স সম্পন্ন করতে সিন্ধু প্রদেশের প্রয়োজন হতো ১১ বৎসর অন্যদিকে পূর্ব বাংলা এন.ডব্লিউ. এফ.পি, বেলুচিস্তান এবং পাঞ্জাবের জন্য ১০ বৎসর। [৫৮]

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাকে জুনিয়র এবং সিনিয়র এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়। জুনিয়র পর্যায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং সিনিয়র পর্যায় ৯ম ও ১০ম শ্রেণী নিয়ে গঠিত। [৫৯] পূর্বের ভার্নাকুলার মিডল স্কুল এবং মিডল ইংলিশ স্কুলের মধ্যে ব্যবধান কমতে থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় একটি বড় সমস্যা ছিল ভাষা সংক্রান্ত। প্রাথমিক, মিডল এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা অন্যদিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। দেশের ইতিহাস, সাহিত্য এবং দেশের বড় বড় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সবই মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখা, ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

আবার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ শেষে উচ্চ শিক্ষায় তাদের ভাষা সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ, স্কুলগৃহ নির্মাণ করে অতিরিক্ত ছাত্রের শিক্ষার সুযোগ দান, শিক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ, পাঠ্যসূচীতে আধুনিকীকরণের মতো বিষয়গুলির প্রতি যেখানে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা সবসময় এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপরন্তু পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার। নিম্নের সারণিতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো[৬০]

সারণি-৪৮

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১. লোয়ার মিডল স্কুল ক) ছেলেদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	 ৩০৬৭টি ৩০৮৮৭৪ জন	 ২৭৫৬টি ২৭৮৬৫০জন	 ৩১১টি ৩০২২৪জন
খ) মেয়েদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	২৯৯টি ১৭৭২৪জন	২৭৯টি ১৫৮৩৪জন	২০টি ১৮৯০জন
২. আপার মিডল স্কুল ক) ছেলেদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	 ৯১২টি ১৮২৪৯৯জন	 পূর্ব বাংলায় এই ধরণের কোস স্কুল ছিল না। -	 ৯১২টি ১৮২৪৯৯জন
খ) মেয়েদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	১৭৭টি ৩৪১৪৯জন	- -	১৭৭টি ৩৪১৪৯জন
৩. হাইস্কুল ক) ছেলেদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	 ১৮৬৩টি ৫৭৫০৩২ জন	 ১৪২৭ টি ৩১৬৯৪০জন একটি হাই মাদ্রাসার ছাত্রীসহ	৪৩৬টি ২৫৯০৯২জন, পাঞ্জাব প্রদেশের একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন ছাত্রী ছিল।
খ) মেয়েদের স্কুল শিক্ষার্থী নিবন্ধন	১৬৮টি ৪৫৮৬৪ জন	৬৬টি ১৪২৬০জন	১০২টি ৩১৬০৪ জন, পাঞ্জাব প্রদেশে ২০৫ জন ছাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ত।
মোট=	৬৪৮৬টি	৪৫২৮টি	১৯৫৮টি

উপরের তালিকায় দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান অনেক এগিয়ে ছিল। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কৌশলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানোন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবক্ষেত্রে এই মানোন্নয়নের চিত্রটিও ছিল ভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৫১-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৭ পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় তা দেখানো হলো। [৬১]

সারণি-৪৯

বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫১-৫৩ ক) বালকদের জন্য মোট ধারণ ক্ষমতা (Total capacity)	১৫৫টি ৫৪৫৫০ জন (মিডল ও হাইস্কুলসহ)	১টি ৫০০জন	১৫৪টি ৫৪০৫০ জন
খ) মেয়েদের জন্য মোট ধারণ ক্ষমতা	৭৯টি ২০৭৩০ জন	১টি ৫০০জন	৭৮টি ২০২৩০ জন
১৯৫৩-৫৭ ক) বালকদের জন্য মোট ধারণ ক্ষমতা (Total capacity)	৩২৪টি ১১৬৩০০ জন	পূর্ব পাকিস্তানে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। -	৩২৪টি ১১৬৩০০ জন
খ) মেয়েদের জন্য মোট ধারণ ক্ষমতা	১৬৩টি ৪৬০২০ জন	মেয়েদের জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। -	১৬৩টি ৪৬০২০ জন
মোট	৭২১টি	০২ টি	৭১৯ টি

১৯৫১-৫৭ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৭১৯টি। উক্ত সময়ে সরকারি ব্যয়ের যে ব্যবধান ছিল তার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার উন্নয়নের কোন সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিচের সারণিতে ১৯৫১-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যয়ের চিত্র দেখান হলো : [৬২]

সারণি-৫০

১৯৫১-৫৩	পূর্ব পাকিস্তান (রুপি)	পশ্চিম পাকিস্তান (রুপি)	মোট ব্যয়(রুপি)
রিকারিং	কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না	৭৬০৩৭৫২	৭৬০৩৭৫২
নন- রিকারিং	৮১৫০০০০	৪৫৫৪৫৫৯২	৫৩৬৯৫৫৯
১৯৫৩-৫৭	-	-	-
রিকারিং	৭২৯০০০০	৪২৬৪৮৫৫৯	৪৯৯৩৮৫৫৯
নন- রিকারিং	২৪০৪০০০০	৯৩৭৪৭৮৮৫	১১৭৭৮৭৮৮৫

উপরের চিত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি উদাসীনতা কতটা প্রকট ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৫৯) ও মাধ্যমিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাকমিশন তার প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার দূর্বলতার দিকগুলির আলোচনা এবং তা সমাধানের সুপারিশ করে। কমিশন মনে করে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান দূর্বলতা হলো কারিগরি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিষয়ে ট্রেনিং দানের পূর্ণ সুযোগের অনুপস্থিতি এবং উহার অপরিবর্তনধর্মিতা ও বহুমুখীতার অভাব। এগুলি সামাজিক প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আগ্রহের সহিতোসামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামে মানসিক দক্ষতা বিশেষ করে সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শারীরিক সুস্থ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন এবং হাতের কাজের দক্ষতা বিকাশের সামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্লাশরুমে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী, উপযুক্ত ট্রেনিং এর অভাব, স্বল্প বেতন এবং সমাজে যৎসামান্য মর্যাদার কারণে যোগ্যব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট হয় না। তাই কমিশন সুপারিশ করে যে, সকল নাগরিকের মনে একটি জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য নতুন জাতি হিসেবে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং ইসলামিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে পাকিস্তানিজাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন করতে হবে। সৎ প্রতিবেশী, সৎ নাগরিক ও প্রকৃত দেশপ্রেমিকের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার জন্য বিদ্যালয় ভূমিকা পালন করবে। স্কুলে বালক-বালিকাদের মধ্যে জাতির ইতিহাস আশা-আকাঙ্খা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভিত্তিতে দেশ সেবার আকাঙ্খা ও দেশ প্রেম জাগ্রত করা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের কোর্স ও কাঠামোর পূনর্গঠন এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ও এমনসব সুযোগ সুবিধার বিধান করা যাতে কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত বর্তমান বিষয়গুলি যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়। ইহা ছাড়াও শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কারসাধন, বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অভ্যাস, দূর্নীতি ও শৃংখলার ক্ষেত্রে শিথিলতা বর্জন প্রভৃতির জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।[৬৩]

মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বিভিন্ন পর্যায়

প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় ও মেয়াদ নিম্নরূপ:[৬৪]

সারণি-৫১

পর্যায়	মেয়াদ
প্রাথমিক	৫ বৎসর
মাধ্যমিক	৩ বৎসর
উচ্চ মাধ্যমিক	২ বৎসর
ইন্টারমিডিয়েট	২ বৎসর
প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশে-	
প্রাথমিক	৪ বৎসর
উচ্চ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক	৩ বৎসর
উচ্চ বিদ্যালয়	৪ বৎসর
ইন্টারমিডিয়েট	২ বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার এবং মাধ্যমিক স্কুলের তিন বৎসর কাল (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী) অধ্যয়নকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করে।

পাঠ্যক্রম

কমিশন ঐতিহাসিক কারণে প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামগুলিকে প্রধানত তথ্যমূলক ও পুঁথিকেন্দ্রিক যা কিশোর-কিশোরীদের সকল প্রকার প্রবণতা বা সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করে। তাই কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিকুলামকে দুই মৌলিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলে। প্রথমত দ্রুত উন্নয়নশীল সমাজে উপযুক্ত ও সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে সব বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত কারিকুলামে এমন সব অতিরিক্ত বিষয় ও ট্রেনিং এর বিধান থাকবে যার মাধ্যমে বৃত্তি ও জীবিকা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় মৌলিক বিষয়গুলি ছাড়াও কতকগুলি ঐচ্ছিক বিষয় বিশেষ করে ব্যবহারিক ও শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বহু সংখ্যক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। মধ্য পর্যায়ের কতিপয় বিষয়কে একত্রিত করে একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষাদানের জন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা শিক্ষাদানের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক প্রকৃতিকে সাধারণ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির দৈনন্দিন পরিচিত সমস্যার সহিতোসংশ্লিষ্ট শিক্ষা হিসেবে দলবদ্ধ করার কথা বলেন অনুরূপভাবে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞানকে সাধারণভাবে একত্রিত করে এই পর্যায়ে উহাকে 'সমাজবিদ্যা' শিরোনামে শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে কমিশন মনে করে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয় সোভিয়েত রাশিয়ায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত মোট সময়ের ৪৫ ভাগ ব্যয় করা হয় বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যাপারে। তাই কমিশনের সুপারিশ ছিল সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়, সমাজ সম্পর্কিত বিদ্যা ও কারিকুলামে অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্র শিক্ষাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অংকশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। নবম ও দশম শ্রেণীতে দুটি পর্যায় থাকা দরকার সাধারণ অংকশাস্ত্র যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক এবং উচ্চতর অংকশাস্ত্র যারা বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান লাভে ইচ্ছুকদের জন্য সীমিত থাকবে। সাধারণ বিজ্ঞান ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হবে। মধ্যপর্যায়ে সাধারণ হস্তচালিত সাধারণ ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষাদান বাধ্যতামলূক হওয়া উচিত। কাঠ, কাঠবোর্ড, বেত-চামড়া, সাধারণ বিদ্যুৎ ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণাদি দিয়ে নানা প্রকার দ্রব্যের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা উচিত। বালিকাদের বিদ্যালয়গুলিতে গার্হস্থ্য কারুশিল্প সূচের কাজ, সূচী শিল্প ও অন্যান্য উপযুক্ত শিল্প সম্পদ হাতের কাজ সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক আর্টস বা কলা প্রবর্তনের ব্যাপারে নবম থেকে দশম শ্রেণীর জন্য ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ হবে

ক) ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা অপর কোন কনস্ট্রাকশন কোর্স গ্রহণে ইচ্ছুক বিশেষ আগ্রহী ছাত্রদের জন্য মেটাল ওয়ার্ক, উডওয়ার্ক ও ইলেকট্রিসিটিতে ওয়ার্কশপ কোর্স;

খ) কৃষিবিদ্যায় উৎসাহী ছাত্রদের জন্য কৃষি শিল্পসহ কৃষি কোর্স;

গ) কেরানি পর্যায়ের জীবিকা গ্রহণেচ্ছুকদের জন্য শর্টহ্যান্ড ব্যতীত কমার্শিয়াল কোর্স;

ঘ) বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থশাস্ত্র;

ঙ) বালক ও বালিকাদের জন্য কলা, শিল্পকলা ও অলংকার শিল্প কোর্স ;

এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যথাযথ ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ কারিগরী কোর্সের পুরাপুরি ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৬৫]

ভাষা

কমিশন মনে করে পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুভাষা শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় বিধায় মধ্যপর্যায়ের বিদ্যালয়ে উর্দু ভাষার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করে উচ্চতর ক্লাসসমুহে তা হ্রাস করা উচিত এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একই ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়। ইংরেজি ভাষা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ সকল পেশার এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাই জাতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক সময় বরাদ্দ করা উচিত। ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আরবিও ফার্সী ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও পাকিস্তানের উভয় অংশের অন্ততপক্ষে কতিপয় মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজি, আরবি, ফার্সী ছাড়াও ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান ও চীনা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রকে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞানসহ সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদান করতে হবে। এসব বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলি ছাড়াও সকল ছাত্রকে উপযুক্ত ধরণের শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে বলে কমিশন মন্তব্য করে।[৬৬]

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ

পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও নবম দশম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে মাধ্যমিক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হলেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের শিক্ষা বোর্ডের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাই কমিশন নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা মাধ্যমিক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন মনে করে বোর্ডের আওতা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনুরূপ হওয়া উচিত। পেশোয়ার, হায়দ্রাবাদ ও রাজশাহীতে নতুন বোর্ড গঠন এবং করাচী ও ঢাকাস্থ বোর্ডের আওতা সম্প্রসারণপূর্বক উচ্চ মাধ্যমিক (ইন্টারমিডিয়েট) স্তরের শিক্ষা উহাদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নের দায়িত্ব মাধ্যমিক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা উচিত। স্কুলের মঞ্জুরি প্রদান, শিক্ষণীয় বিষয় ও পাঠ্যক্রম নিরূপণ, শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ হবে বোর্ডের করণীয়। চেয়ারম্যানসহ দশ হতে বারজন সদস্য সমবায়ে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে বোর্ড গঠিত হবে। চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবে। বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাদপ্তর, স্কুল কলেজের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী দুই একজন প্রতিনিধি থাকা উচিত। মাধ্যমিক বোর্ডের সর্বশেষ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ কর্তার উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তাঁর মর্যাদা ও অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সলরের অনুরূপ হবে। প্রাদেশিক গভর্নর এবং ফেডারেল এলাকার ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী হবেন সেই নিয়ন্ত্রণ কর্তা কর্তৃক তৎনির্ধারিত শর্তাধীনে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রাপ্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করে শতকরা ৬০ ভাগ, পারিচালক মন্ডলীর চাঁদা ২০ ভাগ ও সরকারি সাহায্য ২০ ভাগ করার সুপারিশ করে কমিশন। তবে পশ্চাদপদ এলাকায় এই শিক্ষা ব্যয় পূর্বের মতই থাকবে।[৬৭]

মুল্যায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কমিশন ব্যাপক কোন পরিবর্তনের কথা বলেননি। শিক্ষার এই পর্যায়েও কমিশন ইসলামিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছে। পাঠ্যসূচীতে নতুন কিছু সংযোজন না করে কারিগরী শিক্ষাকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চেয়ে শিল্প সংক্রান্ত ও হাতের কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক ভাষা ছাড়াও ইংরেজি বাধ্যতামূলক এবং আরবি, ফার্সীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জার্মান, রাশিয়ান ও চীনা ভাষা শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে, যেটা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা যেমন ছাত্রদের জন্য অধিক সময় সাপেক্ষ তেমনি এই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রীর উপর। সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতার অধিকারী অথচ আর্থিক বিষয়টির ক্ষেত্রে সরকার মাত্র ২০ ভাগ দায়িত্ব বহন করবে বলে কমিশন সুপারিশ করে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ কোন সচ্ছল পরিবারে থেকে আসে না, তার উপর স্কুলের বেতন বৃদ্ধি তাদের শিক্ষাকে নিরুৎসাহিতোকরে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। এখানে ঝরে পড়ার হারও অত্যন্ত বেশি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনামূল আলোচনা

পূর্ব পাকিস্তান

মিডল স্কুল: পূর্ব পাকিস্তানে তিন ধরণের মিডল স্কুল ছিল যথা-মিডল ইংলিশ স্কুল, মিডল ভার্নাকুলার স্কুল এবং জুনিয়র স্কুল। এই তিন ধরণের স্কুল নিয়ে মধ্য পর্যায় বা মিডল স্টেজ শিক্ষা। ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৪২টি জুনিয়র হাইস্কুল সহ মোট মিডল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩২৪টি। পূর্ববর্তী বছরে ৪৩৫টি জুনিয়র হাইস্কুলসহ মিডল স্কুল ছিল ১৩৭০টি। একটি শ্রেণী নিয়ে মিডল স্কুল পরিচালিত হওয়ার কারণে অনেক মিডল স্কুল জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে মিডল স্কুলের ৫২৬৯৮ জন শিক্ষার্থীসহ জুনিয়র হাইস্কুলে ৯৩৫১২ জন শিক্ষার্থী ছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল জুনিয়র স্কুলের ৪৩৬৫১সহ মোট ৮৭২৮৩জন। উল্লেখ্য এই সময়ে স্কুলে সংখ্যা হ্রাস পেলেও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৮৭৬ জনসহ মোট শিক্ষক ছিলেন ৫২২৮ জন যা পূর্বের বছরে ছিল ৯৩১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসহ মোট ৫১৫৩ জন। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ছিল মিডল ইংলিশ স্কুলে মান বৃদ্ধিকরণ (Upgrading)। এই স্কুলগুলির প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত ব্যয় ছিল ১০২১৯২৮/- রুপিসহ মোট ৫১৪০৫৭৩/- রুপি যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত ১৬৪২৬২১/-সহ ৫৩,৮৯,৯০৪/- রুপি। পূর্বের বছরের তুলনায় প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে ব্যয় হ্রাস করা হয়।[৬৮]

নিম্নের ১৫, ১৬ ও ১৭নং সারণিতে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৯-৬০ সময়কালে মিডল স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেওরা হলো [৬৯]

সারণি-৫২

	১৯৫৯-৬০		১৯৫৮-৫৯	
	জুনিয়র স্কুল	মিডল স্কুল	জুনিয়র স্কুল	মিডল স্কুল
স্কুলের সংখ্যা	৫৪২	৭৮২	৪৩৫	৯৩৫
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫২৬৯৮	৪০৮১৪	৪৩৬৫১	৪৩৬৩২
মোট খরচ (রুপি)	৩০০২৫৩৭	২১৩৮০৩৬	২৪৮০৮৬২	২৯০৯০৪২

নিম্নের সারণিতে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৯-৬০ সময়ে জুনিয়র ও মিডল স্কুলের শিক্ষকদের সংখ্যা দেখান হলো

সারণি-৫৩

স্কুলের ধরণ	বছর	পুরুষ		মহিলা		মোট
		প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	প্রশিক্ষণ ব্যতীত	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	প্রশিক্ষণ ব্যতীত	
জুনিয়র স্কুল	১৯৫৯-৬০	৩৯৯	২০৮৭	৩২	১২১	২৬৩৯
	১৯৫৮-৫৯	৩৭৪	১৭১৯	২৫	৯৯	২২১৭
মিডল স্কুল	১৯৫৯-৬০	২৮৪	২০০৯	৬১	২৩৫	২৫৮৯
	১৯৫৮-৫৯	৪৭৩	২১৯৪	৫৯	২১০	২৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৯-৬০ সময়ে জুনিয়র ও মিডল স্কুলের ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হলো :

সারণি-৫৪

উৎস	১৯৫৯-৬০				১৯৫৮-৫৯			
	জুনিয়র স্কুল		মিডল স্কুল		জুনিয়র স্কুল		মিডল স্কুল	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
সরকার	৫১৬৫০৬	১৫৯৪৫০	৩৫৬৮৭৪	২৮৯০৯৮	৫২০৪৮৬	১০৯৩১৭	৬২৬৩৯৬	৩৯৬৪২২
জেলা তহবিল	৫৬৮৬৮	৫০১৯	১১৪০৭৫	১৩৪৭৫	৫২৮৯৪	১৬৮৭	১৬৭৯০৩	১৯৯৮৩
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	১২৩০	৩৪৬৫	১৩৫০৪	২১৪০	৫০০	৩০২৩	৩২৬৬	৩৭৩৬
ফিস	১২৮৮৯৫৬	৯২৯৪৭	৫৩৫০৩৫	১৭৪৪৩২	১০৯৫১০৯	৫৭৪৯২	৭৩৪২৪৬	১৯৬৭৬৬
অন্যান্য	৭২১৬৭২	১৫৬৪২৪	৪০০৯৪২	২৩৮৪৪৩	৫৪০৬২৮	৯৯৭২৬	৫২০৮২২	২৪৯৫০২
মোট	২৫৮৫২৩২	৪১৭৩০৫	১৪২০৪৪৮	৭১৭৫৮৮	২২০৯৬১৭	২৭১২৪৫	২০৫২৬৩৩	৮৬৫৪০৯

উল্লেখ্য মধ্যপর্যায়ের শিক্ষা, শিক্ষা বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা যৌথভাবে শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পূর্ব পাকস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং উভয় বিভাগই ছিল শিক্ষা বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে। ১৯৫৯-৬০ সালে ৩৮টি সরকারি স্কুলসহ মোট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭২৯টি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮টি সরকারি স্কুলসহ মোট ১৬৯১টি। ৩৮টি জুনিয়র স্কুলকে পূর্ণ হাইস্কুলে উন্নীত করার কারণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৩১৬১ জন ছাত্রীসহ মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩৬৯৭৩ জন যা পূর্ববতী বছরে ছিল ৪০৪১৪ জন ছাত্রীসহ মোট শিক্ষার্থী ৪০৭৭৫২ জন। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৯২২১ জন। এই সময়ে ৩৬৩২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক ছিলেন ১৮৩৪৩ জন যা পূর্ববতী বৎসরে ছিল ৩২৩২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক ছিলেন ১৬৮৯০ জন। [৭০]

নিম্নের সারণিতে ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন উৎস থেকে পরিচালনা ব্যয় এর চিত্র দেখান হলো : [৭১]

সারণি-৫৫

উৎস	ছেলেদের স্কুলের সংখ্যা		মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা	
	১৯৫৯-৬০	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৫৮-৫৯
সরকার	৩০	৩০	৮	৭
জেলা তহবিল	-	-	-	-
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	১	১	১	১

Dhaka University Institutional Repository

অনুদান প্রাপ্ত	১১৭২	১১৯৪	৮০	৭৫
অনুদান বিহীন	৪৩১	৩৭৭	৬	৬
মোট	১৬৩৪	১৬০২	৯৫	৮৯

সারণি-৫৬

উৎস	উচ্চ বিদ্যালয় ছেলেদেও	উচ্চ বিদ্যালয় মেয়েদের	উচ্চ বিদ্যালয় ছেলেদের	উচ্চ বিদ্যালয় মেয়েদের
	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৫৮	১৯৫৯
প্রদেশিক রাজস্ব	৭০৪৮০১৫ /-Rs	১০৫৮৩৩৭/- Rs	৭৯২০১৫০/- Rs	১২৫৩১৮১/- Rs
জেলা তহবিল	৩৭১৬৮/-	১৫৮৫/-	৭৮৬৫/-	৭৮৬০/-
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	৭২৯৫/-	১৮৩৪৪/-	৫৭৩৩/-	১২৭৬৮/-
ফিস	১৪৭১৮৭৩৬/-	১১৬২৬৮৩/-	১৫৮৪৬১৫৬/-	১০০৮৪৬২/-
অন্যান্য	৪৫৩৪৪৩১/-	৫৫০৫৩১/-	৪১৮৩১২৮/-	৪০৭৯৭৫/-
মোট	২৬৩৪৫৬৪৫/-	২৭৯১৪৮০/-	২৭৯৬৩০৩২/-	২৬৯০২৪৬/-

১৯৫৯-৬০ সময়ে সরকারি ও অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন ছিল নিম্নরূপ: [৭২]

১. নবম ও দশম শ্রেণী- ৫/- রুপি প্রতিমাসে

২. সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী- ৪/- রুপি প্রতিমাসে

৩. পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী- ৩/- রুপি প্রতিমাসে

৪. তৃতীয় এবং ৪র্থ শ্রেণী- ৩/- রুপি প্রতিমাসে

১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষা:

পশ্চিম পাকিস্তানে মিডল স্কুল ও হাইস্কুল, মিডল স্কুল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গঠিত। পশ্চিম পাকিস্তানে তিন ধরণের স্কুল ছিল সেগুলি হলো :

১. ভার্নাকুলার স্কুল

২. এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল

৩. ভার্নাকুলার স্কুল (ইংরেজি ঐচ্ছিকসহ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় মিডল স্কুল ও ৪ ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. সরকারি বিদ্যালয়

২. লোকাল বডি পরিচালিত (জেলা বোর্ড, পৌরকমিটি ইত্যাদি)

৩. সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়

৪. সরকারি সাহায্য বিহীন বেসরকারি বিদ্যালয়

পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৯-৬০ সালে মোট মিডল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৬৬টি।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের ২০ ও ২১ নং সারণিতে ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মোট মিডল স্কুলের সংখ্যা ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো :[৭৩]

সারণি-৫৭

	মোট	ছেলেদের	মেয়েদের
সরকারি মিডল স্কুল	৪৬৫	৪১৯	৪৬
লোকাল বডি	১৩৪৭	১১৮১	১৬৬
বেসরকারি	১৫৪	৪৬	৬৮
মোট	১৯৬৬	১৬৮৬	২৮০

সারণি-৫৮

	মোট	ছেলেদের	মেয়েদের
সরকারি তহবিল	১৪৬৯৪০০০/-	১৩২৭৭০০০/-	১৪১৭০০০/-
লোকাল বডি তহবিল	৫১৯৩০০০/-	৪১০৩০০০/-	১০৯০০০০/-
বিবিধ তহবিল (ফিস, দান, চাঁদা ইত্যাদি)	২৫৫২০০০/-	২১৮৭০০০/-	৩৬৫০০০/-
মোট	২২৪০৯০০০/-	১৯৫৬৭০০০/-	২৪৭২০০০/-

উপরের তালিকায় মোট মিডল স্কুলের শতকরা ৮৬ ভাগ ছেলেদের এবং ১৪ ভাগ মেয়েদের। মোট মিডল স্কুলের ২৪ ভাগ সরকারি এবং ৭৬ ভাগ যৌথভাবে লোকাল বডি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। ৪৬৫টি সরকারি মিডল স্কুলের মোট শিক্ষার্থী ছিল ৮৭৬৮২ জন, এদের মধ্যে ৭৯৩৪৫ জন ছাত্র এবং ৮৩৩৭ জন ছাত্রী। লোকাল বডি পরিচালিত মিডল স্কুলের শিক্ষার্থী ২৬৯৬৬৫ জন, এদের মধ্যে ২২৩৫৭৯ জন ছাত্র এবং ৪৬০৮৬ জন ছাত্রী। বেসরকারি মিডল স্কুলের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২৬৯৯ জন যার মধ্যে ১৭৩৯০ জন ছাত্রী। ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্র ছিল চারগুণ বেশি অর্থাৎ ছাত্র শতকরা ৮২ ভাগ এবং ছাত্রী শতকরা ১৮ ভাগ। সরকারি মিডল স্কুলে মোট শিক্ষক ছিলেন ৩৩৫২ জন, এদের মধ্যে ২৯৯০ জন পুরুষ শিক্ষক এবং ৩৬২ জন মহিলো। শিক্ষক। লোকাল বডির মিডল স্কুলের মোট শিক্ষক ছিলেন ৮৭৭০ জন এদের মধ্যে ৭৬৩৪ জন পুরুষ এবং ১১৩৬ জন মহিলো। শিক্ষক। বেসরকারি মিডল স্কুলের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৯০০ জন যার মধ্যে পুরুষ ৪৭২ জন ও মহিলো। শিক্ষক ৪২৮ জন। মিডল স্কুলের ব্যয়ের শতকরা ৬৬ ভাগ আসে সরকারি তহবিল থেকে এবং ৩৪ ভাগ আসে লোকাল বডি ও বিবিধ তহবিল থেকে।[৭৪]

হাইস্কুল

হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করত। পশ্চিম পাকিস্তানে শহরাঞ্চলে হাইস্কুল গঠিত ছিল ৫টি শ্রেণী নিয়ে যথা- ৬ষ্ট, ৭ম, ৮ম ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর সমন্বয়ে । গ্রামীণ অঞ্চলে হাইস্কুল গঠিত ছিল ১০টি শ্রেণী নিয়ে অর্থাৎ ১ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত। ১৯৫৯-৬০ সালে হাইস্কুল গণনার সময় গ্রামীণ বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত হাইস্কুল সংযুক্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মিডল স্কুলের ন্যায় হাইস্কুল ও চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল:

Dhaka University Institutional Repository

১. সরকারি

২. লোকাল বডি পরিচালিত (জেলা বোর্ড, পৌরসভা কমিটি ইত্যাদি)

৩. সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়

৪. সরকারি সাহায্য বিহীন বেসরকারি বিদ্যালয়

নিম্নের ২২ ও ২৩ নং সারণিতে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হলো : [৭৫]

সারণি-৫৯

	মোট বিদ্যালয়	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩৩	২৪৪	৮৯
লোকাল বডি	২৯৩	২৭৬	১৪
বেসরকারি	৩২০	২৬৫	৫৫
মোট	৯৪৬	৭৮৪	১৬২

সারণি-৬০

	মোট অর্থ	ছেলেদের জন্য	মেয়েদের জন্য
সরকারি তহবিল	১৪৯৯২০০০/-	১১৭৭৭০০০/-	৩২১৫০০০/-
লোকাল বডি তহবিল	৬১৩৯০০০/-	৫০৬২০০০/-	১০৭৭০০০/-
বিবিধ তহবিল	১০৭১০০০০/-	৯৫৪২০০০/-	১১৬৮০০০/-
মোট	৩১৮৪১০০০/-	২৬৩৮১০০০/-	৫৪৬০০০০/-

মোট হাইস্কুলের শতকরা ৮৩ ভাগ ছেলেদের এবং ১৭ ভাগ মেয়েদের। শতকরা ৩৫ ভাগ স্কুল পরিচালিত হয় সরকারিভাবে এবং ৬৫ ভাগ পরিচালিত হয় লোকাল বডি ও বেসরকারি সংস্থা দ্বারা। ১৯৫৯-৬০ সালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৫৭৬৮২ জন এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৩৭৪৫৯ জন। লোকাল বডির উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ১২৮৮১৮ জন যার মধ্যে ১১৯৬৫ জন ছাত্রী। বেসরকরি উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৭৯৪১০ জন যার মধ্যে ৩২১০৭ জন ছাত্রী। উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১৫৫৯৭ জন এদের মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৫৮৯৭ জন। উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৭ ভাগ বহন করে সরকার এবং অবশিষ্ট ৫৩ ভাগ বহন করে লোকাল বডি ও বিবিধ তহবিল থেকে। [৭৬]

নর্মাল স্কুল

নর্মাল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে পেশাভিত্তিক ইনিস্টিটিউশন যার অর্থ প্রাথমিক ও মিডল স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও ইহা প্রাইমারী এবং হাইস্কুলের মিডল বিভাগকেও ট্রেনিং দেয়। এই সব স্কুলে S.V(Senior Vernacular) এবং J.V.(Junior Vernacular) কোর্স শেখান হত। এই সব কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হতে হবে S.V কোর্সের জন্য ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ অথবা ২য়

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে প্রবেশিকা পাশ এবং এর সাথে J.V. থাকতে হবে। J.V.(Junior Vernacular) কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ধরা হয় প্রবেশিকা অথবা মিডল স্কুলে প্রথম বিভাগে পাশ সার্টিফিকেট। এই ইনিস্টিটিউশনের পরীক্ষা পরিচালনা করত শিক্ষা বিভাগ। এই নর্মাল স্কুলগুলি দুই ধরনের ছিল সরকারি ইনিস্টিটিউট যা সরাসরি শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বেসরকারি ইনিস্টিটিউট যা সরকারি শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং এগুলির কিছু কিছু সরকারি সাহায্যে পরিচালিত হত। মোট নর্মাল স্কুল ছিল ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৪টি এবং ৬৫ ভাগ ছেলেদের এবং ৩৫ ভাগ মেয়েদের।[৭৭]

১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা

পূর্ব পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত যথা- মিডল স্টেজ ও হাইস্কুল স্টেজ। ১৯৬২-৬৩ সালে মিডল স্কুল হাইস্কুল এবং প্রাইমারী স্কুলের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং ইহা মিডল স্কুল, সেকেন্ডারী স্কুল ও রিফর্মড মাদ্রাসায় বিভক্ত ছিল। তিন ধরণের মিডল স্কুল ছিল যথা- মিডল ইংলিশ স্কুল, মিডল ভার্নাকুলার স্কুল এবং জুনিয়র হাইস্কুল। মধ্যপর্যায়ের বা মিডল স্কুলের শিক্ষা পূর্বের ন্যায় সরকারের শিক্ষা বিভাগ, নির্বাহী কর্মকর্তা ও ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৬২-৬৩ সালে ১০০১টি জুনিয়র হাইস্কুলসহ মিডল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৪৫৫টি। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ৭৭৬টি জুনিয়র হাইস্কুলসহ মিডল স্কুলের সংখ্যা ১৩৩৯টি। এই সময়ে ৫৬টি স্কুল বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২-৬৩ সালের মোট শিক্ষার্থী ছিল জুনিয়র হাইস্কুলের ৯৯৭৬১ জনসহ ১২৩১৫১ জন। ১৯৬১-৬২ সালে এই সংখ্যা ছিল জুনিয়র হাই স্কুলের ৭০৩০০ জনসহ মোট ৯৯৭৯৪ জন। শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৩৩৫৭ জন।[৭৮]

নিম্নের ২৪ ও ২৫ নং সারণিতে ১৯৬২-৬৩ সালে মিডল স্কুলের সংখ্যা ও ব্যয়ের চিত্র দেখান হলো :[৭৯]

সারণি-৬১

	১৯৬২-৬৩		১৯৬১-৬২	
	জুনিয়র হাইস্কুল	মিডল স্কুল	জুনিয়র হাইস্কুল	মিডল স্কুল
স্কুলের সংখ্যা	১০০১	৪৫৪	৭৭৬	৬২৩
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৯৯৭৬১	২৩৩৯০	৭০৩০০	২৯৪৯৪
মোট ব্যয়	৬৩০৭২৪৮/-	১১২৯৮০৭/-	৪৪১৯৭৫৪/-	১৬৩৫৪০/-

সারণি-৬২

উৎস্য	১৯৬২-৬৩				১৯৬১-৬২			
	জুনিয়র হাইস্কুল		মিডল স্কুল		জুনিয়র হাইস্কুল		মিডল স্কুল	
	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের
সরকারি তহবিল	৮৪৩৭০১/-	৪০৭৬৪৯/-	১৭৪৬৫৭/-	১৪৭৩৭৮/-	৮১০৬১৬/-	২১২১৫০/-	২৫৭২৮০/-	২৫১৫৩৬/-

Dhaka University Institutional Repository

জেলা তহবিল	১৭৩৮০২/-	৩৯৫৮৫/-	৪৫৪৭১/-	১৫৬০৮/-	৮১১৮০/-	১৪৩৯১/-	৭৬৩৮৯/-	১৫৬৩৭/-
পৌরসভা তহবিল	১৪৫২৩/-	৩৯৭২৩/-	৬৪০/-	২০১৬/-	১৫০২/-	৯৬১১/-	২৮১৪/-	২১৬০/-
ফিস	২৮৮৩০০৭/-	৩২৬৭৯২/-	৩২৮৭৯৫/-	৮৯৫০৭/-	১৭৮৭৩৪০/-	২১৬১৫২/-	৩৯৯৭৮৯/-	১৩৫৭৫৬/-
অন্যান্য উৎস	১২৪৮২৫১/-	৩৩০২১৫/-	২৩৭৮৭১/-	৮৭৮৬৩/-	১০৭২৫১৬/-	২১৪২৯৬/-	২৯১৫১২/-	১৭২২৬০/-
মোট	৫১৬৩২৮৫/-	১১৪৩৯৬৪/-	৭৮৭৪৩৪/-	৩৪২৬৭৩/-	৩৭৫৩১৫৪/-	৬৬৬৬০০/-	১০২৫৯৯৯/-	৫৭৮০৫১/-

হাইস্কুল

হাই স্টেজ নবম ও দশম শ্রেণীর হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা নিয়ে গঠিত। এই পর্যায়ে শিক্ষা দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ছিল। শিক্ষা বিভাগের (Directorate) এবং তিনটি ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড যথা– ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯২৪টি যার মধ্যে সরকারি ছিল ৫২টি। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৮৫৩টি যার মধ্যে সরকারি হাইস্কুল ছিল ৪৪টি। ৮টি সরকারি স্কুলসহ ৭১টি হাইস্কুল বৃদ্ধি পায়। হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ছিল কিছু জুনিয়র স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীতকরণ এবং কিছু নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা। বেশির ভাগ হাইস্কুল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ক্লাশসমূহ পরিচালনা করে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট শিক্ষক ছিলেন ২০৮০৩ জন এদের মধ্যে মহিলো া শিক্ষক ছিলেন ১০৭৩ জন। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৯৪৭৯ জন এদের মধ্যে ৯৮৬ জন মহিলো া ।

নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র বেতন ছিল সরকারি বিদ্যালয়ে ৪/- রুপি এবং বেসরকারি ৫/- থেকে ৬/- রুপি ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীর সরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ছিল ৩/- রুপি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ছিল ৪/- থেকে ৬/- রুপি পর্যন্ত।

নিম্নের ২৬ ও ২৭ নং সারণিতে ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ১৯৬২-৬৩ সালের হাইস্কুলের সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লিঙ্গ ও সম্প্রদায় অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখান হলো :[৮০]

সারণি-৬৩

উচ্চ বিদ্যালয়	ছেলেদের স্কুল		মেয়েদের স্কুল	
	১৯৬২-৬৩	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬১-৬২
সরকারি স্কুল	৩৫	৩১	১৭	১৩
জেলা কাউন্সিল	-	-	-	-
মিউনিসিপ্যাল	১	১	-	-
অনুদানপ্রাপ্ত	১২৭৬	১২২৪	৯১	৮৪
অনুদানবিহীন	৪৯৩	৪৯০	১১	১০
মোট	১৮০৫	১৭৪৬	১১৯	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

জেলা তহবিল	১৭৩৮০২/-	৩৯৫৮৫/-	৪৫৪৭১/-	১৫৬০৮/-	৮১১৮০/-	১৪৩৯১/-	৭৬৩৮৯/-	১৫৬৩৭/-
পৌরসভা তহবিল	১৪৫২৩/-	৩৯৭২৩/-	৬৪০/-	২০১৬/-	১৫০২/-	৯৬১১/-	২৮১৪/-	২১৬০/-
ফিস	২৮৮৩০০৭/-	৩২৬৭৯২/-	৩২৮৭৯৫/-	৮৯৫০৭/-	১৭৮৭৩৪০/-	২১৬১৫২/-	৩৯৯৭৮৯/-	১৩৫৭৫৬/-
অন্যান্য উৎস	১২৪৮২৫১/-	৩৩০২১৫/-	২৩৭৮৭১/-	৮৭৮৬৩/-	১০৭২৫১৬/-	২১৪২৯৬/-	২৯১৫১২/-	১৭২২৬০/-
মোট	৫১৬৩২৮৫/-	১১৪৩৯৬৪/-	৭৮৭৪৩৪/-	৩৪২৬৭৩/-	৩৭৫৩১৫৪/-	৬৬৬৬০০/-	১০২৫৯৯৯/-	৫৭৮০৫১/-

হাইস্কুল

হাই স্টেজ নবম ও দশম শ্রেণীর হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা নিয়ে গঠিত। এই পর্যায়ে শিক্ষা দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ছিল। শিক্ষা বিভাগের (Directorate) এবং তিনটি ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড যথা– ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯২৪টি যার মধ্যে সরকারি ছিল ৫২টি। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৮৫৩টি যার মধ্যে সরকারি হাইস্কুল ছিল ৪৪টি। ৮টি সরকারি স্কুলসহ ৭১টি হাইস্কুল বৃদ্ধি পায়। হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ছিল কিছু জুনিয়র স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীতকরণ এবং কিছু নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা। বেশির ভাগ হাইস্কুল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ক্লাশসমূহ পরিচালনা করে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট শিক্ষক ছিলেন ২০৮০৩ জন এদের মধ্যে মহিলো া শিক্ষক ছিলেন ১০৭৩ জন। পূর্বের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৯৪৭৯ জন এদের মধ্যে ৯৮৬ জন মহিলো া ।

নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র বেতন ছিল সরকারি বিদ্যালয়ে ৪/- রুপি এবং বেসরকারি ৫/- থেকে ৬/- রুপি ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীর সরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ছিল ৩/- রুপি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ছিল ৪/- থেকে ৬/- রুপি পর্যন্ত।

নিম্নের ২৬ ও ২৭ নং সারণিতে ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ১৯৬২-৬৩ সালের হাইস্কুলের সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লিঙ্গ ও সম্প্রদায় অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখান হলো :[৮০]

সারণি-৬৩

উচ্চ বিদ্যালয়	ছেলেদের স্কুল		মেয়েদের স্কুল	
	১৯৬২-৬৩	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬১-৬২
সরকারি স্কুল	৩৫	৩১	১৭	১৩
জেলা কাউন্সিল	-	-	-	-
মিউনিসিপ্যাল	১	১	-	-
অনুদানপ্রাপ্ত	১২৭৬	১২২৪	৯১	৮৪
অনুদানবিহীন	৪৯৩	৪৯০	১১	১০
মোট	১৮০৫	১৭৪৬	১১৯	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬৪

সম্প্রদায়	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট
মুসলিম	৩৬৮৫৬৭	৩৭৩২৪	৪০৫৮৯১
হিন্দু ক) কাস্ট	৯৪৭৬২	১২১০৫	১০৬৮৬৭
খ) সিডিউল কাস্ট	৪৮০৬৪	৪৫৪৭	৫২৬১১
পাকিস্তানিখ্রিশ্চিয়ান	১১৯৩	৫৩১	১৭২৪
বুদ্ধিষ্ট	২৫০৯	৪৯৯	৩০০৮
অন্যান্য	৩৬৬	১৩২	৪৯৮
মোট	৫১৫৪৬১	৫৫১৩৮	৫৭০৫৯৯

১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম পাকস্তানে মাধ্যমিক শিক্ষা

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানেও মাধ্যমিক শিক্ষা দু'টি পর্যায়ের বিভক্ত ছিল যথা–মধ্য পর্যায় (Middle Stage) ও উচ্চ পর্যায় (High Stage) মধ্যস্কুল (Middle School) প্রাথমিক পর্যায় ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার অংশ বিশেষ। প্রথম ৮ম গ্রেড পর্যন্ত মধ্য পর্যায় যেমন প্রাথমিক পর্যায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ৬ষ্ঠ তেকে ৮ম মাধ্যমিক পর্যায়ের অংশ নিয়ে গঠিত। এই পর্যায়ে মোট শিক্ষাকাল আট বৎসর এর মধ্যে পাঁচ বৎসর প্রাথমিক ও তিন বৎসর মাধ্যমিক পর্যায়ের। পাঁচ ধরনের (Type) মিডল স্কুল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচলিত ছিল যথা–

১. সরকারি মিডল স্কুল (Government Schools)

২. জেলা পরিষদ স্কুল (District Council Schools)

৩. পৌরসভা স্কুল (Municipal Committee Schools)

৪. বেসরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্কুল (Private Aided Schools)

৫. বেসরকারি অনুদানবিহীন (Private Unaided Schools) [৮১]

হাইস্কুল

হাইস্কুল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে। হাইস্কুল শিক্ষা সাধারণভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায় এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়। শহরাঞ্চলের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়

ব্যতীত ছিল কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ হাইস্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ছিল। প্রাথমিক বিভাগের সাথে যুক্ত হাইস্কুলের সময়কাল দশ বৎসর, পাঁচবৎসর প্রাথমিক ও পাঁচ বৎসর মাধ্যমিক পর্যায়। মিডল স্কুলের ন্যায় হাইস্কুল ও ৫ ধরণের ছিল যথা-

১. সরকারি স্কুল (Government Schools)

২. জেলা পরিষদ স্কুল (District Council Schools)

৩. পৌরসভা স্কুল (Munjcipal Committee Schools)

৪. বেসরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল (Private Aided Schools)

৫. বেসরকারি অনুদানবিহীন (Parivate Unaided Schools)[৮২]

নিম্নের সারণিতে ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয়ের চিত্র দেখান হলো :[৮৩]

সারণি-৬৫

ধরণ	A-মিডল স্কুল			B- হাইস্কুল			মাধ্যমিক বিদ্যালয় (A+B)		
	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট
স্কুল সংখ্যা	১৮১৪	৪২৩	২২৩৭	১০৭৪	২৭৫	১৩৪৯	২৮৮৮	৬৯৮	৩৫৮৬
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩৮৩২০০	৮৮৮৭৬	৪৭২০৭৬	৪৮৭৫৬২	১৪১৫১১	৬২৯০৭৩	৮৭০৭৬২	২৩০৩৮৭	১১০১১৪৯
				শিক্ষক সংখ্যা					
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	১২৫২৩	২৭৬৬	১৫২৮৯	১৩৮৬৪	৪১২০	১৭৯৮৪	২৬৩৮৭	৬৮৮৬	৩৩২৭৩
প্রশিক্ষণ বিহীন	২৯৭১	৪১১	৩৩৮২	৪৩৫৬	৭০৫	৫০৬১	৭৩২৭	১১১৬	৮৪৪৩
মোট	১৫৪৯৪	৩১৭৭	১৮৬৭১	১৮২২০	৪৮২৫	২৩০৪৫	৩৩৭১৪	৮০০২	৪১৭১৬
ব্যয় (হাজারে)	২৯৫৬৬	৫৬৪৫	৩৫২১১	৫৪৭১৪	১২১৫২	৬৬৮৬৬	৮৪২৮০	১৭৭৭১৭	১০২০৭৭

১৯৬২-৬৩ সালে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫৮৬টি। মিডল স্কুলের সংখ্যা ছিল ২২৩৭টি অর্থাৎ ৬২% এবং হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩৪৯টি অর্থাৎ ৩৮%। মিডল স্কুলের ৮১ ভাগ ছিল ছেলেদের এবং ১৯ ভাগ ছিল মেয়েদের। হাইস্কুলের ৮০ ভাগ ছিল ছেলেদের এবং ২০ ভাগ ছিল মেয়েদের।

ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬ ও মাধ্যমিক শিক্ষা

পাকিস্তান সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশমালা অনুমোদন করে এবং ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে সুপারিশমালার আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার শুরু করে। এই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

ও পশ্চিম পাকস্তানে ছাত্র আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি জানায়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের দাবি ছিল–

১. স্কুলের সিলেবাস বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় ও অতিরিক্ত বই বাদ দিতে হবে। বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে এবং আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি ,উর্দু এবং আরবি বাদ দিতে হবে।

২. কারিকুলাম বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ইতিহাস এবং ভাষাগত বিভ্রান্তি বাদ দিতে হবে। কালোবাজারে বই বিক্রি বন্ধ করতে হবে এবং স্বল্পমূল্যে পুস্তক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। গরীব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক ধারণা সৃষ্টিকারী পুস্তক পাঠ্যবই থেকে বাদ দিতে হবে।

৩. স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি খরচে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, কিন্ডারগার্টেন স্কুল এবং সাধারণ স্কুলের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে হবে। দেশের সকল স্কুল একই নিয়মের আওতায় আনতে হবে।

৫. অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করে যে সকল স্কুলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সেসব স্কুলের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেখানে সরকারি অনুদান দিতে হবে।

৬. দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রত্যেক শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য ৬০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে এই সংখ্যা বাড়াতে হবে। ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টম শেণী পর্যন্ত স্কুল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণীর শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করতে হবে।

৭. টিউশন ফি সরকারি ও বেসকারি স্কুলে একই করতে হবে এবং এই ফি সকল স্তরে ৪০ ভাগ কমাতে হবে। গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করতে হবে সরকারকে।[৮৪]

ছাত্রদের সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার ১৯৬৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করেন।

কমিশনের সুপারিশ

জুনিয়র হাইস্কুল এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) রিপোর্টের সুপারিশক্রমে কারিকুলাম বোর্ড। কমিশন মনে করেন সাধারণ ইংরেজি কোর্সে এক হাজার শব্দ সম্বলিত ইংরেজি শব্দ (Vocabulary) কমপজিশন, মৌলিক ইংরেজি জ্ঞানের কিছু কাঠামো ইত্যাদি যে সব বিষয় জুনিয়র স্কুলে পড়ান হয় তা ছাত্রদের মৌলিক জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজন আছে এবং এটি ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত বোঝা নয়। ইসলামিক শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের কোরআন থেকে কিছু সূরা পড়তে হয় কিছু আয়াত মুখস্ত করতে হয়, কিছু সূরার অর্থ এবং আরবিঅক্ষর জানতে হয়। এছাড়াও তাদের আকাঈদ, আখলাক, কিছু সিরাত এবং প্রাথমিক মাসায়েল তাদের এবাদাতের জন্য পড়তে হয় যা ছাত্রদের জন্য খুবই উপযোগী ইসলামি মূল্যবোধ ও পাকিস্তানি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য। পাকিস্তানি আদর্শ অনুযায়ী জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের আল্লামা ইকবালের কবিতা, নজরুল ইসলামের লেখা বই, মাওলানা হালির বই, শাহনামা-ই-ইসলাম ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে কমিশন মন্তব্য করে। পূর্ব পাকিস্তানেও একই আদর্শের বাংলা বই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তর সুপারিশ করে। পাঠ্যক্রম নির্বাচনের বিষয়ে কমিশন যে সব সুপারিশ করে তা নিম্নরূপঃ

১. বই প্রস্তুত করার পর কারিকুলাম বোর্ড সেটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পুনপরীক্ষা করাবেন।
২. বিশেষজ্ঞ কমিটি হাতের লিখা (Manuscripts) পরীক্ষা করে দেখবেন তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে কি না।
৩. কারিকুলাম বোর্ড প্রকাশকের সাথে শর্তাধীনে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের নিশ্চয়তা দিবে এবং কালো বাজারে বই বিক্রি বন্ধ করতে হবে।
৪. কারিকুলাম বোর্ড পরীক্ষা করবে যে, প্রকাশক বই মূদ্রণ, প্রকাশ এবং বিতরণ তাদের নিজস্ব এজেন্সীর মাধ্যমে করছে কি না।
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বই প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিক্রি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে। [৮৫]

টিউশন ফি কমানোর ক্ষেত্রে কমিশনের মন্তব্য ছিল স্কুল বেতন সরকারি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং বর্তমান প্রচলিত টিউশন ফি বেশি বা অযৌক্তিক (Unreasonable) নয় কাজেই বেতন কমানোর কোন যথার্থতা নেই। প্রত্যেকটি বেসরকারি স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন বেতন তবে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুল গুলিতে বেতনের পরিমাণ বেশি। যদিও কমিশন মনে করে ফিস কমিয়ে সব স্কুলে একই রকম করা উচিত তবে এটি বাস্তবায়নে অসুবিধা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালে করাচীতে যখন ছাত্র আন্দোলন হয় তখন ছাত্র বেতন ৫০ ভাগ কমিয়ে দেয় সরকার। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মূলতঃ ছাত্রবেতন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানেই বেশি ছিল। কমিশন মনে করে শহরাঞ্চলে বেসরকারি স্কুল এবং পার্বত্য এলাকায় ছাত্র বেতন বেশি যা প্রধানতঃ খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। এই স্কুলগুলি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের সুপারিশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাবলিক ইস্ট্রাকশন বিভিন্ন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের ডেকে সরকারি স্কুলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্রবেতন নির্ধারণ করবে। [৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল শুধুমাত্র পেশোয়ার, কোয়েটা এবং কালাতে ছেলেদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ছিল। কমিশন প্রস্তাব করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৫-৭০) ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করা হোক। কিন্তু ছাত্রদের দাবি ছিল এটিকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা হোক। কমিশন অর্থনৈতিক দূর্বলতার কারণে ছাত্রদের দাবি বিবেচনা করা সঠিক হবে না বলে মন্তব্য করে এবং উদাহরণ হিসেবে কমিশন দুটি উন্নত দেশ ব্রিটেন এবং রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরে। ব্রিটেনের মত উন্নত দেশ ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক পূর্ব শিক্ষা অবৈতনিক করতে পারেনি এবং মাত্র ১৯৪৭ সালে ১৫ বৎসরের সকল ছেলেমেয়েদের ৪ বৎসরের জুনিয়র কোর্স অবৈতনিক করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসেম্বর ১৯৫৮ পর্যন্ত ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়দের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে এবং ৮ বৎসর মেয়াদী স্কুল শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। তবে তাদের পিতা মাতা পাঠ্যবই, পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করে। সকল দিক বিবেচনা করে কমিশন মনে করে উভয় পাকিস্তানের শিক্ষা ৮ম শ্রেণীর অধিকতর শিক্ষা আবশ্যিক করার ক্ষেত্রে সরকার সমর্থ নয়। এই জন্য কমিশন মেধাবী ছাত্ররা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এই জন্য মেধাবী ছাত্রদের জন্য বেশি পরিমাণ ছাত্রদের স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড দেওয়ার সুপারিশ করে। প্রতি বৎসর ৮ম শ্রেণীর জন্য বৃত্তি পরীক্ষা হওয়া উচিত। নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য অধিক পরিমাণে কারিগরী ও পেশাভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে কমিশন।[৮৭]

কিন্তু কমিশন ছাত্রদের দু:খ-দুর্দশা এবং অভিযোগের কারণ অনুসন্ধানে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেনি। কারণ কমিশন তার রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ কোন সুনিশ্চিত মূল সমস্যা বা ইস্যুর কথা উল্লেখ করেননি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিশন ছাত্রদের দাবির বিপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। অথবা সরকারি অর্থের সীমাবদ্ধতার কথা বলে বিষয়টির গুরুত্বকে অবহেলো া করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে কমিশনের অধিকাংশ সদস্যবৃন্দই পশ্চিম পাকিস্তানের এবং তারা পশ্চিম পাকস্তানে অবস্থান করেন এবং সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ফলে তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যবেক্ষন সম্ভব হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকস্তানে তীব্রতর ছিল। কমিশনের সদস্যবৃন্দ শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত ছিলেন না ফলে তাদের পক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। কমিশন শিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশ পেশ করে পূর্ব পাকিস্তানে তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাক্ষাত হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালের শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে মিডল স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮০০ টি এবং পুর্ব পাকিস্তানে ছিল ১৫০০ জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫৭০টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে

Dhaka University Institutional Repository

ছিল ১৯০০টি। পশ্চিম পাকিস্তানে মিডল স্কুল প্রাথমিক পর্যায় এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত ছিল অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায় এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী নিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়। হাইস্কুল শহর এলাকা ছাড়া প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ১৯৬৪-৬৫ সময়েও পূর্বের ন্যায় পাঁচ ধরণের স্কুল ছিল যথা- সরকারি, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বেসরকারি অনুদান প্রাপ্ত এবং বেসরকারি অনুদানবিহীন স্কুল। পূর্ব পাকিস্তানে জুনিয়ির মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠিত ছিল ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী নিয়ে এবং হাইস্কুল গঠিত ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা জুনিয়র বিদ্যালয় বা হাইস্কুলের সাথে যুক্ত ছিল না। [৮৮]

নয়া শিক্ষা নীতির জন্য প্রস্তাব (১৯৬৯) ও মাধ্যমিক শিক্ষা

নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব বা এয়ার মার্শাল এম.নূর খান কশিনের প্রস্তাবে দুই ভাগে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম ভাগে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। পূর্বের শিক্ষানীতির অনুকরণেই মূলত: নতুন শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়েছিল যা ছিল পাকিস্তানিশাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক, ধনতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ প্রচলিত শিক্ষানীতির ত্রুটিসমূহ তুলে ধরে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পাকিস্তানের সবার জন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো, জাতীয় ঐক্যের জন্য শক্তিশালী যন্ত্র হিসেবে শিক্ষাকে ব্যবহার করা ইত্যাদি হবে নয়া শিক্ষা নীতির লক্ষ্য।[৮৯]

নয়া শিক্ষানীতির প্রস্তাবে পাকিস্তানিআদর্শ তথা ইসলামি আদর্শে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উপর বিশেষ গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক করার এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণ বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমতা আনার প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের বক্তব্য ছিল যেহেতু পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ৪০৮/- রুপি এদিক থেকে দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে বস্তুগত সম্পদের অভাব। অন্য একটি কারণ এই দারিদ্রের জন্য দায়ি হচ্ছে এর অনুন্নত মানব সম্পদ।

এছাড়াও দেশে প্রচুর শিক্ষিত বেকার রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ২০০০০০ জন। যদি এই সমস্যার সমাধান করতে হয় তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতি মাত্র। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু পেশাভিত্তিক এবং কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর ৪ ভাগের বেশি পেশাভিত্তিক এবং কারিগরি শিক্ষার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত নয় কাজেই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। পেশাভিত্তিক এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দেশে। আর এই প্রয়োজন মোটানোর জন্য মাধ্যমিক পর্যায়েই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সুবিধা বিঘ্নকারী অজস্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করতে হবে যাতে চাকুরির বাজার অস্থিতিশীল না হয় এবং উন্নয়নের ধারাও বাধাগ্রস্ত না হয়। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে, যা উন্নয়নের সহায়ক হয়।[৯০] মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করে-

১. মাধ্যমিক পর্যায়ে পেশাভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে;
২. মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে পেশাভিত্তিক ও কারিগরী বিষয়ক জ্ঞান দিতে হবে।
৩. পেশাভিত্তিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সাধারণ হাইস্কুলেও পর্যাপ্ত হতে হবে।
৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতিমালায় কারিগরী শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান যা পরস্পর সম্পৃক্ত এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৯১]

নূর খান কমিশন বা নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব কমিশন শিক্ষার অগ্রগতিতে কারিগরী এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কমিশনের প্রস্তাব পূর্বের দুটি কমিশন শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিধ্বনি মাত্র। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন, শিক্ষা কাঠামোর সংস্কার শিক্ষা প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস, শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদিসহ শিক্ষাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করা হলেও বাঙালির জাতীয় বিকাশ বৃদ্ধি হোক এমন কোন পরিবর্তন শিক্ষা ক্ষেত্রে আনা হয়নি। পাকিস্তানের দুই অংশের শিক্ষা ক্ষেত্রে দুই ধরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাথমিক এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিম্নের সারণিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্রটি দেখান হলো:[৯২]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনুমোদনের শতকরা হার (১৯৫৫-৬০)
সারণি-৬৬

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রাথমিক শিক্ষা	৯২	৮৭
মাধ্যমিক শিক্ষা	২৩	৫৬
শিক্ষক শিক্ষণ	২৪	১৯
কারিগরী শিক্ষা	৯৬	১৫
উচ্চ শিক্ষা	৩১	৮৩

E:\Liza\5-02-2011\1-5.doc 13-11-12.doc

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহের একটি করে পুস্তিকা প্রকাশ করে দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ কমিটি (Documentation Committee) এবং যার সহযোগিতায় ছিল শিক্ষাতথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bureau of Educational Informations and Statistics) এবং পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। পুস্তিকার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিদ, গবেষণাকর্মী এবং প্রদেশের সাধারণ জনসাধারণকে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা। ১৯৭০ সালের পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তথ্য উপাত্ত সহকারে ১৯৪৭ সাল থেকে শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা। নিম্নের ৩০ ও ৩১নং সারণিতে মিডল ও জুনিয়র হাইস্কুল ও হাইস্কুলের সংখ্যাগত ডাটা, নিবন্ধন, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয় দেখান হলো : [৯৩]

সারণি-৬৭
মিডল এবং জুনিয়র হাইস্কুল

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট নিবন্ধন	মোট শিক্ষক	বাৎসরিক ব্যয়	
				মোট (রুপি)	সরকার (রুপি)
১৯৪৭-৪৮	২১৭৫	১৭৩৯৩৪	১০১৫৬	৪০৬৪৭৮৬	৯৬২৫৪৯
১৯৪৮-৪৯	২১৭২	১৯৫০৫৪	৯৪৬৫	৪৬১১৯৭০	১১৫২৭৩৭
১৯৪৯-৫০	২১২১	১৯৮৩৩৭	৯৩৭৯	৪১৯৮৩৩৭	১২৩০৫১৭
১৯৫০-৫১	২০৫৩	১৮৮৬৯০	৮৭৯৬	৪৫৯২৩৩৭	১২২৬৩৫৯
১৯৫১-৫২	১৮৭১	১৬৩৬১২	৮৪৫৯	৪৩২৩৮০৯	১২০৮০৬১
১৯৫২-৫৩	১৬৬৮	১৩৫৯২৪	৭৪০৮	৪৬৩৫০২২	১৬১৩৩৩৯
১৯৫৩-৫৪	১৫৯৭	১২২৮৪৯	৭২৫৬	৪৫১২৬০১	১০৪৭১১৮
১৯৫৪-৫৫	১৫৪৪	১১৩৬২৫	৭০২৭	৪০৭৩৩২৭	৯৮৪৪৮৬
১৯৫৫-৫৬	১৫৬৯	১২৩৭৯৭	৭১৮৫	৩৮৯৪২০৯	১০৩১৯৩০
১৯৫৬-৫৭	১৫০৩	১২৩১৮৮	৬৯২৪	৩৪২৮৮২১	৯৬৫৪২৫
১৯৫৭-৫৮	১৩৯২	৯৮১০৬	৬১৮৭	৪৪১৫৪৭৯	৯৩৭৫২৮
১৯৫৮-৫৯	১৩৭০	৮৭২৮৩	৫১৫৩	৫৩৮৮৯৪০	১৬৪২৬২১
১৯৫৯-৬০	১৩২৪	৯৩৫১২	৫২২৮	৫১৪০৫৭২	১৩২১৯২৮
১৯৬০-৬১	১৩৫২	৯৪২০১	৫৫৭৮	৫৫৭৮৯৪৬	১৬০২৮৩১
১৯৬১-৬২	১৩৯৯	৯৯৭৯৪	৫৮৩৯	৬১২৩১০৪	১৫৩১৫৮৮
১৯৬২-৬৩	১৪৫৫	১২৩১৫১	৬৭০৭	৮৬১২৯৯৬	১৯৫৮৪৪১
১৯৬৩-৬৪	১৫৩৮	১৩৯৯৭৬	৭৪৪৭	৯৮৪৯৮৩৯	২৪০০৯৯৮
১৯৬৪-৬৫	১৫৮৩	১৪৯৫৮২	৮১৫৪	১০৯২০৯৮৮	৩২৪১১২৮
১৯৬৫-৬৬	১৬৭৭	১৬৪৯২৪	৮৩৭৩	১১৯২৭৬৪৬	৩০৬০৮২৩
১৯৬৬-৬৭	১৬০১	১৭০৫৮১	৮৩৮২	১১৮২২০৫৩	৩১৩৩০৩৭
১৯৬৭-৬৮	১৭৭৫	১৮৮৪৫৬	৯০৩৩	১৩১৫৯৯৬৯	২৯৮৩০৮৮
১৯৬৮-৬৯	১৮৬০	১৯২০০০	৯১০০	১৪০০০০০০	
১৯৬৯-৭০	২০০০০				

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬৮

হাইস্কুল

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট নিবন্ধন	মোট শিক্ষক	বাৎসরিক ব্যয়	
				মোট (রুপি)	সরকার (রুপি)
১৯৪৭-৪৮	১৩০৬	৩৩১০৭৪	১৪২০৬	৯৪৪৫০৯০৬	২৮৫৫৩৯২
১৯৪৮-৪৯	১৩৭৯	৩৫৩৫৬২	১৫১৩২	১৫৪০১৮৩৬	৩০৩৭৩৪৪
১৯৪৯-৫০	১৪২৯	৩১৯৪৬৫	১৪৬৬৮	১৬৪৬০৮৯৩	৩৪১১৫২৬
১৯৫০-৫১	১৪৫৪	৩২৫৮২২	১৪৮৯৪	১৫৮৮০০৬৪	৩৯১৬৩২০
১৯৫১-৫২	১৪৬৭	৩১৬২৪৫	১৪৬৪১	১৮২১১৮১৯	৪২৪৩৭০২
১৯৫২-৫৩	১৪৭৫	৩১৭৫১৭	১৪৫১৩	১৯৫৮২৯৪৪	৬০২৭৯৫৭
১৯৫৩-৫৪	১৫০৫	৩১৯৬৫০	১৪৩৮২	১৭৯৭৮৮৫৬	৪৪১২৬২৮
১৯৫৪-৫৫	১৫৩৫	৩৪৩৬৭২	১৫২৬২	১৯০১৭৭০১	৪৪১০৬৭৬
১৯৫৫-৫৬	১৫৩৬	৩৪৯৩২৩	১৫৫৮২	১৯৭১৮৬৩০	৪৯৩১৯১৩
১৯৫৬-৫৭	১৫৮১	৩৭৪৪১১	১৬২৩৬	২১০১৪০০০	৪৮৬০৯৬৫
১৯৫৭-৫৮	১৬৩৮	৩৯২৯৩৯	১৬৭২২	২৩৪৯৯২৪২	৭০২৯৩৮৩
১৯৫৮-৫৯	১৬৯১	৪০৭৭৫২	১৭৬৪৩	৩০৬৫৩২৭৮	৯১৭৩৩৩৯
১৯৫৯-৬০	১৭২৯	৪৩৬৯৭৩	১৮৩৪৩	২৯১৩৭১২৫	৮১০৬৩৫২
১৯৬০-৬১	১৭৮৮	৪৩৮৬০১	১৮৮৭৬	২৯৯৩৪৯১১	৮২০০২১৮
১৯৬১-৬২	১৮৫৫	৪৭৫১৩৭	১৯৪৭৯	৩৫৬৯২৫৮২	৯১২৩৬২৪
১৯৬২-৬৩	১৯২৪	৫৩৬০২৪	২০৮০৩	৪০৪৩৭৬১৩	৭৮৮৭৩১৮
১৯৬৩-৬৪	২০৪১	৬১৮৬৪১	২৫১৪৩	৪৫৬৪২২৫৯	১১৯২৭৯৪৫
১৯৬৪-৬৫	২২৪৮	৬০৪৯৬১	২৫৫১৬	৫৭৪৪৯৩৫৩	১৬৩৯৭৩৬০
১৯৬৫-৬৬	২৪৩১	৭৯২৮৯৬	২৭৯৩১	৬৮০৮৯৪২৭	২০১২৪২২৮
১৯৬৬-৬৭	২৭৮৯	৯১৭৯০১	৩৩৩১২	৮৯৭৮৫৭২৩	৩২৩৮০৩১৭
১৯৬৭-৬৮	৩১০৮	১০২২৪৬৫	৩৫৩৩২	৯৯৮১৯১৯৭	৩২০১৩৯৬৪
১৯৬৮-৬৯	৩৬৩২	১১২০০০০	৪০০০০	১১০০০০০০০	৩৫০০০০০০
১৯৬৯-৭০	৪০০০	১২০০০০০	৪৪০০০	১২০০০০০০০	৩৬০০০০০০

বি: দ্র: উল্লেখ্য ১৯৬৪-৬৫ সময় পর্যন্ত মিডল ও জুনিয়র হাইস্কুল সমূহে ১৯৬৫-৬৬ থেকে পরবর্তী সময়ে মিডল ও জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুলসমূহ ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সমুহের ব্যয় ২নং তালিকার ব্যয়ের অংশে দেখান হয়েছে।[৯৪]

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

মহাবিদ্যালয় শিক্ষা: ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মোট আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৫২টি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় একটি। ঢাকা মেডিকেল স্কুল ১৯৪৭ সালে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হয় এবং ১৯৪৭ সালে আরও দু'টি মেডিকেল স্কুল ছিল একটি সিলেটে অন্যটি চট্টগ্রামে। ১৯৪৭ সালে একটি মাত্র পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লায়। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয় এবং বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য শিক্ষা দেওয়া হত। মোট ছয়টি শাখায় (Brances) ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রী যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

সিভিল, ম্যাকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য শিক্ষা দেয়া হত। তবে পুরান কোর্সও চালু ছিল। চট্টগ্রামে একটি মাত্র সরকারি কমার্স কলেজ ছিল যেখানে ডিগ্রী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হত। তবে কিছু বেসরকারি এবং সরকারি কলেজেও কমার্স পড়ার সামান্য সুযোগ ছিল। ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কলেজে কমার্স বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ান হত। তবে বি.কম ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরের কোর্স ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সময়ে মোট ৫টি মহিলো া কলেজ ছিল। ইডেন মহিলো া কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করে বি.এ. পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। সিলেট সরকারি মহিলো া কলেজও প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে দুইটি সরকারি ট্রেনিং কলেজ ছিল, একটি ঢাকায় অন্যটি ময়মনসিংহে।[৯৫]

১৯৫০-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আর্ট কলেজের তুলনামূলক সংখ্যা

১৯৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল মোট ১২৭টি এর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৬টি। পূর্ব পাকিস্তানে ৩১টির মধ্যে ২৯টি ছেলেদের ও ২টি মেয়েদের। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৫টি। ৪টি ছেলেদের ও ১টি মেয়েদের। ডিগ্রী কলেজ শুধুমাত্র বি.এ, বিএস.সি পর্যন্ত (ইন্টারমিডিয়েট যুক্ত ছিল) মোট ৮২টি। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মোট ৩৭টি এর মধ্যে ছেলেদের ৩৫টি ও মেয়েদের ২টি। পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৪৫টি ছেলেদের ৩২টি ও মেয়েদের ১৩টি। মোট ৯টি কলেজে এম.এ, এম.এস.সি পর্যন্ত পড়ান হত। এই ৯টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এর মধ্যে ১টি ছিল মেয়েদের। ১৯৫১-৫৩ পর্যন্ত মোট ৪টি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এর মধ্যে ৩টি ইন্টারমিডিয়েট ও ১টি ডিগ্রী কলেজ শুধুমাত্র বি.এ, বি.এস.সি পর্যন্ত। এই ৪টি কলেজই প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫৩-৫৭ পর্যন্ত ৬টি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এর মধ্যে ১টি ইন্টারমিডিয়েট এবং ৫টি ডিগ্রী কলেজ শুধুমাত্র বি.এ, বি.এস.সি পর্যন্ত। এই ৬টি কলেজের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে দুটি ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় মেয়েদের জন। [৯৬]

পেশাভিত্তিক কলেজ

১. কৃষি কলেজ ও পশু চিবকিৎসা কলেজ

১৯৫৫-৬০ সাল পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানে ৪টি কৃষি কলেজ ও ২টি পশু চিকিৎসা কলেজ ছিল। কৃষি কলেজ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা, কৃষি কলেজ লায়ালপুর, কৃষি কলেজ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট টেন্ডো জাম অঞ্চল (Tando Jam) পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজে অন্যান্য কৃষি কলেজের ন্যায় কোর্স ছিল। পশু চিকিৎসা কলেজ ঢাকা ও পশু চিকিৎসা কলেজ লাহোরে দুইটি পশু চিকিৎসা কলেজ ছিল। কৃষিতে ডিগ্রী

Dhaka University Institutional Repository

কোর্সের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিন বছর সময় লাগে অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা ভর্তি হয় প্রবেশিকা পাশের পর কৃষিতে বি.এস.সি ডিগ্রীর জন্য চার বৎসরের কোর্স। পশ্চিম পাকিস্তানে পশু চিকিৎসা ট্রেনিং কোর্স প্রবেশিকা পাশের পর ৪ বৎসরের অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে পশু চিকিৎসায় দুটি কোর্স ছিল- (ক) প্রবেশিকা পাশের পর তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (খ) প্রবেশিকা পাশের পর পাঁচ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স। পেশোয়ারের পশু চিকিৎসা এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কুমিল্লায় কৃষি কলেজের একটি শাখায় (Sub-Section) পশু চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু করা হয়। পেশোয়ারে একটি ফরেস্ট কলেজ ছিল এবং এখানে বন বিভাগের সুপিরিয়র অফিসার (Superior Officers and Rangers) এবং রেঞ্জারদের ট্রেনিং দেয়া হতো। এই অফিসার ট্রেনিং কোর্সের সময়কাল দুই বৎসর বি.এ. অথবা বি.এস.সি ডিগ্রীর পর। রেঞ্জার কোর্স এক বৎসরের, ইন্টারমিডিয়েট পাশ ছাত্ররা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারত।

২. চিকিৎসা কলেজ

সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৫৫-৬০ সময়ে ৬টি মেডিকেল কলেজ ও ৮টি মেডিকেল স্কুল ছিল। উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৩টি মেডিকেল কলেজ ও তিনটি মেডিকেল স্কুল। মেডিসিন এবং সার্জারীতে ব্যাসেলর ডিগ্রির জন্য ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর পাঁচ বৎসরের মেডিকেল কোর্স। মেডিকেল স্কুলগুলিতে প্রবেশিকা পাশের পর চার বৎসরের কোর্স সমাপ্তির পর তারা মেডিকেল প্রাকটিসনার বা যোগ্যতার সনদ (Licentiate) পেতেন স্টেট- মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থেকে। এই সকল মেডিকেল কলেজ এবং স্কুল থেকে প্রতিবছর ৫০০ ডাক্তার পাশ করে বের হত, তবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিবছর ৬০০ করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ডাক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ডাক্তার ও জনসংখ্যা অনুপাত ছিল ১:১০০০ জন। ১৯৫১ সালে সমগ্র পাকিস্তান স্বাস্থ্য কনফারেন্স (All Pakistan Health Conference of 1951) শেষে বলা হয় নতুন করে কোন মেডিকেল স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে না। ১৯৫১-১৯৫৭ পর্যন্ত কিছু চলমান কলেজের উন্নয়ন করা হবে এবং মেডিকেল স্কুলগুলিকে শক্তিশালী ও উন্নীত (UP.grade) করে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করা হবে। শর্তাধীনে এই সকল মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করা হবে।

৩. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

১৯৬০ পর্যন্ত ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, যেমন- করাচী, লাহোর, ঢাকা এবং পেশোয়ার। চলমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয় কারণ পানি ও পাওয়ার উন্নয়নে, শিল্প, নির্মাণ ইত্যাদি পরিকল্পনা তৈরি করে ইঞ্জিনিয়ার। চলমান কলেজ থেকে প্রতিবছর ৩০০ জন ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে বের হতো। প্রত্যেক কলেজ মৌলিক কিছু বিষয় ছিল যেমন- সিভিল, ম্যাকানিক্যাল এবং

Dhaka University Institutional Repository

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। লাহোর কলেজে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে মাইনিং (Mining বা খনিজ) এবং ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ান হত। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্যামিক্যাল এবং ম্যাটালর্জিক্যাল (Metallurgical) বিষয় পড়ান হত।[৯৭]

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

১৯৫০-৬০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ছিল যেমন-(১) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা। (২) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, রাজশাহী, (৩) প্রথমিক প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ এবং (৪) মহিলা প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে তিনটি জুনিয়র প্রশিক্ষণ কলেজ, ৪৯টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল ছিল। শিক্ষকদের শারীরিক শিক্ষার জন্য একটি কলেজ ছিল। [৯৮]

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৯ এবং উচ্চ শিক্ষা

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

কমিশন উন্নত দেশের সাথে তুলনা করে মন্তব্য করে, উন্নত সকল দেশেই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তত:পক্ষে বয়স উনিশ বৎসর না হলে এবং কোন স্কুলে বারো অথবা তেরো বৎসর অধ্যয়ন না করলে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না। কমিশন পাকিস্তানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত বলে মনে করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড সকলেই অভিমত প্রদান করে যে, ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় শেষ হওয়ার পরই উচ্চ শিক্ষা শুরু হয়। এই বিষয়ে সর্বসম্মত অভিমত যে ১৯৫৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় উঠিয়ে দিয়ে লাহোরে একটি নয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। তাই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে একই নিয়ম চালু করার সুপারিশ করে। এছাড়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় পৃথক করলে ব্যয় সংকোচন হবে। ডিগ্রী কলেজে যেখানে ছাত্র সংখ্যা কম সেখানে কলেজ থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করার ধারা বন্ধ করতে হবে। কারণ বহু ছাত্র এই ধরণের কলেজের ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য নয় এবং এতে দেশের সম্পদের অপচয় বন্ধ হবে। কমিশন সুপারিশ করে যেসব এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড নাই সেই সব এলাকায় অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর যেখানে পূর্ব হতে আছে সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারমিডিয়েট অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ড সমূহকে সম্প্রসারণ করতে হবে। দ্রুত ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীকে পৃথক করা সম্ভব নয় তাই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহা সম্পন্ন করতে হবে এবং এই ব্যবস্থা চালু হলে ১১শ শ্রেণী ও ১২শ শ্রেণীর উপর মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্ব বর্তাবে।[৯৯]

ভর্তির যোগ্যতা ও ডিগ্রী কোর্স

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে পরস্পরের সমঝোতা থাকতে হবে অর্থাৎ ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে। কমিশন জোরের সাথে সুপারিশ করে ডিগ্রী (পাশ) কোর্স সম্প্রসারণ করে তিন বৎসর করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে কমিশন বলে এই ব্যবস্থা উন্নত সকল দেশেই প্রচলিত আছে এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় কোন কোন পশ্চিমা বিশ্বে ডিগ্রী কোর্স চার বৎসর। এর ফলে শিক্ষার ব্যয় সংকোচন হবে এবং ছাত্র নির্বাচনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে পাশ কোর্স ও অনার্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে এবং যারা স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রবেশ করতে পারবে না তারা পাশ কোর্সে পড়বে। পাশ কোর্সে তিনটি বিষয় থাকবে যা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। পাশ কোর্স ও অনার্স কোর্সের জন্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের জন্য প্রথম বৎসরে মানবতাবাদী বিষয় ও সমাজবিজ্ঞান বিষয় এবং কলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং সকল ছাত্রের জন্য ইংরেজি ভাষায় সাধারণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রথম বৎসরের শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের অনার্স হতে পাশ কোর্সে এবং পাশ কোর্স হতে অনার্স কোর্সে স্থানান্তরের সুযোগ থাকতে হবে। কমিশন আশা পোষন করে যে, সকল বিশ্ববিদ্যালয় যথাশীঘ্রই সম্ভব ডিগ্রী পর্যায়ে দুই ধরনের কোর্স প্রবর্তন করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও কমিশন মনে করে কতকগুলি কলেজ অনার্স ও ডিগ্রী পাশ উভয় কোর্স শিক্ষা দেবার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। কলা এবং বিজ্ঞানে যারা M.A এবং M.Sc করবে তাদের ডিগ্রী কোর্সে যে বিষয়টি অধ্যয়ন করবে সেই বিষয়টি থাকতে হবে এবং নির্বাচিত বিষয়ে স্নাতক কোর্সের দু'টি অনার্স বিষয়খণ্ড পড়তে হবে।[১০০]

অধ্যয়নের বিষয়

কমিশন ইংরেজি কোর্স অধিকতর সাহিত্যধর্মী উল্লেখ করে এটিকে ব্যবহারিক করার প্রস্তাব করে এবং জাতীয় ভাষা শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তবে কমিশন আধুনিক ভাষা অধ্যয়নের সাথে সাথে পারসী ও আরবিভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতে বলেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, পল্লী অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি, খনিজতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব এবং সৌরশক্তি, বাত্যাশক্তি ও মহাসাগরীয় স্রোতোশক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এই সব মৌলিক নীতি ও গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এছাড়াও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শাসননীতি, ব্যবসায় পরিচালনা, সমাজ বিজ্ঞান, সামাজিক কর্ম ও ইসলামি বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

সমূহ উন্নতি ও সংহতি বিধান করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম অপরিবর্তনীয় না হয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে ইহা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্বৈত প্রচেষ্টা পরিহার করে বুদ্ধিমত্তার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। [১০১]

উচ্চতর পর্যায়ে পরীক্ষা পদ্ধতি

কমিশন সুপারিশ করে যে, সাধারণ পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষক সারা বৎসর পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করবেন ও নম্বর দিবেন। প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের অভ্যন্তরীন মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই জন্য শিক্ষকগণ অনেকগুলি সাময়িক (Periodic) পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এই পরীক্ষা প্রতিমাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পত্রে নম্বর দিয়ে আবার ছাত্রদের ফিরিয়ে দিতে হবে এবং নম্বর নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। ছাত্রকে অভ্যন্তরীণ এবং সাধারণ উভয় পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। উভয় পরীক্ষার ফলাফলের সমষ্টি নিয়ে পরীক্ষায় ছাত্রের স্থান ও বিভাগ নির্ধারণ হবে। স্নাতক ডিগ্রীর জন্য যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে তাতে সাধারণ পরীক্ষার ফল এবং পৃথকভাবে অভ্যন্তরীন পরীক্ষা সমূহের ফলাফলের ভিত্তিতেই সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হবে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যারা ভাল ফলাফল করবে কলেজগুলি সেইসব প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে। অনুমোদিত কলেজগুলি, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যে নম্বর প্রেরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় তা পর্যালোচনা করে দেখবে। সাধারণ পরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান হলে উহার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। তাই কমিশন সুপারিশ করে নিয়মিত ছাত্রের সমস্ত শিক্ষাকালের ক্রমিক বিবরণ সম্বলিত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাকুরির প্রশ্নে ও ভর্তি কমিটির বিবেচনার জন্য উহা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে নিম্নতম শতকরা ৪০ নম্বর ধরে গড়ে প্রতি বিষয়ে শতকরা ৫০ নম্বরকে পাশ নম্বর নির্ধারণ, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য শতকরা ৬০ নম্বর ও প্রথম বিভাগের জন্য শতকরা ৭০ নম্বর নির্ধারনের সুপারিশ করে কমিশন। অকৃতকার্য ছাত্রকে শুধুমাত্র একবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ থাকবে। পরীক্ষা গ্রহণের তিন সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীর ছাত্রদের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, সেমিনার ও গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যা সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য কমিশন জোর সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীর ক্ষেত্রে প্রাইভেট পরীক্ষা উত্তম শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সংগতি নয় বলে কমিশন মনে করে। তবে কমিশন সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম বন্ধ না করে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বন্ধ করার সুপারিশ করে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক, মহিলা দেশরক্ষা বাহিনীর সদস্য ও নির্দিষ্ট সরকারি কর্মচারীরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে। তবে কমিশন কলা বিভাগের স্নাতক পাশ ডিগ্রীর ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহে প্রবেশিকা

(মেট্রিকুলেশন) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক (ইন্টারমিডিয়েট) পর্যায়ে প্রাইভেট প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। স্নাতকোত্তর (Post Graduate) পর্যায়ে প্রাইভেট প্রার্থীদের পরীক্ষা অবতীর্ণ হতে অনুমতি দেয়া সংগত নয় বলে কমিশন কারিগরী ও বানিজ্যিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। [১০২]

ছাত্রকল্যাণ ও শৃঙ্খলা

কমিশন মনে করে ছাত্র-সমাজের একটা বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুপযোগী এবং উদাহরণ হিসেবে ১৯৫৭ সালে যারা পাশ নম্বর পেয়েছিল তাদের শতকরা হার নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো : [১০৩]

সারণি-৬৯

ডিগ্রীর নাম	পাঞ্জাব	ঢাকা
ব্যাসেলর অব আর্টস	৩৪.৩	৩০.৫
ব্যাসেলর অব সায়েন্স	২৮.৮	৫৪.০
মাস্টার্স অব আর্টস	৪৪.৭	৭৯.৫
মাস্টার্স অব সাইন্স	৫২.৫	৮৪.০
ব্যাসেলর অব সায়েন্স (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	৪৩.৭	×
ফাইনাল প্রফেসনাল (মেডিসিন)	৪৭.৫	২৭
ফাইনাল প্রফেসনাল (দন্ত চিকিৎসা)	৪৩	৭

অযোগ্য শিক্ষার্থী ভর্তিই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ি বলে কমিশন মনে করে।

কলেজ শিক্ষার সুপারিশ

কমিশন মনে করে পর্যাপ্ত সম্পদ ব্যতীত কোন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করে কয়েক বছরে বহু সংখ্যক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সরকার বেশ কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও সেসব কলেজে প্রয়োজনীয় ইমারত ও যন্ত্রপাতিবিহীন অবস্থায় আছে। বেসরকারি কলেজগুলিকে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হয় এবং কয়েকটি কলেজ ব্যতীত অধিকাংশ বেসরকারি কলেজ সরকারের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা কখনো লাভ করেনি। কমিশন মন্তব্য করে বেসরকারি কলেজগুলি সত্যিকার শিক্ষামূলক প্রয়োজন মিটানোর চেয়ে গৌরব বৃদ্ধির জন্যই এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কলেজগুলি উন্নয়নের জন্য কলেজসমূহের পৃষ্ঠপোষক বা কর্মচারীবৃন্দ অর্থনৈতিক অবস্থা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। তাই কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করে যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: বেসরকারি কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা একটি ক্ষুদ্রায়তন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। শিক্ষা, বাণিজ্য শিল্প ও সরকারি কাজের ক্ষেত্রে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন তাদের মধ্য থেকে সদস্য মনোনীত এবং বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোর্ডের চেয়ারম্যান করা উচিত। তাদের যথোপযুক্ত পারিতোষিক দেওয়া বাঞ্চনীয়।

দ্বিতীয়ত: অধিক সংখ্যক ছাত্র থাকাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট নয় বরং ছাত্ররা শিক্ষার ব্যাপারে যাতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং যারা বেসরকারি দানের মারফত অর্থ সংগ্রহ করেছে সেই সমস্ত কলেজকে সাহায্য দেওয়া উচিত।

তৃতীয়ত: জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে কলেজের শিক্ষকবৃন্দের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহায়তা করা উচিত।

চতুর্থত: কলেজকে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তুষ্ট করতে হবে যে, ইহা নিজস্ব সম্পদ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষনের খরচ বহন করতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যে কলেজকে বাৎসরিক অন্তত: ২৫০০০ টাকা দিতে সক্ষম এমন একটি নির্দিষ্ট আয়ের তহবিল গঠন করতে হবে।

পঞ্চমত: শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করে সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং অর্থ ছাত্রদের বেতন, কলেজ পরিচালকদের অর্থ এবং সরকারি অর্থ থেকে নির্বাহ করা বাঞ্চনীয়।[১০৩]

গঠনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ জোরদার করবার জন্য এবং পরিচালনা ব্যবস্থাকে সহজ করবার জন্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করে যথা-

১. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনামূলক কাঠামো এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তৎপরতার সাথে শিক্ষাদান এবং গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট বা কোর্টে কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ এবং বহুসংখ্যক নির্বাচিত সদস্য থাকাই বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অন্যদিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সম্প্রসারণ প্রয়োজন এবং সেখানে কেবলমাত্র শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত না করে বাহির থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একাডেমিক কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও উন্নত করলে কোর্ট বা সিনেটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

২. চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত।

৩. চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ক্ষুদ্রাকার সিন্ডিকেট গঠিত হওয়া উচিত এবং ইহার মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কতকগুলি বিশেষ কমিটি গঠন করে উহাদের উপর (ক) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (খ) শিক্ষক নির্বাচন এবং (গ) শিক্ষকদের কাজের মূল্য নিরূপনের ভার দেওয়া উচিত।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং পরিচালন বিভাগসমূহ পৃথক করা এবং এই দুই বিভাগের কর্তৃত্ব দুইজন পৃথক অফিসারের উপর ন্যস্ত করা উচিত। তাঁরা সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলরের অধীনে কাজ করবেন।[১০৪]

মূল্যায়ন

১৯৫৯ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্টের শুরুতেই সরকারি কর্তব্য ও জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জনশৃঙ্খলা ও জনসেবার প্রতি অন্ততঃ চার প্রকার মনোভাব দেখা যায়: নিস্ক্রিয়তা ও অসহযোগিতা, উচ্ছৃঙ্খলা ও সরকারি কর্তৃত্ব মেনে না নেয়া, আত্মস্বার্থকে সমাজের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা।[১০৫] অর্থাৎ প্রথমে কমিশন তার রিপোর্ট নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে। বিভিন্ন ইস্যুতে যখন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তখন শরীফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ সমালোচনার ঝড় তোলে ও আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। ছাত্ররা এই আন্দোলনকে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় বিশেষ করে তিন বছর মেয়াদী কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজির অতিরিক্ত বোঝার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করে। উচ্চ শিক্ষা মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই পাস নম্বার ধরা হয় ৫০, দ্বিতীয় বিভাগ শতকরা ৬০ এবং প্রথম বিভাগ শতকরা ৭০ নম্বর। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে পূর্ণসরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখা এবং শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বছরে ১৫০০ ঘণ্টা কাজের বিধান রাখা হয়, যা ছাত্র-শিক্ষক সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কমিশনের এ সকল সুপারিশকে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সংকোচননীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে মন্ত্রিসভা পর্যায়ক্রমিকভাবে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চারশত পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট পর্যালোচনা শুরু করে এবং পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চূড়ান্ত হলে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদন করে।[১০৬]

কমিশনের রিপোর্টে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে সংকুচিত করার সুপারিশ করা হয়। উচ্চশিক্ষা সংকোচনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমানের বক্তব্যে। ১৩-০৭-১৯৫৯ সালে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, 'প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তিনি ব্যক্তিগত মত পোষন করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান মফস্বল কলেজের অধ্যাপকদের জন্য আগামী বৎসর হতে ঢাকায় একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুল খোলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষে ব্যক্তিগত মত প্রকাশকালে তিনি আরো বলেন, "উচ্চ শিক্ষার জন্য যে অতি আগ্রহের প্রবর্তনতা দেখা দিয়েছে উহা আমাদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। কেননা বছরের পর বছর ধরে কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যক কেরাণী ও শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে।" তিনি আরো বলেন," দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ম্যাট্রিক (প্রবেশিকা) স্ট্যান্ডার্ডের পর নানা ধরণের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য এবং এই ব্যাপারে ছাত্রদের বিশেষভাবে উৎসাহিতোকরা অপরিহার্য। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। [১০৭]

ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশসমূহকে স্কুলে অন্তর্ভুক্তি

১৯৬০ সালের ১ জুলাই থেকে সমগ্র প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করা শুরু হয়। ইহার ফলে সর্ব প্রথম আই.এ, আই.এস.সি ও আই.কম পরীক্ষা পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাভূক্ত করা ছাড়াও এ সকল কোর্সকে স্কুলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১ জুলাই ১৯৬০ থেকে প্রদেশের সকল ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে সিনিয়র হাইস্কুল নামকরণ করা হয়। অন্যান্য কলেজ হতে ডিগ্রী ক্লাশকে পৃথক করা হয় এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি নিয়ে সিনিয়র স্কুল শুরু হয়। এই সকল সিনিয়র স্কুলের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তাদের স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণী চালু করতে পারবে। প্রদেশের প্রতিটি মহকুমায় ন্যূনতম দুইটি করে উন্নীত হাইস্কুল ও একটি করে সিনিয়র হাইস্কুল নির্বাচিত হয়। উন্নীত হাইস্কুলে বহুমুখী কোর্স প্রবর্তন অর্থাৎ কৃষি, কারিগরি প্রভৃতি শিক্ষা শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রদেশে শিক্ষা কমিশনের সকল সুপারিশ কার্যকর করা সম্পন্ন হবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৭ শত ৩৪টি হাইস্কুলের মধ্যে ৮শত স্কুলকে উন্নীত স্কুল হিসেবে নির্বাচিত করা হবে এবং যে সকল স্কুল ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী উদ্বোধন করতে সক্ষম উহাদের সিনিয়র স্কুলে উন্নীত করা হবে এবং বাকী প্রায় সাতশত স্কুলকে জুনিয়র স্কুলে পরিণত করা হবে। জুনিয়র স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ থাকবে। ১৯৬০-৬১ সাল হতে তিন বৎসর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত হলেও ছাত্র আন্দোলনের কারণে তা বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৬০-৬১ সেশন থেকে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা গ্রহণ ও কোর্স প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বোর্ড প্রবেশিকা (ম্যাট্রিক)ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উপর্যুপরি দুইবার অকৃতকার্য ছাত্রদের পরবর্তী বৎসর কোর্স শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় দেওয়ার অনুমতি প্রদান করতে পারবে না। তবে এদেরকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে আপাততঃ পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

শীঘ্রই সিনিয়র ও উন্নীত স্কুলে প্রবর্তন করার কথা বল হয় এবং এতে কোন ছাত্র একই ক্লাশে পর পর দুইবার বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে উক্ত স্কুল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত হয় এবং অন্য কোন স্কুলেও ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে না। পর পর দুই বৎসর প্রবেশিকা অথবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্ররা যাতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পরীক্ষায় হাজির হতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। [১০৮]

শিক্ষা সংস্কার কার্যকরীকরণের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত কোন শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি দেশে শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, যে সকল সংস্কারের ফলে দেশে ছাত্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেই সকল ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাহা কার্যকরীর ব্যাপারে সরকারের একটু সুবিবেচনার পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষা সংস্কার খুবই জটিল ব্যাপার বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সমস্যাটি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ার কোন স্থান নেই। [১০৯]

১৯৫৯-৬০ সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে মহাবিদ্যালয় শিক্ষা

পশ্চিম পকিস্তান

পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচ ধরণের কলেজ ছিল, যথা-

১. উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ
২. মানবিক মহাবিদ্যালয় বা আর্ট কলেজ
৩. বিজ্ঞান কলেজ বা সায়েন্স কলেজ
৪. মানবিক ও বিজ্ঞান কলেজ এবং
৫. পেশাভিত্তিক কলেজ।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল অথবা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বিজ্ঞান এবং মানবিক শাখার জন্য উচ্চ শিক্ষার অংশ এবং এর সময়কাল দুই বৎসর। উভয় শাখায় পরীক্ষা পাশের পর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। আর্ট কলেজ অর্থ মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান কলেজ, অন্যদিকে বিজ্ঞান কলেজ অর্থ সাধারণ বিজ্ঞান। সরকারি কলেজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সরকার এবং বেসরকারি কলেজের নিয়ন্ত্রণ করে বেসরকারি সংস্থা। প্রাচ্য কলেজ (Oriental College) পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং ফাজিল ক্লাশ ছাড়াও উর্দু, পারসী ও আরবি ভাষার কোর্স পড়ান হতো। পূর্বে এটি আলাদা কলেজ হিসেবে ধরা হতে পরে ইহা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। [১১০]

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ১৯৫৯-৬০ সালে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ১১০টি। নিম্নের ৩৩নং সারণিতে লিঙ্গ অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দেখান হলো : [১১১]

সারণি-৭০

কলেজের ধরণ (Type of College)	মোট কলেজ	ছেলেদের	মেয়েদের
১. সরকারি কলেজ	৬৭	৫০	১৭
২. বেসরকারি কলেজ	৪৩	৩৪	৯
মোট=	১১০	৮৪	২৬

উপরের তালিকায় ছেলেদের কলেজ-মেয়েদের তুলনায় তিনগুণ। ৭৬ ভাগ কলেজ ছেলেদের এবং ২৪ ভাগ কলেজ মেয়েদের। সরকারি নিয়ন্ত্রণে ৬১ ভাগ এবং ৩৯ ভাগ বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সুযোগ সুবিধা বেশি ছিল। বেশ কিছু কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের সুযোগ ছিল। নিম্নের সারণি ৩৪ এ ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কলেজ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন লিঙ্গ অনুযায়ী দেখান হলো : [১১২]

সারণি-৭১

কলেজের ধরণ	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী
১. সরকারি কলেজ	৩২০৫৫ জন	২৬২৪১	৫৮১৪
২. বেসরকারি কলেজ	২৯১৬১ জন	২৬৮৯২	২২৬৯
মোট	৬১২১৬ জন	৫৩১৩৩	৪৩৮৩

উপরের তালিকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় ছেলে ৭ গুণ। অর্থাৎ ৮৭ ভাগ ছেলে এবং ১৩ ভাগ মেয়ে। সরকারি কলেজে মোট শিক্ষার্থীর ৫২ ভাগ শিক্ষার সুযোগ আছে। বাকী ৪৮ ভাগ বেসরকারি কলেজে পড়ে।

পূর্ব পাকিস্তানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (ঢাকা ও রাজশাহী) ১৭টি পেশাভিত্তিক কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৯৯টি। পূর্ববর্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৯৫টি, ১৭ পেশাভিত্তিক কলেজসহ। এইসময়ে ৪টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ৩টি ডিগ্রী কলেজ ও ১টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯৫৮-৫৯ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭৯৬ জন ছাত্রীসহ মোট ৫০৩৮১ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ ১৯৫৯-৬০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩২৬৮ জন ছাত্রীসহ মোট ৫৬২৮১ জন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ১৯৫৮-৫৯ সালে সরকারি ব্যয় হয় ১৭৯৭৪৬৭৪/- রুপি এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ১৬৫০৫৪০৩/- রুপি। [১১৩]

E:\Ansar\2011\3 doc 11-11-12.doc

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষা

পূর্ব পাকিস্তান

১৯৬২-৬৩ সালে সাধারণ শিক্ষার জন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এই দু'টি বিশ্ববিদ্যিালয়ের অধীন ৯৯টি কলেজ ছিল। এই কলেজের মধ্যে ৩১টি ইন্টারমিডিয়েট এবং বাকীগুলি ডিগ্রী কলেজ। এ ছাড়া আরও দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেমন-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোকৌশল বিশ্বদ্যালয় (East Pakistan Agriculture University and University of Engineering and Technology) ৫টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ৩টি জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ এবং ৪০টি প্রাথমিক ট্রেনিং ইনিষ্টিউট ছিল। ১৯৬১-৬২ সালে মেডিকেল কলেজ ছিল ৩টি এবং মেডিকেল স্কুল ছিল ৩টি কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে ৬টি মেডিকেল কলেজ ছিল অর্থাৎ ৩টি মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়।।[১১৪]

পশ্চিম পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি ছিল। নিম্নের সারণিতে ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কলেজের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হলো ঃ[১১৫]

সারণি-৭২

আইটেম	আর্ট এবং সায়েন্স কলেজ			পেশাভিত্তিক কলেজ		
	পুরুষ	মহিলো।	মোট	পুরুষ	মহিলো।	মোট
কলেজের সংখ্যা	১২০	৩৯	১৪৯	৩৭	৫	৪২
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৭৮১৫৭	১৫৫১১	৯৩৬৬৮	১৪৩০১	১২৫০২	১৬৮০৩
শিক্ষক সংখ্যা	৩৪৫০	৯৪৭	৪৩৯৭	৯২৯	১৫২	১০৮১
ব্যয় (হাজারে)	২৮০২৬০০০/-	৬০৯৪০০০/-	৩৪১২০০০০	১০৯৬৫০০০/-	১৫৫৫০০০/-	১২৫২০০০০/-

পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬২-৬৩ সালে সরকারি ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ছিল ৪৬টি এর মধ্যে মেয়েদের ১৪টি এবং ছেলেদের ৩২টি, বেসরকারি ৩৮টি মেয়েদের ৯টি ও ছেলেদের ২৯টি। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সরকারি ৩৯টি, ৬টি মেয়েদেরসহ এবং বেসরকারি মোট ৩৬টি ১০টি মেয়েদের এবং ২৬টি ছেলেদের। ডিগ্রী এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মোট সংখ্যা ১৫৯টি সরকারি ডিগ্রী কলেজে মোট ব্যয় হয় ১০৬১৯০০০/- রুপি এবং বেসরকারি ডিগ্রী কলেজে মোট ব্যয় ১৩০৩৫০০০/- রুপি, সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ব্যয় হয় ৮০৬০০০০/- রুপি, বেসরকারি কলেজে ৫৪০৬০০০/- রুপি।[১১৬] ১৯৬২-৬৩ সালে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট এবং সায়েন্স বিষয়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪৮৪ জন,

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩ জন, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫৯ জন, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৮৬ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লায়লপুরে ২০৯ জন, লাহোরের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ জন।[১১৭]

নিম্নের সারণিতে ১৯৬২-৬৩ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী বোর্ড এর ব্যয়ের চিত্র দেখান হলো ঃ [১১৮]

সারণি-৭৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট খরচ		ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী বোর্ড	মোট খরচ
পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়	১০৬২৯৭১২/-		পেশোয়ার বোর্ড	৮১৩৯৮৮/-
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৫২৪৮৪২/-		লাহোর বোর্ড	৬৯৮৩২২১/-
সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪২৯৮৩৩/-		হায়দারাবাদ বোর্ড	২৪০০০০/-
করাচী বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০১২৬০/-		করাচী বোর্ড	১৪৩৬৭৭০/-
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি	২৯৯৮৩৭৫/-		মোট-	৯৪৭৩৯৮৯/-
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ালপুর	৯৪৪৫২৭৩/-			
মোট-	৫০৭২৯২৯৫/-			

পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি ছিল এবং ব্যয়ের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

কলেজ শিক্ষা বিষয়ে ছাত্রদের দাবি

১৯৬৪ সালে ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ছাত্র সংগঠন কলেজ শিক্ষা সংক্রান্ত যে দাবি করে তা নিম্নরূপঃ

১. উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে গরীব, মেধাবী স্ব-উপার্জিত ছাত্র-ছাত্রীদের আই.এ, আই.এস.সি, আই.কম, বি.এ, বি.এসসি, বি.কম পড়ার জন্য নৈশ ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. প্রত্যেক কলেজে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৪. অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিতে হবে।

৫. বেসরকারি কলেজের টিউশন ফি কমাতে হবে এবং এই ফি এর পরিমাণ সরকারি কলেজের সমান হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিতে হবে এবং প্রত্যেক বছর পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবই পরিবর্তনের নীতি পরিহার করতে হবে। টেক্সটবুক বোর্ডের ব্যবসায়িক মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে এবং স্বল্পমূল্যে বই সরবরাহ করতে হবে।
৭. গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী মুক্ত পরিবেশে সরাসরি ছাত্র ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে এবং কলেজে সভা সমিতি করার অধিকার দিতে হবে।
৮. সকল বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি গঠিত হবে সরাসরি অভিভাবকদের ভোটের মাধ্যমে এবং সরকারি কোন কর্মকর্তা বেসরকারি কলেজের খবরদারি করতে পারবে না।
৯. সরকারি অনুদান প্রাপ্তির অযৌক্তিক শর্ত পরিহার করে কলেজের অনুমতি ও সাহায্য বাড়াতে হবে।
১০. ঢাকা শহরের কলেজসমূহ ছাড়াও প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় অন্তঃত একটি কলেজে পূর্ণাঙ্গ সম্মান কোর্স চালু করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম চালু করতে হবে।
১২. পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু কলেজের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কলেজের উন্নয়ন করতে হবে।
১৩. ইংরেজি ভাষার বই দ্রুত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরবরাহ করতে হবে।[১১৯]

ঢাকা ছাড়াও করাচী, লাহোর ও পেশোয়ারে ছাত্র আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬৪ সালের ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ছাত্র পুলিশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দেশের এই সংকটময় মূহুর্তে ছাত্রদের সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কলেজ শিক্ষা ও ১৯৬৬ সালে ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ সম্পর্কিত কমিশন রিপোর্ট

পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এফ. এ (F.A) এবং এফ.এস.সি (F.Sc) পর্যায় বা প্রবেশিকা পাশের পর ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির পর্যায় বলা হয়। মূলত: এই স্তরের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) এই পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করে এবং এটিকে একধাপ নামিয়ে মাধ্যমিক স্তরের সাথে সংযুক্তির সুপারিশ করে ও পৃথক এবং ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার সুপারিশ করে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করবে ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী বোর্ড। কিন্তু বর্তমান (১৯৬৬) কমিশন মনে করে পূর্বের (১৯৫৯) কমিশনের সুপারিশ সঠিক ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয়। তাই কমিশন ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়কে পৃথক করে ডিগ্রী কলেজের সাথে সংযুক্ত থাকবে তবে ভিন্ন প্রশাসনিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনায় দুইটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। বেসরকারি কলেজ এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজি ছিল না তারা এর সমালোচনা করে। ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ১৫৯টি এবং এই কলেজের মধ্যে ৮৩টি ছিল ডিগ্রী কলেজ। পূর্ব পাকিস্তানে মোট সাধারণ কলেজের সংখ্যা ছিল ৮৩টি এর মধ্যে ৬০টি ছিল ডিগ্রী কলেজ। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ডিগ্রী কলেজকে পৃথক করা সম্ভব হয়নি পূর্বের মতই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের অধীনে ছিল এবং একই কলেজের ডিগ্রী কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বলা যায় প্রত্যেকটি ডিগ্রী কলেজ দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ছিল। আয় (আর্থিক সুবিধা) কমে যাওয়ার আশংকায় বেসরকারি কলেজের পরিচালনাকারী এবং শিক্ষকরা কলেজকে দুইটি শাখায় বিভক্তির পক্ষে ছিল না। ১৯৬৩-৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী নিবন্ধন ছিল ৭২৮৫০ জন এবং ডিগ্রী পর্যায়ে ছিল ২০০০০ জন। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিবন্ধন ছিল মোট ৯৩৭৪৪ জন, ডিগ্রীর জন্য ছিল ২৫০২৪ জন। দুইটি শাখায় কলেজ বিভক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাই নয় অন্য একটি বড় কারণ ছিল শিক্ষক স্বল্পতা যার ফলে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। [১২০]

ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজকে দুই শাখায় বিভক্ত করার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। ৪৯টি সরকারি এবং ২৭টি বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে এই পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। তবে প্রত্যেক মহকুমা কলেজে বিভিন্ন কোর্স (Deversified Courses) প্রবর্তন যেমন- কর্মসচিব (Secretarial) প্রশিক্ষণ, সর্টহ্যান্ড, টাইপ রাইটিং এবং অন্যান্য পেশাভিত্তিক কোর্স সমূহ টেকনিক্যাল ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পর্যাপ্ত নয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৩-৬৪ সময়ে কোন সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল না। ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ মিলে ৬টি সরকারি কলেজ ছিল অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮৩টি সরকারি কলেজ। তাই কমিশন সুপারিশ করে যে,

১. পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চলমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা উচিত নয় কিন্তু যে সব উচ্চ মাধ্যমিক ইনস্টিটিউটে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে জাতীয় কমিশনের (১৯৫৯) বিভিন্ন ধরণের কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

২. **নতুন কলেজের ক্ষেত্রে**

(ক) নুতন ডিগ্রী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শাখা থাকা উচিত নয়।

(খ) নতুন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ডিগ্রী সেকশন থাকা বাঞ্চনীয় নয়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের চলমান কলেজ সমূহ দুই শাখা নীতি (Principle of bifurcation) গ্রহণ করা উচিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ইহা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে পুরুষ কলেজ ও প্রতি জেলায় একটি করে মহিলো। কলেজে ১৯৭৫ সালের মধ্যে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পূর্ব-পাকিস্তানে চলমান বেসরকারি কলেজ যা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সেইসব কলেজে এই পদ্ধতি প্রতি বছর ধাপে ধাপে চালু করতে হবে।

৫. একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি মহকুমায় একটি করে পুরুষ কলেজ এবং প্রতি জেলায় একটি করে মহিলো I কলেজ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকরী করতে হবে। [১২১]

ডিগ্রী কলেজ

পাকিস্তানের চলমান সকল ডিগ্রী কলেজই ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সাথে সংযুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তানে পেশাভিত্তিক কলেজ ছাড়াই ৮৭টি ডিগ্রী কলেজ ছিল এবং এই কলেজসমূহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ৬০টি ডিগ্রী কলেজ ছিল যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত। পূর্ব পাকিস্তানে অধিভুক্ত কলেজগুলিতে শুধুমাত্র বি.এ, বি.এস.সি এবং বি.কম. পর্যায়ের শিক্ষা দেয়া হতো এবং সামান্য কিছু কলেজে অনার্স পড়াব সুযোগ ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সময়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের হিসাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে ডিগ্রী কলেজে ছাত্র নিবন্ধন ছিল ২০০০০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫০২৪ জন। তাই কমিশন মনে করে যদি ইন্টারমিডিয়েট কোর্সকে ডিগ্রী কোর্স থেকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে চলমান কলেজে ডিগ্রী শ্রেণীতে পর্যাপ্ত ছাত্র ভর্তি হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ কিছু কলেজে বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলের কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ার সুযোগ আছে নির্বাচিত বিষয়ে। কমিশন সুপারিশ করে যে সব সরকারি কলেজে উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি আছে সেখানে নির্বাচিত কিছু বিষয় যেমন-বিজ্ঞান, অংক এবং অর্থনীতি বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ার সুযোগ থাকা উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব প্রস্তাব করেন যে, সরকারি কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা শুধুমাত্র একাডেমিক নয় এতে আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুবিধা আছে। কলেজে স্নাতকোত্তরের জন্য একজন ছাত্রের ব্যয় হয় ২০০ থেকে ৪০০ রুপি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় ২০০০ থেকে ২৫০০ রুপি।[১২২]

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের গুণগত মান-উন্নয়নের জন্য কমিশন সুপারিশ করে যে–

১. সরকারি কলেজের এক তহবিলের অর্থ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে (discontinued)।

২. সরকারি কলেজ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. ব্রেকেজ চার্জের (breakage charge)-এর সংগৃহীত অর্থ কোষাগারে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সরকারিভাবে হিসাব পরীক্ষা করে কলেজ অধ্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত অর্থের চাহিদা মেটাবে।

৪. কোন বিশেষ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বাধ্যবাধকতা আছে তা অপসারণ করতে হবে এবং কলেজের প্রধান যিনি এই অর্থ পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত তিনি নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় করতে পারবেন অন্য কোন কর্তপক্ষের অনুমতি ছাড়াই হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষে।

৫. যদি কোন শিক্ষক তিন বছরের বেশি সময় প্রেষণে নিয়োজিত থাকেন এবং তার লিয়েন মূল পদে না রাখতে চান এবং পর্যাপ্ত তহবিল থাকে তাহলে সাময়িক বাধ্যতামূলক অধিকার দেয়া যেতে পারে তা নাহলে তার পদ শূণ্য হবে এই মর্মে আইন তৈরি করতে হবে।

৬. সাময়িকভাবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে অনুমোদনের জন্য ছয় মাসের মধ্যে জানাতে হবে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলেজ বা বিভাগকে অবহিতোকরে ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিবেন।

৭. সরকারি কলেজের শিক্ষক, যারা গবেষণার মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জন করার অথবা বিদেশিবিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানসম্মত অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করবে তাদের চারটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে ।

৮. কলেজের ৫০ ভাগ শিক্ষকের কলেজ সংলগ্ন পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা দেওয়া হবে ।

৯. যে সকল শিক্ষক বাইরে অবস্থানে বাধ্য তাদেরকে অন্য সরকারি কর্মচারীর ন্যায় সাধারণ বাড়ি ভাড়া দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষগণ অভিযোগ করে যে পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় তারা বিশেষ ক্যাডার ভুক্ত নন। তারা শুধুমাত্র ১০০% রুপি বিশেষ ভর্তুকি পান বেতনের সাথে। তাই তারা প্রস্তাব করেন অধ্যক্ষের পদকে সিলেক্টশন গ্রেড দিতে হবে এবং চাকরী হিসেবে এটি তাদের যৌক্তিক দাবি যা পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে মেনে নেওয়া উচিত।[১২৩]

বেসরকারি কলেজ

খ্রিষ্টান মিশনারি পরিচালিত কলেজের চেয়ে বেসরকারি কলেজের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। শিক্ষক কম বেতন পেতেন, ভাল কাজের জন্য কোন ইনসেনটিভ ছিল না। চাকরীর কোন শর্তাবলী, কোন নিশ্চয়তা ছিল না। অথচ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং ছাত্র বেতন থেকে প্রচুর আয় হত। তাই কলেজগুলির ব্যাপারে সাধারণ অভিযোগ ছিল এগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশন করাচীতে বিভিন্ন কলেজ পরিদর্শন করেন এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইসলামিক কলেজ। একতলা বিশিষ্ট কলেজে কিন্ডার গার্টেন থেকে শুরু করে ডিগ্রী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো। এই কলেজের এক অংশে ক্লাশ রুম, ছোট লাইব্রেরী, কোন সাধারণ সুযোগ সুবিধা ছিল না। কমিশন কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ১০ একর জমি বরাদ্দের সুপারিশ করেন। এই কলেজটি পরিচালিত হতোইসলামিক শিক্ষা সমিতির দ্বারা । কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৭০০ জন। তিন শিফটে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় ক্লাশ

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হত। তবে এই অবস্থা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ছিল না। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতোএবং এই কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল প্রায় ৫০০০ জন। জগন্নাথ কলেজে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি এবং আবাসনের সুবিধা, খেলার মাঠ, হোস্টেল, কমিউনিটি সেন্টার, ক্যাফেটারিয়া, পড়ার কক্ষ, অভ্যন্তরীণ খেলার ঘর এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা ছিল। এর গ্রন্থাগার ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের এবং ভাড়ায় লাইব্রেরী পদ্ধতি চালু ছিল। কলেজে পর্যাপ্ত রিজার্ভ ফান্ড ছিল যা পরবর্তী উন্নতির জন্য যথেষ্ট। মোট স্টাফ সংখ্যা ছিল ৯৮ জর্ন অধ্যক্ষ ছাড়া তবে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ বেশীরভাগ শিক্ষক যোগ্য ছিলেন না অন্যান্য সরকারি কলেজের ন্যায়। অধ্যক্ষ নিজেই একজন সরকারি অফিসার ছিলেন যিনি প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন জেলা হেড কোয়ার্টারে অনেক কলেজ ছিল যেখানে কলেজ ভবন পর্যাপ্ত ও সাজসরঞ্জামাদিও যথেষ্ট ছিল কিন্তু কিছু বেসরকারি কলেজ যেমন, কায়েদে আজম কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মদনমোহন কলেজ, সিলেট এগুলির অপর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি দূর্বল ভবন এবং অযোগ্য স্টাফ দিয়ে পরিচালিত হত। বেশির ভাগ বেসরকারি কলেজে দুইটি শিফট ছিল সকাল ও সন্ধ্যায়। তবে কমিশন মনে করে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি কলেজের অবস্থা ভাল ছিল।

প্রতিটি কলেজে একটি গভর্নিং বডি ছিল এবং এর চেয়ারম্যান হবে কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার। বড় প্রতিষ্ঠান সমূহের (Larger institutions) সভাপতিত্ব করেন কমিশনারগণ। গভর্নিং বডিতে সরকারের অন্যান্য প্রতিনিধি (Nominee) এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিনিধি থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে নয় সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডি থাকবে যেখানে কলেজ অধ্যক্ষ সচিব হিসেবে এবং ডেপুটি কমিশনারের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখভালের কর্তৃত্ব (effective supervisory agency) রয়েছে। কমিশন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্য করণের প্রভাব খুব প্রকট নয় যদিও বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের বেতন কাঠামো খুবই সামান্য ও তাদের চাকরীর নিরাপত্তাও খুব সামান্য। তবে কমিশন মনে করে এটা বলা যাবে না যে, এর সকল প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র 'সম্মানের খাতিরে' (Purposes of Prestige) এবং যথাযথ প্রয়োজন ছাড়াই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে অতীতে কলেজগুলি জাতীয় উন্নয়নে যে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল বর্তমানে তার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় কমিশন সুপারিশ করে যে,

১. বেসরকারি কলেজের ব্যয় ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রান্টস ইন এইড সরবরাহ করা হবে, এই ব্যাপারে নীতিগত কোন পরিবর্তন হবে না।

২. নিম্নোক্ত কলেজগুলির অনুমোদন (Affiliation) নিম্নের শর্তাধীনে দেওয়া হবে–

ক) তাদের একটি গভর্নিং বডি থাকবে যার চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবে কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার/ তাদের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়/ ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড যে কোন একটির ২ জন প্রতিনিধি থাকবে, সরকারের দু'জন প্রতিনিধি, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ২ জন প্রতিনিধি এবং ২ জন প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সভার সদস্য থাকবেন। কলেজের অধ্যক্ষ থাকবেন সদস্য সচিব হিসেবে ।

খ) স্টাফদের/কর্মচারীদের জন্য তারা চাকুরির মানসম্মত অবস্থা (Conditions) সৃষ্টি করবে।

গ) তারা স্টাফ ও শিক্ষকদের সরকারি কলেজের সমমান অনুযায়ী বেতন ভাতাদি (pay) প্রদান করবেন।

৩. বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের জন্য বিশেষ ক্যাডার থাকবে এবং এই অধ্যক্ষকে নিয়োগ করবে একটি কমিটি যে কমিটিতে থাকবে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচালক পাবলিক ইন্সট্রাকশন, আঞ্চলিক (Regional) পরিচালক, শিক্ষা, গভর্নিং বডির একজন প্রতিনিধি, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের/ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট একজন শিক্ষাবিদ যিনি সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত নয়-এদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিং বডি।

৪. একটি ছোট কমিটি থাকবে যেখানে স্থানীয় শিক্ষা পরিচালক চেয়ারম্যান হিসেবে এবং ৪ জন অধ্যক্ষ থাকবে যারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধ্যক্ষগণ দ্বারা নির্বাচিত।

ক) কর্মচারীদের ব্যাপারে সকল আবেদন গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

খ) কমিটির সাথে আলাপ করে সকল বেসরকারি কলেজে গ্রান্টস-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজকে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী।

৬. যদি পৃথক শিফ্‌ট-এর জন্য আলাদা স্টাফ না থাকে তবে কোন কলেজে দ্বৈত শিফট চালু করা যাবে না। তবে উল্লেখ থাকে যে, কমিটির বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সপ্তাহে ২দিন ২টি ক্লাশ হতে পারে অথবা প্রতিদিন একটি করে সপ্তাহে ৪ দিন।[১২৪]

বেতন সমতা ও বেতনহ্রাস

কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করে যে ৫০ থেকে ৪০ ভাগ ছাত্র বেতন কমানোর দাবির কোন যৌক্তিকতা আছে। ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কলেজে সাধারণত ফিসের হার ১০ থেকে ২০ রুপি। এই ফিস বেশি নয়। তবে সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন বেশি। তাই কমিশন মনে করে সকল বেসরকারি কলেজ ও অধিভুক্তকরণকারী প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তির পূর্বে কলেজের ছাত্র বেতনের সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর দেবে। শিক্ষক এবং ছাত্র যারা আসবে তারা এই দাবি মেনে নেবে। করাচীতে টিউশন ফি বেশি নয়, সেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য ফি ও চার্জ সম্বন্ধে অবহিত। সেখানে অভিযোগ ছিল যে পৃথক

Dhaka University Institutional Repository

ফি নিয়ে কোন অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। যেমন মেডিকেল ফি নেওয়া হয় কিন্তু সেখানে কোন মেডিকেল সুবিধা নেই। একইভাবে ইউনিয়ন ফি নেওয়া হয় কিন্তু ছাত্রদের সামান্যতম কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। তাই কমিশনের সুপারিশ ছিল যে, এই সকল বিষয় সরকারি সংস্থা দেখে একটি নির্দিষ্ট ফি ধার্য করবে। তবে এ সকল অভিযোগ সরকারি কলেজ থেকেও পাওয়া যায়। করাচী কলেজের ফি সাবেক পাঞ্জাবের চেয়েও কম ছিল। তাই এই বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সরকার একটি মানসম্মত ফি পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি কলেজ সমূহে ধার্য করবে।[১২৫]

পাঠ্য-পুস্তক

ছাত্রদের দাবি ছিল সস্তায় এবং উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের টেক্সট বুক বোর্ড একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য শুধুমাত্র ভাষার পাঠ্যবই (Language text Books) অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বই প্রস্তুত (Prepared) করে টেক্সবুক বোর্ড। পূর্ব পাকিস্তানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বই নির্বাচন করে ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড। অন্যান্য বিষয়ের টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্যবই নির্বাচন করে যা মানসম্মত নয় কিন্তু বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ভাষায় চয়নিকা বা সংকলিত গ্রন্থ (anthologies) প্রস্তুত করে কিন্তু প্রথম ডিগ্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের বিদেশিবই এবং কিছু স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত হতোএমন বই নির্বাচন করে। একই অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্যমান ছিল। বিদেশি বই সহজসাধ্য ছিল না এবং এর মূল্যও বেশি ছিল ফলে কলেজ গ্রন্থগারে বেশি বই থাকত না। তবে স্বাধীনতার পর (১৯৪৭) কিছু লাইব্রেরী উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু বই পেয়েছিল। তাছাড়া সরকারি কলেজের লাইব্রেরীর জন্যও বরাদ্দ ছিল অল্প। তাই কমিশন মনে করে ছাত্রদের দাবি যৌক্তিক এবং এই সমস্য সমাধানের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করে–

১. কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক দ্বারা গঠিত কমিটি যতদূর সম্ভব পাঠ্যপুস্তক তৈরি করবে। বিদেশিবই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পড়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

২. ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর বই প্রকাশের জন্য টেক্সটবুক বোর্ডকে দায়িত্ব দিতে হবে।

৩. প্রথম ডিগ্রী এবং উচ্চতর কোর্সের জন্য পাঠ্য বই প্রস্তুত করবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের নিজস্ব প্রকাশনা থেকে বই প্রকাশ করবে।

৪. পাঠ্যবই এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যাতে উহা উন্নতমানের ও বইয়ের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

৫. প্রত্যেক কলেজ লাইব্রেরিতে নির্দেশিত বইয়ের কমপক্ষে ১০ কপি থাকবে।

৬. প্রত্যেক কলেজে ভাড়ায় লাইব্রেরি সিস্টেম থাকবে, পাঠ্যবইয়ের জন্য যেখান থেকে ছাত্ররা কিছু ফি দিয়ে কিছু সময়ের বা একাডেমিক বছর পর্যন্ত বই ধার নিবে। কোন ছাত্র যদি বই জমা না দেয় তবে সে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে না।
৭. প্রত্যেক কলেজ সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য সমব্যয়ের ভিত্তিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হবে।[১২৬]

বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি

ছাত্রদের দাবি ছিল বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি গঠিত হবে অভিভাবকদের প্রতিনিধি দ্বারা যেসব প্রতিনিধি সরাসরি অভিভাবকদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং এই গভর্নিং বড়িতে কোন সরকারি কর্মকর্তা জড়িত হতে পারবেন না। কিন্তু কমিশন ছাত্রদের মতের সাথে একমত হতে পারেননি কারণ কমিশন মনে করে বেসরকারি কলেজের বাণিজ্যিকীকরণ (commercialization) প্রশমনের জন্য সরকারি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এই বাণিজ্যিকরণ প্রশমিত হয় এবং সরকারি অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। কমিশনের মতে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ীই গভর্নিং বডি গঠিত হবে। এটি ৯ থেকে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হবে। কমিশনার/ উপকমিশানার/ একজন কর্মকর্তা যিনি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত তিনি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হবেন এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ হবেন সদস্য সচিব। অন্য সদস্যদের ভেতর ২ জন হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রতিনিধি এবং ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে মনোনীত হবেন, ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে থেকে স্টাডি বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের মধ্য থেকে; এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং দুইজন অভিভাবকদের ভেতর থেকে। আর সদস্য সংখ্যা ১১ জন হলে কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক এবং অভিভাবকদের ভেতর থেকে যিনি বড় অংকের অর্থ সাহায্য করে থাকেন তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে কমিশন অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যাপারে একমত নয়। কারণ হিসেবে কমিশন মনে করে প্রথমত: এটি ব্যয় বহুল, দ্বিতীয়ত: নির্বাচনের মাধ্যমে সবসময় সঠিক ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারে না। অভিভাবকদের হতে হবে বুদ্ধিমান এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আলোকিত ব্যক্তিত্ব। [১২৭]

শিক্ষক বেতন : ১৯৫৮ ও ১৯৬৪ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে কলেজ শিক্ষকদের বেতনের তারতম্য নিম্নের সারণিতে দেখান হলো:[১২৮]

সারণি-৭৪

পদবী	১৯৫৮ Rs	১৯৬৪ Rs
১. রিজিওনাল ডিরেক্টর	১৭৭০ (Fixed)	২০০০-২২০০
২. প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র শিক্ষক	৬০০-১১৫০	৭৫০-১৫০০

৩. সিনিয়র গ্রেড	১২৫০ (Fixed)	১৬০০ (Fixed)
৪. প্রথম শ্রেণীর জুনিয়র শিক্ষক	৩৫০-৮৫০	৪৫০-১০০০
৫. লেকচারার দ্বিতীয় শ্রেণী	২৫০-৭৫০	৩৫০-৯২৫
৬. সিলেকশন গ্রেড	-	২৩০০-২৬০০

পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কলেজের শিক্ষক ও সরকারি চাকুরিজীবীদের ১৯৬৪ সালে যে বেতন পেতেন তা নিম্নের সারণি (ক. খ.) তে দেখানূ হলো: [১২৯]

সারণি-৭৫, ক.

পদবী		১৯৬৪ Rs
১. সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস প্রিন্সিপ্যাল		৫০০-১৪৫০ Grade Plus Special ১০০/- রুপি
২. প্রফেসর (জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস)		৪০০-১১০০
৩. শিক্ষক জুনিয়র স্কেল		৩৭৫-৭৫০

বেসরকারি কলেজে বিশেষভাবে মানসম্মত কোন বেতন স্কেল ছিল না।

সারণি-৭৫ খ.

পদবী		১৯৬৪ Rs
১. পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও ফরেন সার্ভিস এর সিনিয়র স্কেল	ঃ	৮৫০-৭৫-১৪৫০-১০০-১৬৫০
২. প্রথম শ্রেণীর চাকুরি এবং অন্যান্য পি.এস.পি এবং পি.এফ.এস. (সেকশন অফিসার ব্যতীত) সিনিয়র স্কেল	ঃ	৭৫০-৭৫-১৫০০ Plus টেকনিক্যাল বেতন ১০০/- রুপি
৩. পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও ফরেন সার্ভিস জুনিয়র স্কেল	ঃ	৫০০-৫০-১০০০
৪. প্রথম শ্রেণীর চাকুরি সেকশন অফিসারসহ এবং অন্যান্য সি.এস.পি এবং পি.এফ.এস জুনিয়র স্কেল	ঃ	৪৫০-৫০-১০০০টেকনিক্যাল পে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল সার্ভিস পদের জন্য।
৫. দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার		৩৫০-৩৫-৫২৫-EB-৪০-৯২৫

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭-৪৮ পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। কিন্তু ১৭ বৎসরে অবাস্তব, অযৌক্তিক শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার মান নিচে নেমে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে সকল স্তরে শিক্ষার অগ্রগতির চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। এই জন্য মূলতঃ সরকারের একপক্ষীয় নীতিই দায়ি ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৬৯০০০ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ১৭ লাখের বেশি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশিকা পাশের সংখ্যা ৪৭১৭৫ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৪৮১৮১১ জন। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ মাধ্যমিকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৫২৭৯৩ জনে দাড়ায় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৯০২৩৩৭১ জনে। পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা কমে ৩২.৩% এবং গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা দাড়ায় ২৮,০৭০ জন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ১০ বছর পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৪১৪৮০ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২১.৩% এবং গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা ৫৪ হাজার। ১০ বৎসর পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার। পূর্ব পাকিস্তানে স্নাতকোত্তরের সংখ্যা কমেছে ১২% এবং বর্তমানে এই সংখ্যা ৭১৪৬ জন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৬৮.৬% প্রতিবছর এবং বর্তমানে এর সংখ্যা ২৪৩২৪ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর স্তরে নারী শিক্ষাও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১২১৭৬ ও ৩৪ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ছিল ৭০৫৫ জন এবং ২৭৪৯ জন। [১৩০]

পুস্তক প্রকাশনা অর্ডিন্যান্সের বৈধতা প্রশ্নে প্রাদেশিক সরকারের উপর হাইকোর্টের রুল জারি

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রাদেশিক সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে যে, সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিদেশিবই প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এই অর্ডিন্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তক প্রকাশক জনাব রুহুল আমিন নিজামী তার নিকট মজুদকৃত বিদেশিবইয়ের সংখ্যা সমন্বয়ে সরকারের নিকট এক বিবরণ দাখিল করেন এবং সরকারের নিকট মজুদকৃত বই বিক্রয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রাদেশিক সরকার ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে উক্ত প্রার্থনা না মঞ্জুর করেন। পুস্তক প্রকাশক ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চে পূর্ব-পাকিস্তান পুস্তক প্রকাশনা (নিয়ন্ত্রণও পরিচালনা) অর্ডিন্যান্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রীট আবেদন পেশ করেন। আবেদনকারী অভিযোগ করেন যে, পুস্তক প্রকাশনা স্বত্ব সম্পর্কিত বিষয় (কপিরাইট) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত। সেই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কপিরাইটের ভিত্তিতে চালিত ব্যবসায় প্রাদেশিক সরকার কোন প্রাদেশিক আইনের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করতে পারে না। উপরোক্ত আইন মজুদকৃত পুস্তকের বিক্রয় বা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিধান না থাকায় উহা অবৈধ ও সাধারণ ন্যায়নীতির পরিপন্থী এছাড়া আইন সঙ্গতভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বিদেশি পুস্তক ব্যবসা চালিয়ে যেতে আবেদনকারীকে সরকার অনুমতি প্রদান না করে বেআইনি কাজ করেছেন। প্রধান বিচারপতি জনাব মোরশেদ ও বিচারপতি জনাব আব্দুল্লাহ আবেদনকারীর অভিযোগসমূহ যুক্তিসঙ্গত মনে করে প্রাদেশিক সরকার এবং এর বিরোধীতাকারীদের উপর কারণ দর্শানোর জন্য একটি রুল জারি করেন। সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ এইমর্মে কারণ দর্শাতে বলেন যে, উপরোক্ত অডিন্যান্সকে কেন অবৈধও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করা হবে না ঐ বেঞ্চ এই মর্মে আরো কারণ দর্শাতে বলেন যে, কেন আবেদনকারী জনাব রুহুল আমিন নিজামীকে উপরোক্ত আইন কার্যকরী করার সময় তার নিকট মজুদকৃত বিদেশি পুস্তক বিক্রয় করতে দেওয়া হবে না। [১৩১]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে শিক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত

৩০ আগস্ট ১৯৬৭ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের তিনদিন ব্যাপী বৈঠকের সমাপ্তি দিবসে দেশের উভয় অংশের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এ সকল পরিকল্পনার মধ্যে ট্রেনিং ও কোচিং সেন্টার স্থাপন, ৫০টি নতুন হাইস্কুল চালু, চলমান ২০ হাজার প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়ন সাধন, পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০টি হাইস্কুলে হোস্টেল নির্মাণ ও করাচীস্থ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ইনস্টিটিউটের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। পূর্ব পাকিস্তানে কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে কমিটি কতিপয় পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫টি পেশাগত ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে বরিশাল, বগুড়া, রংপুর পাবনা ও সিলেটে ৫টি কারিগরি ইন্সস্টিউটকে পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। টেকনিক্যাল ইন্সস্টিটিউটের শিক্ষকদের ট্রেনিং দানের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা বৈঠকে অনুমোদন করা হয়। [১৩২]

নতুন শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব ১৯৬৯ ও কলেজ শিক্ষা

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫০০ এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫টি। পূর্ব পাকিস্তানের ৯০ ভাগ কলেজই বেসরকারি অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৫০:৫০। কমিশন সুপারিশ করে চলমান কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা (Consolidation) এবং সম্প্রসারণ। কোন নতুন সরকারি কলেজ বা প্রাইভেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। চলমান কলেজের সম্প্রসাণের জন্য বেশি করে ভবন নির্মাণ, উন্নততর সরঞ্জামাদি, কর্মশালা এবং গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। [১৩৩]

বিকেন্দ্রীকরণ

কমিশন সুপারিশ করে নতুন নীতি অনুযায়ী সকল কলেজের প্রশাসনিক বিষয়কে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং প্রত্যেক কলেজ হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কলেজের গভর্নিং বডি গঠিত হবে। নিম্নে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের তালিকা দেওয়া হলো: [১৩৪]

সরকারি কলেজ	বেসরকারি কলেজ
১-২. চেয়ারম্যানসহ সরকার মনোনীত দুইজন সদস্য। ৩. অভিভাবক প্রতিনিধি।	১-৩. চেয়ারম্যানসহ প্রতিষ্ঠাতা দাতা/অভিভাবকদের তিনজন প্রতিনিধি। ৪. সরকারি প্রতিনিধি।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পুরাতন ছাত্রদের প্রতিনিধি।		৫. অধিভুক্তকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত প্রতিনিধি।
৫.অধিভুক্তকরণ বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত প্রতিনিধি।		৬. ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ।
৬. ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ।		৭. ডীন, কলা অনুষদ।
৭. ডীন, কলা অনুষদ।		৮. অধ্যক্ষ, সদস্য বা সচিব।
৮. অধ্যক্ষ, সদস্য বা সচিব।		

এই গভর্নিং বডি কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্ব বিশেষকরে অনুমোদিত গ্রান্টস এর বিপরীতে ব্যয় করার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করবে।

বেসরকারি কলেজ প্রাদেশিকরণ

কমিশনের মতে, বেশিরভাগ বেসরকারি কলেজে সামান্য সুযোগ-সুবিধা, স্বল্প বেতন, যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ রয়েছে। তাই আইন করে যোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, চাকুরির নিশ্চয়তা ও সরকারি কলেজের ন্যায় তুলনামূলক ভাল বেতন দিতে হবে। বেসরকারি কলেজে সরকারি সাহায্য ৭০ ভাগ বাড়াতে হবে এবং এগুলিকে প্রাদেশিকরণ করতে হবে। সরকারি এবং বেসকারি কলেজের দেখাশুনার দায়িত্ব থাকবে ডিরেক্টর অব কলেজ এডুকেশনের উপর, যার প্রধান হবেন ডিরেক্টর জেনারেল। ডিরেক্টরেট, কলেজের সমস্ত দায়িত্ব, সমন্বয় নীতি, পর্যালোচনা, হিসাব নিরীক্ষা মোটের উপর সব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে। পশ্চিম পাকিস্তানে রিজিওনাল অথরিটি ফর কলেজ এডুকেশন (Regional Authorities for college education) এবং পূর্ব পাকিস্তানে ডিভিশনাল অথরেটিস (Divisional Authorities) রাজ্য/বিভাগীয় কলেজ কর্তৃপক্ষ আইন ও নিয়মমাফিক কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগদানে বাধ্য থাকবেন। সরকারি কলেজের সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষক একই সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা ও বেতন পাবেন। তাদের বেতন নির্ধারিত হবে যোগ্যতা, মেধা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। সকল কলেজে তিন ধরনের শিক্ষক থাকবেন যেমন–অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকও সহকারী অধ্যাপক।[১৩]

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদেশের ভাইস চ্যান্সেলরদের নিকট সার্কুলার প্রেরণ

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় বাংলা বোর্ড প্রকাশিত পুস্তক সমূহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অধ্যক্ষগণকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বোর্ডের চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুল মওদুদ পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের নিকট একটি সার্কুলার প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য যে শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরিবিদ্যা বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড এবং রেফারেন্স পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্যই পাকিস্তান সরকার বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। বোর্ড এ যাবৎ রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, অর্থনীতি, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চাশটির অধিক পুস্তক প্রকাশ করে। চলমান সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের পঁয়ত্রিশটি পুস্তক ঢাকায় বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত হচ্ছে। প্রায় একশত পুস্তক লেখকদের রচনাধীন। বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত অথবা রচনাধীন পুস্তক সমূহের অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মন্ডলী দ্বারা রচিত বা তাঁদের সহযোগিতায় রচনা করা হয়েছে অথবা তাদের সহযোগিতায় লিখিত। তাই বোর্ড আস্থা প্রকাশ করে যে, এই প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার উচ্চ স্তরে বর্তমান প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যমের স্থলে বাংলা মাধ্যম পবর্তন করা সহজ হবে। [১৩৬]

নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ

প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা চারঘণ্টাব্যাপী এক বিশেষ অধিবেশনে নয়া শিক্ষানীতির সংশোধিত খসড়া বিবেচনার পর উহার আরও বিস্তারিত পরীক্ষা পর্যালোচনা জন্য শিক্ষামন্ত্রী, প্রাদেশিক গভর্নরদের ও প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কেবিনেটের ঢাকা অধিবেশনেই নয়া শিক্ষানীতি অনুমোদিত হবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রিসভা তাড়াতাড়ি কিছু না করে বিষয়টির সকল দিক আরও বিস্তারিতভাবে বিচার বিশ্লেষনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কোন বিশেষ সময় বা পরিবেশ একটি বিষয়কে কিভাবে গ্রহণ করবে তার উপর উহার ভাল মন্দের বিচার নির্ভর করে। যে কাজটি কোন একটি বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে উত্তম বলে বিবেচিত হয় । সেই কাজটিই ভিন্ন সময়ে বা পরিবেশে বিবেচিত হয় ভিন্নরূপ। তাই ভাল বলে বিবেচিত কোন কাজ করতে গিয়ে পারিপার্শিকতার বিবেচনায় কখনো এক পা এগিয়ে আবার দুই পা পিছাতে হয়। শিক্ষানীতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু গত জুলাই (১৯৬৯) মাসে শিক্ষানীতি প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পর যে অবাঞ্চিত বিতর্ক, বাদানুবাদ, এমনকি শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্তক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শিক্ষানীতির আমুল সংস্কারের মত একটা বিরাট কাজে হাত দিয়ে যদি আবার বিতর্ক, বাদানুবাদ ও বিতণ্ডার সম্মুখীন হতে হয়, পুনরায় যদি চাপাপড়া উত্তেজনা আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে, আবার এই ইস্যুতে উত্তাপ ও ভাবাবেগের বাষ্প চারদিকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে

Dhaka University Institutional Repository

সময়টা অতিমাত্রায় নাজুক। তাই শিক্ষানীতি ইস্যুও নাজুক। যারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সাফল্যজনকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধী, সংখ্যায় যতই ক্ষুদ্র হোক, তারা তাদের নিগূঢ় অভিসন্ধি সাধনের এই নাজুক ইস্যু ও সময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনা ভবিষ্যত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের জন্য রেখে দেওয়ার স্বপক্ষে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'পিন্ডিতে' অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাবিদ সম্মেলনেই এই মর্মে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পরবর্তী সিভিলিয়ান সরকারের জন্য স্থগিত রাখতে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন চতুর্থ প্লানের পরিধি ও প্রকৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই প্লান আবার নির্ভর করবে নতুন শাসনতন্ত্রের দেশের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের উপর। যেগুলি সবই এখনও অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত। অতএব চতুর্থ প্লান তথা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নই যেক্ষেত্রে এখন অনিশ্চিত সেক্ষেত্রে বর্ণিত বারশত কোটি টাকার নতুন শিক্ষানীতি প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া অনেকটাই ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ারই শামিল। তবে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান সরকার দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ করলে তাহা সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হবে এবং উহা ভবিষ্যতে শিক্ষা সংস্কারের প্যাটার্ণ হিসেবে ও পরবর্তী জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের সম্মুখীন থেকে যাবে।[১৩৭]

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা, ছাত্র নিবন্ধন শিক্ষক ব্যয়ের চিত্র দেখান হলো : [১৩৮]

সারণি-৭৬

বৎসর	কলেজের সংখ্যা	ছাত্র নিবন্ধন	শিক্ষক	মোট খরচ	সরকারি
১৯৪৭-৪৮	২০	----	----	৬৩৩২০৭	২৯৯৫৭৪
১৯৪৮-৪৯	২০	----	----	৫০২১৩৯	১৮৩৬৩৪
১৯৪৯-৫০	২২	২৬৮৯	----	৫৫৪৪৬২	১৭১৫২৪
১৯৫০-৫১	২৩	১৯৯৬	----	৩৪২৭৪৮	১৭৬৪৯৬
১৯৫১-৫২	২৮	২৮৮০	----	৬৩৪৩১৬	২১৪২৭৭
১৯৬৫-৫৩	২৮	৩২৩১	----	৬২৯৪৯১	২১৮৮২৯
১৯৫৩-৫৪	২৮	৩৫৬০	----	৬৭৮১০৮	১৯৬২৬২
১৯৫৪-৫৫	২৮	৩৫১৫	----	৭১৯৮৫০	২২৪৯৯০
১৯৫৫-৫৬	২৯	৩৬১১	----	৭৫৫৬৫৭	৩০৭১১০
১৯৫৬-৫৭	২৬	৩৮৭৫	----	৭৮৭৭৯৫	২৭১৯২৬
১৯৫৭-৫৮	৩৭	৬৭১৯	----	১৩২৬৯৬৬	৬৫০৮৩৪
১৯৫৭-৫৯	২৮	৪৯২৫	----	২০৫৯৬০০	১১৯৮২৯৬
১৯৫৯-৬০	২৯	৪৫২০	----	১০৪২০৩৪	৩১৬৪৬৪
১৯৬০-৬১	২১	৩৫৮৩	১৮২	৬৬৭২৭৮	২৫৫৩৭১
১৯৬১-৬২	২৭	৫৮৮০	২৮৮	১০৫৪০১৩	৩৪৯৮১৭
১৯৬২-৬৩	৩১	১০৫৩৮	৩৩১	১৯৪৮১১৪	৮৭২৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩-৬৪	৩৭	১০৮৮০	৩৯৯	৩৭৪৫৬৯৯	১৩৮৭৮৭৪
১৯৬৪-৬৫	৫৭	১৫০৮৬	৬৩৫	২৭২৯৭৮৪	৫৩২১৩৮
১৯৬৫-৬৬	৬৫	১৭৬৯৭	৬৮৩	৫৩৫৭১১৬	৪৩৪৯৬৫
১৯৬৬-৬৭	৭১	২০৭৩৫	৭৭৫	৫২৪৩১১৬	১৭২৭০৯০
১৯৬৭-৬৮	১০৮	৩১৩৪৫	১১৩৪	৫৮০৭২৯২	১৮২৮০৪৪
১৯৬৮-৬৯	১৪৩	৪২০০০	১৪৫০	৭০০০০০০	২০০০০০০
১৯৬৯-৭০	১৫০	৪৫০০০	১৫৫০	৭৫০০০০	২১০০০০০

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ছাত্র নিবন্ধন শিক্ষক ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হলো : [১৩৯]

সারণি-৭৭

বৎসর	কলেজের সংখ্যা	ছাত্র নিবন্ধন ইন্টারমিডিয়েটসহ	শিক্ষক সংখ্যা	মোট খরচ Rs	সরকারি ব্যয় Rs
১৯৪৭-৪৮	৩১	----	----	২০৯৪৫৬৯	৭৯৩০৩৯
১৯৪৮-৪৯	৩২	----	----	২৮২১১৯১৯	১২৪৯৩২৩
১৯৪৯-৫০	৩৫	১৮৯১৫	----	৩১৯২৩৫২	১৫৫৬৪৪০
১৯৫০-৫১	৩৬	১৬০৭৯	----	৩৩৬৩৭১২	১৭২২৫৮৯
১৯৫১-৫২	৩৭	১৫৯৪১	----	৩৬৩২৯১৯	১৯০৪৪২৬
১৯৬৫-৫৩	৪২	১৮৫৯৬	----	৪২২৩৭২৭	১৯৩৩৩৩৮
১৯৫৩-৫৪	৪২	১৯৭১৩	----	৪১৩৯৯৭৮	১৮৭০৮২১
১৯৫৪-৫৫	৪০	১৯০৬৯	----	৪২১৪৩৩৭	১৭৫৮১৭৯
১৯৫৫-৫৬	৪০	১৯৯৯৬	----	৪২৫৮১৭৩	২০৩১১৬১
১৯৫৬-৫৭	৪০	২৫৬২৮	----	৪৮৯৯২৫৯	২১৬২০২৪
১৯৫৭-৫৮	৪২	৩০৭৪৩	----	৫৫১৯৭৬৩	২৬১০৭৫৫
১৯৫৭-৫৯	৫০	৩৮৮৬২	----	৬৫২৪৯২৫	৩২১৪১০০
১৯৫৯-৬০	৫৩	৪৬২৯৪	----	৬৫০১৩১৬	২৮২৩৩৩৩
১৯৬০-৬১	৬০	৪৮৬৫১	১৪৮৮	৮৩৪০৩৫৮	৩০২৭৮৫৫
১৯৬১-৬২	৫৯	৫৮০৭৫	১৬০৯	১০৪১৬৭৮৮	৩৯৩৮৮৫৬
১৯৬২-৬৩	৬৪	৬৬৬৬৪	১৭৭৮	১১১২০৬১৭	৪৪৬১৯২২
১৯৬৩-৬৪	৭৬	৮৬৪৬৭	২০৮৩	১৪৫৫৭৪৩৯	৫৯৮৯৫৭৮
১৯৬৪-৬৫	৮৪	৯৬৭৪৬	২৪২৬	১৭৩৯৩৮৮৪	৫৫৬৫০৭৯
১৯৬৫-৬৬	৯০	১০৭৬০৭	২৭৭২	১৯৪৪৬১৮৭	৩৮৬৮২৬৩
১৯৬৬-৬৭	১০১	১২৪৩৫২	৩২৭৬	২৫৭৩৭৫৫৫	৮৯৬৫৪৬৭
১৯৬৭-৬৮	১০৭	১৪৯৬০৭	৩৪৪৯	৩১০০৫৭৮৫	১০৩৫১০৬৮
১৯৬৮-৬৯	১২৮	১৮৫০০০	৪০০০	৩৭৫০০০০০	১২০০০০০০
১৯৬৯-৭০	১৩৬	২১০০০০	৪২০০	৪০০০০০০০	১২৫০০০০০

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে ১৯৬৮ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল এবং যে কোর্স পড়ানো হতোতার তালিকা দেওয়া হলো : [১৪০]

সারণি-৭৮

কলেজের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	কোর্স অব স্ট্যাডি
১. সরকারি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা।	১৯২৩	এইচ.এস.সি (Humanities Islamic Studies and Education Group)
২. ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা	১৯৬১	এইচ.এস.সি (Science)
৩. সরকারি ইন্টারমিডিয়েট মহিলো । কলেজ: বকসী বাজার, ঢাকা	জুলাই-১৯৬৪	এইচ.এস.সি (Humanities and Science)
৪. ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, চট্টগ্রাম	১৯২৭	এইচ.এস.সি (Humanities and Science)
৫. সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, চট্টগ্রাম	১৯৬৭	এইচ.এস.সি (Humanities)
৬. এম.সি. ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, সিলেট	১৯৬৬	এইচ.এস.সি (Humanities,Science and commerce)
৭. সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, রাজশাহী	জুলাই-১৯৬৬	এইচ.এস.সি (Humanities,Science and commerce)

বি:দ্র:- ১ ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৪ সালে। এই মাদ্রাসা নিউ স্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয় ১৯১৫ সালে। এই প্রতিষ্ঠানকে উন্নীত করে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত করা হয় ১৯২৩ সালে।

বি: দ্র: ২ সরকারি টেকনিক্যাল হাইস্কুল, তেজগাঁও, ঢাকা। এটিকে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট টেকনিকাল কলেজে রূপান্তরিত করা হয় ১৯৬১ সালে।

নিম্নের সারণিতে ১৯৬৮ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ডিগী কলেজের নাম, প্রতিষ্ঠাকাল ও পঠিত বিষয়ের উল্লেখ করা হলো: [১৪১]

সারণি-৭৯

কলেজের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	কোস অব স্ট্যাডি অফার্ড
১. চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগাম	১৮৬৯	এইচ.এস.সি (মানবিক ও বিজ্ঞান) বি.এ, বি.এস.সি এব অনার্স কোর্স বাংলা, ইরেজি, অথনীতি, রসায়ন, পদার্থ এব গণিত।
২. সরকারি কমার্স কলেজ	১৯৪৭	এইচ.এস.সি (বাণিজ্য), বি.কম এবং বি.কম.অনার্স
৩. সরকারি কলেজ, সিলেট	১৮৯২	বি.এ, বি.এস.সি, এবং অনার্স কোর্স রসায়ন, অর্থনীতি এবং গণিত।
৪. ঢাকা কলেজ, ঢাকা	১৮৪১	এইচ.এস.সি (মানবিক,বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং বি.এ অনার্স ইংরেজি।
৫. ইডেন মহিলো । কলেজ, ঢাকা	১৯৪৮	বি.এ, বি.এস.সি এবং বি.এ অনার্স বাংলা, অর্থনীতি ও ইতিহাস।
৬. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা	১৯৬১	এইচ.এস.সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), বি.এস.সি(গার্হস্থ্য অর্থনীতি),

E:\Shah-02-2012\1-5 doc 13-03-12 doc

Dhaka University Institutional Repository

		এম.এস.সি(গার্হস্থ্য অর্থনীতি),
৭. এ.এম.কলেজ,ময়মনসিংহ (প্রদেশিকরণ করা হয় অক্টোবর ১৯৬৪)	১৯০৮	এইচ.এস.সি (মানবিক,বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং বি.এ অনার্স বাংলা এবং ইতিহাস।
৮. বি.এম কলেজ, বরিশাল, (প্রদেশিকরণ করা হয় জুলাই ১৯৬৫)	১৮৮৯	এইচ.এস.সি (মানবিক,বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং বি.এ অনার্স অর্থনীতিতে।
৯. বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা (প্রদেশিকরণ করা হয় জুলাই ১৯৬৭)	১৯০২	এইচ.এস.সি (মানবিক,বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং অনার্স কোর্স- ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থ ও রসায়ন।
১০. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	১৯৭৩	এইচ.এস.সি (মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং অনার্স কোর্স-আরবী, বাংলা, অর্থনীতি, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন,গণিত।
১১. কারমাইকেল কলেজ, রংপুর (প্রদেশিকরণ করা হয় ১ জানুয়ারি ১৯৬৩)	১৯১৭	এইচ.এস.সি (মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং অনার্স কোর্স- ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা, অর্থনীতি, পদার্থ এবং রসায়ন।
১২. পূর্ব পাকিস্তান আর্ট এবং গ্রাফ্টস কলেজ, শাহবাগ,ঢাকা	১৯৪৮	ব্যাসেলর অব ফাইন আর্ট (পাঁচ বৎসরের কোর্স প্রবেশিকা পাশের পর)।
১৩. নোয়াখালী কলেজ, মায়েজদী, নোয়াখালী	১৯৬৩	এইচ.এস.সি (মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম
১৪. এডওয়ার্ড কলেজ,পাবনা	১৮৯৮	এইচ.এস.সি (মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য), বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম এবং অনার্স কোর্স- বাংলা, অর্থনীতি ও দর্শন।

উল্লেখিত সারণিগুলি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা তথা কলেজ শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন তথা নতুন শিক্ষা নীতির জন্য প্রস্তাবনায় কলেজের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় উভয় পাকিস্তানে সাধারণ শিক্ষায় কলেজের সংখ্যা মোট ৫০০টি, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫টি ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজসহ। পূর্ব-পাকিস্তানে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৯০ ভাগ অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০:৫০ ভাগ। ১৯৬৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৭টি ও ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ১৪টি। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় উচ্চ শিক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান কতটা উপেক্ষিত ছিল। বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি উপরন্ত শিক্ষাকে সংকোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় দুইটি মাত্র প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পাঞ্জাবে অন্যটি ঢাকায়। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার কয়েকমাস পূর্বে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫-৬০ সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টি। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ, অধিভুক্তকরণ এবং শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো –

১. **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়:** লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালে। এদেশের পুরান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণকারী এবং শুধুমাত্র তার নিজস্ব তিনটি কলেজ- আইন (Law College) কলেজ, বাণিজ্য কলেজ (Commerce College), এবং প্রাচ্য কলেজ (Oriential College)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর (১৯৪৭) থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি নতুন বিভাগ খোলা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪৫টি কলেজ অধিভুক্ত ছিল।

২. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শুধুমাত্র আবাসিক শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার সমস্ত কলেজ অধিভুক্তকরণের অধিকার দেওয়া হয়। মোট ৫৬ কলেজ, যার মধ্যে ৮টি ছিল পেশাভিত্তিক কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে নুতন ছয়টি বিভাগ খোলা হয়।

৩. **সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কয়েক মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ সালে হায়দারাবাদে স্থানান্তর করা হয়। ১৬টি কলেজ এর মধ্যে পাঁচটি পেশাভিত্তিক কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। ১৬টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হত।

৪. **করাচী বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৫০ সালের সনদ অনুযায়ী চ্যান্সেলর হিসেবে গভর্নর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা বলে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা অধিভুক্তকরণের ক্ষমতা এবং পরীক্ষা গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ১৬টি কলেজ (৫টি পেশাভিত্তিক এবং ১১টি সাধারণ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ছিল। ২০টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়।

৫. **পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৫০ সালে আবাসিক এবং অধিভুক্তকরণ ক্ষমতাসহ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে সোয়াত (Swat) ধীর (Dir), এবং চিট্রাল(chitral) রাজ্যের বৈধ ক্ষমতা দেওয়া হয়। নতুন ভবনসহ ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়। ১৫টি কলেজ (৪টি পেশাভিত্তিকসহ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ১৪টি বিভাগ ছিল।

৬. **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:** ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব পাকিস্তানে ২০টি কলেজের অধিভুক্তকরণ ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করায় এর শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়। এটি একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। [১৪২]

১৯৪৭ সালে শিক্ষা সম্মেলনে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি উচ্চ শিক্ষার বিষয় অসন্তোষ প্রকাশ করে যা নিম্নরূপ

Dhaka University Institutional Repository

"It has been felt for a long time that the system of University education comprising the syllabuses, curicula, examinations and teaching methods is unsatisfactory and requires thorough review in order to bring it into line with our educational ideals and needs,. Such reviews have been undertaken in the post by various committees and commissions, but few practical steps have been taken to implement thus recommendations. The committee strongly feels that we should, without delay, lay the foundation of our educational system a new and urge that Government and universitys should take immediate action towards that end." [143]

ছাত্র সমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ সম্পর্কিত কমিশন রিপোর্ট ১৯৬৬ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০টি পূর্ব পাকিস্তানে ৪টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬টি। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয় তার মধ্যে দু'টি পূর্ব পাকিস্তানে ও ১টি পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের একটি জাহাঙ্গীরনগরে ও অন্যটি চট্টগ্রামে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ (১৯৫৯) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২টি কারিগরি ও ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে যথা- ল্যাহোরের পশ্চিম পাকিস্তান কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ালপুরে পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরের বাইরে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত না আসায় পরিবর্তন বন্ধ থাকে। ১৯৬০ সালে টঙ্গীতে ১০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যলয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর নকশা পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরের বাহিরে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে।

নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের প্রতিবেদনকালীন (১৯৬৬) সময়ে ছাত্র নিবন্ধন দেখান হলো : [১৪৪]

সারণি-৮০

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম		নিবন্ধন
১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:		৪৮১৮ জন
২. পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়		৫৫৫২ জন
৩. পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়		১১৩৯ জন
৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়		২০৮৪ জন
৫. সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়		১৮৪৬ জন
৬. পশ্চিম পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়		১২৬৫ জন
৭. পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়		১২৬৫ জন
৮. করাচী বিশ্ববিদ্যালয়		২৭৪৫ জন
৯. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ,লাহোর		৩৫৪২ জন
	মোট	২৫২৬৭ জন

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুযোগ সুবিধা অনুপাতে ছাত্র সংখ্যা অধিক ছিল। শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচীর অধীনে সর্ব প্রথম পাকিস্তানে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদী সম্মান কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু এই কোর্সে ভর্তিচ্ছুক আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল খুবই সমান্য। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় ছিল না। ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে জট পাকিয়েছে (Over lapping of functions) এবং প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাবে যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একই বিভাগ খুলেছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনা করেনি। ফলশ্রুতিতে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিভাগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। বিদেশিঅর্থায়নে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নুতন বিভাগ খোলা হয় এবং ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য সকল শিক্ষার্থীকেই স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় যদিও এই পদ্ধতি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই চালু ছিল। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত দেন যে, এই ধরণের সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সুষ্ঠ কোন আদর্শ তৈরি হবে না। তাই কমিশন উপাচার্যের একটি কমিটি থাকবে বলে সমর্থন করে এবং এই কমিটি উচ্চ শিক্ষা এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উপাচার্যকে উপদেশ দিবে। কমিটি গঠন সম্পর্কে বলা হয়– এই কমিটিতে ৫ জন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার স্বাধীন উচ্চ খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে। তাঁরা এমন সামাজিক পদাধিকারী এবং খ্যাতি সম্পন্ন হবে যারা সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা অর্জন করবেন। এদের অন্তত: দুইজনকে হতে হবে গণ্যমান্য শিক্ষাবিদ, একজন মানবিক এবং একজন বিজ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী এমন ব্যক্তি হতে হবে এবং এদের কেউই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না। একজনকে পেশার ভিত্তিতে নিতে হবে। ৪র্থ জন হবে উচ্চ মর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং চেয়ারম্যান হবেন হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কমিটির সদস্যবৃন্দ বাইরের চাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সকল বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকবেন। কমিটির কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

১. সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে জানাতে হবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান সুযোগ সুবিধার বিষয়টি যথাযথভাবে নিরূপন করবে।

৩. কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলীর যথাযথ বন্টন করতে হবে।

৪. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে জট সৃষ্টি হলে (overlapping) সে ব্যাপারে সমন্বয় করতে হবে।

৫. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান ও অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা কোন বিশেষ বিভাগে বা শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে যদি বিশেষ অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তার পরিমাণের বিষয়ে প্রস্তাবনা পেশ করতে হবে।

৭. শিক্ষানীতির বড় কোন পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা ও উপযুক্ততার বিষয়ে উপাচার্যকে উপদেশ দেবে।

৮. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরণের শিক্ষামান ও পরীক্ষা পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে এবং এগুলি ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা তার তদারকী করবে।

৯. উল্লেখিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উপাচার্যকে উপদেশ দিবেন। প্রয়োজনীয় কাজের সাহায্যের জন্য একটি স্বল্প পরিসরের সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। [১৪৫]

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কমিটির মতামত

উচ্চ শিক্ষায় কিছু বয়স্ক শিক্ষার্থী (Advanced age) ভর্তি হয়ে বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছাত্রনেতা হওয়া। অল্পসংখ্যক ছাত্রই এই পর্যায়ে পড়ে এবং কমিশন মনে করে এদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়। তাই মেধাশূন্য এসব ছাত্রদের বর্জন করার জন্য কমিশন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলে এবং তাহলো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে–

১. ইন্টারমিডিয়েট বি.এ, এবং বি.এস.সি পাশ কোর্সে তিন বছরের বেশি সময় কোন ছাত্র থাকতে পারবে না।

২. অনার্স কোর্সের ক্ষেত্রে এই সময়কাল চার বৎসর।

৩. স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দুই বা তিন বছরের বেশি থাকতে পারবে না এবং দ্বিতীয়বার এম.এ কোর্সে ভর্তির জন্য এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

এই সময়ের পরে ছাত্ররা বহিরাগত বা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবে। যেখানে এই সুযোগ নাই সেখানে এই সুযোগ সৃষ্টি করা হবে কিন্তু বহিরাগত শিক্ষার্থী ও অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের মত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করবে। এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, বহিরাগতদের পরীক্ষার মান অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা মানের সমান হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি দূরীভূত করা সম্ভব হলে বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে। [১৪৬]

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম

সমগ্র পাকিস্তানের ছাত্রদের একই রকম দাবি ছিল যে সকল স্তরের শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করতে হবে এবং জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি এলাকা থেকে একটি শাখার ছাত্ররা তাদের নিজস্ব রাজ্যের ভাষা ব্যবহারের দাবি জানায়। জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৯) এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, ভাষা বিষয়ে বিতর্ক দীর্ঘ করা হবে না, যেহেতু বাংলা এবং উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহনকরার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কমিশন মনে করে জাতীয় জীবনে ইংরেজি ভাষার অত্যাধিক গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে। উর্দু এবং বাংলা দুই প্রদেশের ভাষা কিন্তু উভয় প্রদেশের যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষা নেই এবং এর প্রয়োজনীয়তা এক চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং উভয় অঞ্চলের আন্ত:যোগাযোগ স্থাপনে ভাষার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কমিশনের রিপোর্ট প্রস্তুত নীতিমালার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- রাষ্ট্রের দুই অংশের জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা উর্দু প্রচলনের জটিলতা নিরসনের জন্য যদি উভয় ভাষার শব্দকোষকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, সম্ভবমত যত বেশি শব্দ একে অপরের সাথে মিশ্রিত (incorporate) করা যায় ততই ভবিষ্যতে সাধারণের কাছে উভয় ভাষায় বেশি বোধগম্য হয়ে উঠবে। তাই সরকার নীতি হিসেবে পাকিস্তানের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দুকে উন্নত করা অত্যাবশ্যক মনে করে এবং উভয় ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ভাষা হিসেবে উন্নীত করলে সকল দূর্বলতা দূর করবে যাতে উভয় ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে কমপক্ষে ১৫ বৎসর সময় লাগবে। সরকারি প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষার কোন পরিবর্তন করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি নিতে হবে। [১৪৭]

উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় সরকারি আইন সম্পূর্ন অবজ্ঞা করা হয় এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের পক্ষে আইন তৈরী করে। নিম্নে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম তুলে ধরা হলো :

১) **করাচী বিশ্ববিদ্যালয়:** করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩ সালে এক আইন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে উর্দুভাষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ধাপে ধাপে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নরূপ:

ক) ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রাজুয়েট স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু বা ইংরেজি।

খ) ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রাজুয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান,বাণিজ্য, আইন সকল বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু।

গ) ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিসিনে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু।

ঘ) ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু।

ঙ) ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু। যে সমস্ত বিদেশিশিক্ষার্থী ও অন্যান্য ভাষার শিক্ষার্থী যারা উর্দু ভাষা জানে না তাদের জন্য উর্দু ভাষায় বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়:** পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ সাল থেকে কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ব্যাচেলর ডিগ্রীর জন্য পরীক্ষার মাধ্যম উর্দু বা ইংরেজি ভাষার অনুমতি দেয়। একই সুযোগ ১৯৬৫ সালে দেওয়া হয় যা ১৯৬৭ সাল থেকে কার্যকর করা হবে কলা ও বিজ্ঞান বিষেয়র স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকগণ উর্দু অথবা ইংরেজি ভাষা আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে ব্যবহার করতে পারবে।

৩) **সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়:** সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ পাশ এবং অনার্স পরীক্ষায় উর্দু, সিন্ধী অথবা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে পারে। তবে শুধুমাত্র ভাষাবিষয়ে (Language subject) এর নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করতে হবে। অধিভুক্ত কলেজগুলি ও উর্দু, সিন্ধী অথবা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবে।

৪) **পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়:** পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ভাষা বিষয় এবং ইসলামিয়াত ছাড়া সকল বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। ইসলামিয়াতের জন্য ভাষা আরবী, উর্দু অথবা ইংরেজি হতে পারে কিন্তু ভাষার বিষয়ের জন্য নিজস্ব ভাষা অথবা উর্দু অথবা ইংরেজি হবে।

৫) **পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,লায়ালপুর:** ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত বি.এস.সি পর্যন্ত শিক্ষা এবং পরীক্ষাসমূহ উর্দু অথবা ইংরেজি এবং এম.এস.সি'র জন্য ইংরেজি ভাষা হবে। কৃষি বিষয়ে টার্ম এবং শব্দ সম্বলিত উর্দু ইংরেজি শব্দকোষ রচনা করবে।

৬) **পশ্চিম পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়:** ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী উর্দু অথবা ইংরেজি বেছে নিতে পারে।

৭) **ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:** ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ, বি.কম ও অনার্স কোর্সের সাবসিডিয়ারী বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় দুইটি জাতীয় ভাষার একটি অথবা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে পারবে। ব্যতিক্রম শুধু ভাষা বিষয়ে অবশ্যই উর্দু, বাংলা অথবা ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে যা ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা থেকে শুরু হয়। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলিও জাতীয় ভাষা যা ইংরেজি ব্যবহার করতে পারবে। ইংরেজির অবস্থান নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেশ উদ্বিগ্ন ছিল এবং ভাষা সংক্রান্ত গঠিত কমিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যন্ত ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখার পক্ষে বলেন। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি প্যানেল তৈরি করা হয় এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই বিভিন্ন বিষয়ের গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েটদের জন্য এবং বাংলা সমমানের সাইন্টিফিক ও টেকনিক্যাল টার্মের জন্য সংকলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা করে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডাইরেক্টর মনে করেন ১৯৭০ সালের মধ্যে বি.এ অনার্স পর্যন্ত ইহা কার্যকরী করা সম্ভব হবে তবে তিনি মনে করেন ইংরেজির গুরুত্ব কমানো যাবে না, এটি দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত চলবে।[১৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাবনা ১৯৬৯ ও বিশ্ববিদ্যায় শিক্ষা

উভয় পাকিস্তানে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২টি। এর মধ্যে ৭টি সাধারণ প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বাদশ বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামাবাদে প্রতিষ্ঠিত যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্নাতকোত্তর পাঠের জন্য। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টি পশ্চিম পাকিস্তানে ও ৫টি পূর্ব পাকিস্তানে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র নিবন্ধন প্রায় ২০০০০ এর মধ্যে ১৭০০ সাধারণ প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২৫০০ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রায় ২৭০০ কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১৩০০, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের পি.এইচ.ডি ব্যতীত বিদেশিডিগ্রী রয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় হয় ১১৪ মিলিয় রুপি। এর মধ্যে ৬৪ মিলিয়ন উন্নয়ন খাতে (Development) এবং ৫০ মিলিয়ন অউন্নয়ন (Non-Development) খাতে। দেশে চলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক মানের নিম্নগতি, ব্যর্থতার উচ্চহার (The high failure rate) মানবিক এবং বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের হার বিপরীত মুখী (adverse ratio), বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজের অগ্রগতির অবদান সামান্য, নিম্নতম গবেষণা সুবিধা এবং দেশের মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে শিক্ষা পদ্ধতির সাধারণ অসঙ্গতি এই অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ। তাই কমিশন মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত একটি বিশ্বস্ত পরিবেশ এবং স্বাধীনতা, আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রদান। এই উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করে-

ক) অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন;

খ) প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন;

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন চলমান থাকবে;

অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন

কমিশনের অভিমত প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরিযে উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে তা বিলুপ্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত সরকারি তহবিল বিলুপ্ত করে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশন হবে একটি সংবিধিবদ্ধ বডি যারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য দায়ি থাকবেন

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের নিশ্চিতকরণ;

খ) কমিশন নিয়ন্ত্রিত ফান্ড থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য অনুমোদন দান ও অর্থ ছাড় করবে;

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাদান সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন;

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার বাহ্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতির সম্ভাব্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ অথবা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে সরকারকে উপদেশ দেওয়া। [১৪৯]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরিকমিশন গঠন

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুইটি মঞ্জুরি কমিশন নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে-

ক) চেয়ারম্যানসহ তিনজন বেতনভুক্ত সদস্য থাকবেন। প্রদেশের গভর্নরের নিকট ৬ জনের নাম বিশিষ্ট প্যানেল পাঠানো হবে। প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দুইজন সিনিয়র ডীন এবং ট্রেজারার নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা মন্ডলী উক্ত ৬ সদস্যের প্যানেল থেকে চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্যকে নিয়োগ দিবেন সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নর।

খ) দুইজন অনারারী মেম্বর যার ভেতর একজন থাকবে বিজ্ঞানী যাকে নিয়োগ দিবেন গভর্নর।

গ) চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মেয়াদকাল হবে ৫ বৎসর। প্রত্যেক মঞ্জুরি কমিশনের নিজস্ব স্বাধীন সচিবালয় থাকবে।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের নিকট থেকে ফান্ড গ্রহণ করবেন। এর সাথে এই প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি পর্যায় থেকে (Private individuals), শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশন থেকেও ফান্ড পাবে। অধিভুক্ত কলেজের ডিগ্রী প্রদান করবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।[১৫০]

বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট-১৯৬৯

১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করার জন্য একটি ড্রাফট বিল পাশ করা হয় এটি পরিবর্তন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং XXIV-১৯৬২, XXX-১৯৬২, ১৯৬৬ এর ১, ১৯৬৬এর ৫, ১৯৬৭ এর ৩ এর স্থলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স কার্যকর হবে যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে সকল উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, মূল্যবোধ ও আদর্শের সুতিকাগার হয়ে উঠতে পারে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজে প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা থ্যকবে। এই এ্যাক্টকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৬৯, যা দ্রুত কার্যকর হবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকবে-

১. ক. শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় যা সঠিক মনে করবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিবে, গবেষণার জন্য নিয়ম তৈরি এবং জ্ঞান উন্নয়নের ও অগ্রগতির নির্দেশ দিবে।

খ) কলেজের অনুমোদন দান এবং তা বাতিল করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) কলেজের কোর্স প্রণয়ন করবে।

ঘ) পরীক্ষা অনুষ্ঠান, মঞ্জুরি প্রদান, সনদ প্রদান, ডিপ্লোমা, স্নাতক প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তাধীনে সনদ প্রদন করবে।

২.উপাচার্য

ক) প্রতি তিন বৎসরের জন্য একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি উপাচার্য নির্বাচিত হবেন। উপাচার্য নির্বাচনের তারিখ থেকে তিন বছর স্বপদে থাকবেন এবং পরবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি হওয়ার যোগ্যতা থাকবে না। উপাচার্য সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন এবং সনদ বিতরণ করবেন।

খ) পদাধিকার বলে এ্যাক্টের ধারা মোতাবেক তাঁর উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা তিনি পালন করবেন।

৩. উপাচার্যের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ক) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা।

খ) উপাচার্য হবেন Ex-officio সদস্য এবং সিন্ডিকেটের এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং যে কোন কর্তৃপক্ষের সভায় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সভায় বক্তব্য পেশ করবেন। কিন্তু তিনি ভোট দিতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কর্তৃপক্ষের বা সংশ্লিষ্ট বডির সদস্য না হন।

গ) এই এ্যাক্ট, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এবং নিয়মকানুন ঠিকমত মেনে চলা হচ্ছে কি না তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

ঘ) সিনেট অধিবেশন, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিল এবং অন্য অনুষদের সভা আহবান করার ক্ষমতা থাকবে উপাচার্যের।

ঙ) কোন জরুরী অবস্থায় ২৪ ঘন্টার নোটিশে যে কোন তাৎক্ষণিক সভা আহবান করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সভায় যদি কোরাম পূর্ণ না হয় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিবেন।

চ) উপাচার্য কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, কোন কর্মকর্তার সাসপেনশন বা কারো বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ছ) নির্দেশনা মোতাবেক উপাচার্য এই ধরণের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

জ) উপাচার্য প্রয়োজনমতো সিন্ডিকেট সদস্যের অনুমোদনক্রমে তার ক্ষমতা ব্যবহার এবং কার্য সম্পাদন করতে পারবেন, কোন কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যা তিনি উপযুক্ত মনে করেন।

ঝ) উপাচার্য হবেন অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডের তদারকি করবেন এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার জন্য দায়ি থাকবেন।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাবে পাকিস্তানি তথা ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঐ পুস্তিকায় বলা হয়, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পাকিস্তানের সবার জন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো, জাতীয় ঐক্যের জন্য শক্তিশালী যন্ত্র হিসেবে শিক্ষককে ব্যবহার করা ইত্যাদিই হবে নয়া শিক্ষানীতির লক্ষ্য। স্কুল-কলেজগুলোতে পাকিস্তানিআদর্শের তথা ইসলামি ভাবধারার শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব স্কুলে ইসলামিয়াত অবশ্যই বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয় এবং পরবর্তী ধাপে ঐচ্ছিক রাখার প্রস্তাব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক মাদ্রাসারূপে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব করা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন, শিক্ষা কাঠামোর সংস্কার, শিক্ষা প্রশাসনের সংস্কার, শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তক নতুন করে রচনা দ্রুত পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের মত নতুন ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়। কিন্তু যেই মুহূর্তে এই কমিশন তার প্রস্তাবনা তৈরি করে সেই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে রিপোর্ট বাস্তবায়নের সুযোগ সরকার পায়নি।

নিম্নের সারণিতে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র নিবন্ধন, শিক্ষক ও ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হলো ।[১৫২]

সারণি-৮১

বৎসর	সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র নিবন্ধন		শিক্ষক সংখ্যা		ব্যায়ের পরিমাণ সা: বি: জং		ব্যায়ের পরিমাণ টে: বি: :জং	
			সা:বি:	টে: বি:	সা:বি:	টে: বি:	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১	x	১৬৯৩	x	পর্যাপ্ত নয়	----	১২৮৭০৫৮	৯২২৭০০	----	----
১৯৪৮-৪৯	১	x	২০১৯	x	----	----	১০৩১৮৭৫	৬৬৫০০	----	----
১৯৪৯-৫০	১	x	২২৫৭	x	----	----	৯৩৩৪৭৮	৬৩৬৪০	----	----
১৯৫০-৫১	১	x	২৩৩০	x	----	----	১৭১৪৭১৪	৭১৩৮৪৮	----	----
১৯৫১-৫২	১	x	২৩৯১	x	----	----	২১৩৭৯৩৫	১০০০০০০	----	----
১৯৫২-৫৩	১	x	২৩০৪	x	----	----	২৫৯৫০৮২	১০০০০০০	----	----
১৯৫৩-৫৪	২	x	২৪৩১	x	----	----	৪১২৪৩৩৯	১৬১৫০০০	----	----
১৯৫৪-৫৫	২	x	২৬৯৭	x	----	----	৩১৩২৬৯৩	১৭২৫০০০	----	----
১৯৫৫-৫৬	২	x	৩০৯৫	x	----	----	৪০৩৯২১৭	১৭২৯৪১৬	----	----
১৯৫৬-৫৭	২	x	২৮৭৪	x	----	----	৪৭৩০৮৩৬	১৯০০১৫০	----	----
১৯৫৭-৫৮	২	x	৩১৫০	x	----	----	৩৭০৪৮৯৯	২৬৭৫৯৫	----	----
১৯৫৭-৫৯	২	x	২৫৫৯	x	----	----	৫৯৪৭৪৮৬	৩২৯৬৫১৮	----	----
১৯৫৯-৬০	২	x	২৩৭৮	x	----	----	৪৯২৬৭৪৭	২৮১৯০০০	----	----
১৯৬০-৬১	২	x	৩৮০৬	x	৩০০	----	৪৫৫১৫৬২	৩২৪৩৬৬৯	----	----
১৯৬১-৬২	২	২	৪২৭৯	১৪০২	৩৩৯	১৩১	৬৮৯১৮৫৪	৩২৪৯৬১৯	২১৮২৯০৫	২১৮২৯০৫
১৯৬২-৬৩	২	২	৫২৭৭	১৫৫৫	৩৯৭	১৫১	৮৬৫১৭২২	৩৮৭২০০০	২৭০১১৪৮	২৭০১১৪৮
১৯৬৩-৬৪	২	২	৬৪৮৫	১৭৮১	৩৯৩	১৭৭	৮২৯৯৯৯০	৩৭৭৮০০০	৪৪২২৬৮৯	৪৪২২৬৮৯

E:\Ami5-02-201201-5 doc 13-01-12 doc

১৯৬৪-৬৫	২	২	৬৮০৮	১৯৩১	৩৯৩	১৮৫	৯৬২১০৯৭	৪৪৩২৫৯৪	৪৯৯৭০২০	৪৯৯৭০২০
১৯৬৫-৬৬	২	২	৭৮৫৩	২০৮২	৫৮৫	২৪০	৯৮৩৪২১২	৫৯৭০০০০	৪৭৬৫৭৩৮	৪৭৬৫৭৩৮
১৯৬৬-৬৭	৩	২	৭৬৮৫	২১৪২	৫৬৫	৩০৪	১১৮৯৭৭৪৮	৭৩২৮৮০০	৬০৫৮৩৬৩	৬০৫৮৩৬৩
১৯৬৭-৬৮	৩	২	৮৫২৪	২৫৯১	৫৭৯	৩০৭	১৩৩৬৯৯৫০	৮২৮৮৮০০	৬৪৪০৫৯৫	৬৮৪০৫৫৯
১৯৬৮-৬৯	৩	২	৯০০০	২৮০০	৫৮০	৩০০	১৪০০০০০০	৮৫০০০০০	৭৫০০০০০	৭৫০০০০০
১৯৬৯-৭০	৩	২	৯৫০০	৩২০০	৫৮০	৩১০	১৪৫০০০০০	৯০০০০০০	৮০০০০০০	৮০০০০০০

প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ ও টেকনিক্যালসহ) এর মধ্যে ৭টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫টি পূর্ব পাকিস্তানে।

উপসংহার

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর (১৯৪৭) শিক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) কাঠামোর প্রাদেশিক বিষয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নতুন শিক্ষানীতি রচনার অধিকারী ছিল। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি হবে এই নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গুরুতর মত পার্থক্য থাকায় কোন নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ দেখা যায়নি। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত করাচীতে শিক্ষা সম্মেলনে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে জাতীয় স্বার্থে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুপারিশ করা হয়নি বা শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। এই সম্মেলনে পাকিস্তানে একটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বেশ কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠন করলেও কমিশনের সুপারিশসমূহ অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশনের সুপারিশসমূহে সমাজের চাহিদা ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দূরদর্শী কোন শিক্ষানীতি প্রণনের কথা বলা হয়নি। তবে কমিশনের সব সুপারিশ যে দূরভিসন্ধিমূলক ছিল তা নয় যেমন তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চাপে তা বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রস্তাবটিকে শিক্ষা সংকোচনের সরকারি চক্রান্ত হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে তিন বৎসরের ডিগ্রীর কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।[৫৩] যেহেতু সরকারের প্রতি জনগণের জনসমর্থন ও আস্থা ছিল না তাই অনেক খারাপ কাজের মাঝে কিছু ভাল কাজ থাকলেও জনগণ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের সম্মেলনে সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও কমিশনসমূহের সুপারিশে এটি দ্রুত বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দেওয়া হয়নি আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭০ সালে ৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা সভায়। এই সভায় সভাপতির ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন ডি.পি.আই আব্দুল হাকিম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, ১৯৩০ সালের বেঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্টে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উহা বিভিন্ন কারণে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। তিনি অন্যতম কারণ হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সহ-সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী তার প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তনের কথা বলেন। [১৫৪] উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে যখন পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০০ ভাগ। আর্থিক সমস্যার কারণ দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক স্কুল বন্ধ করা হয় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪০ জন ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ১৫ জন পৌঁছায় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায় শতকরা ৩৮ জন। [১৫৫] শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক গুণ বেশি। যেমন ১৯৫৮-৫৯ সালে (১৫ মাস) শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ২৫৩ মিলিয়ন রুপি যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৬ মিলিয়ন রুপি। ১৯৬২-৬৩ সময়ে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৫৬০ মিলিয়ন রূপ যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৩৮ মিলিয়ন রুপি। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬৫০ মিলিয়ন রুপি ব্যয়ের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়।[১৫৬] কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে বহুমাত্রিক কোর্স যেমন-পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষার অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৫০০টি কলেজের মাধ্য অধিক জনসংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫টি। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৭টি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. সরদার ফজলুল করিমের উদ্ধৃতি, *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*; ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ.২৮

২. *Report of the East Bengal Education System Reconstruction Committee*, 1951, p.2

৩. Ibid, pp. 2-3

৪. Ibid, p.5

৫. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরন*, ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.২৮৪

৬. Report of the Education Reform Commission,East Pakistan, 1957. p.1.

৭. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৭-৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

৮. *The New Education Policy of the Government of Pakistan, Ministry of Education and Scientific Research*, Islamabad, March, 1970, p.1.

৯. Ibid, p.3

১০. Ibid, p.4

১১. *The New Education Policy of the Government of Pakistan*, Islamabad, 1970, p. pp. 4-5.

১২. Ibid, p.6

১৩. Ibid, p. 10-11

১৪. *First Five Year Plan 1955-60, Government of Pakistan*, National Planning Board, December, 1957, p. 542.

১৫. Ibid, p.542.

১৬. *Proceedings of the Sixth Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan*, Ministry of Education, 1954,p.56.

১৬.ক আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, *সর্বজনীন শিক্ষা: অতীত বর্তমান ভবিষ্যত*, হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশন, ২০০২, পৃ.৭৭-৭৮

১৭. Dr. Sharifa Khatun, *Development of Primary Education Policy in Bangladesh*, Published by University of Dhaka, 1992,p.44.

১৮. *First Five Year Plan 1955-60, Government of Pakistan*, National Planning Board, December, 1957,p. 547.

১৯. Dr. Sharifa Khatun, Ibid, p.45-47.

২০. Ibid, p.47.

২১. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction*, Annual Statistics Report on Public Instruction, East Pakistan for 1958-59, Table-1,p.6

২২. Ibid, p.1.

২৩. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction*, Annual Statistic Report on Public Instruction, East Pakistan for 1959-60 Table-1, p.9

২৪. Ibid, pp. 4-5.

২৫. *Education Statistic for West Pakistan*,1959-60, The West Pakistan Bureau of Education, Pakistan. p.7.

২৬. Ibid, p.7.

২৭. Ibid, p.8.

Dhaka University Institutional Repository

২৮. Ibid, p.8.

২৯. *Education Statistic for West Pakistan*, 1959-60, The West Pakistan Bureau of Education, Pakistan. p.8.

৩০. Ibid, p.9.

৩১. Ibid, p.9.

৩২. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction.* Annual Report on Public Instruction, East Pakistan for 1961-62 Table-1, p.17.

৩৩. Ibid, pp. 5-6.

৩৪. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction*. Annual Report on Public Instruction, East Pakistan for 1962-63 Table-1, P.16.

৩৫. Ibid, p.6.

৩৬. *Education Statistic for West Pakistan*, 1962-63,Part-1, The Government of Pakistan. p.5.

৩৭. *জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট*, ১৯৫৯, পৃ.৩

৩৮. ঐ, পৃ.২

৩৯. ঐ,পৃ.২০৫-২০৬

৪০. ঐ,পৃ.২০৭ ও ২০৯

৪১. Report of the Commission on Students Problems and Welfare, 1966. Karachi, p.6.

৪২. Ibid, p. 177-191.

৪৩. Ibid, p.13.

৪৪. Ibid, pp. 13-14.

৪৫. Ibid, P.15.

৪৬. Ibid, P.16.

৪৭. Ibid, pp. 16-17.

৪৮. Ibid, pp. 16-17.

৪৯. Ibid, p.19.

৫০. *Proposals for a New Education Policy*, Ministry of Education and Scientific Research, Government of Pakistan, Islamabad, 1969, pp. 1-2.

৫১. Ibid, p.1.

৫২. Ibid, p.2.

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. *Proposals for a New Education Policy, Ministry of Education and Scientific Research,* Government of Pakistan, Islamabad, 1969,P. 2-3.

৫৪. Ibid, p.28.

৫৫. *Education is Salvation, Statistical Information of Education in East Pakistan,* The East Pakistan Education Week, 1970,p.5. Table-II.

৫৬. *Six year National plan of Education Development,* June 1951 to 1957. p.1.

৫৭. Ibid. p.3

৫৮. Ibid. p.6

৫৯. *Proceedings of the Sixth Meeting of the Advisory Board of Education*, 1954. p.57.

৬০. Six Year National Plan, Ibid. p.18 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৬৪৮৬টি। এর মধ্যে পূর্ব পাস্তিানে ৪৫২৮টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৮টি। এই তথ্য Six year National Plan of Education development June 1951-1957. কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্যের সাথে গরমিল দেখা যায়। এই তথ্যে ১৯৪৮-৪৯ সময়ে পর্ব পাকিস্তানে মোট মাধ্যমিক (মিডল ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫৫০টি প্রায়

৬১. Ibid. p.18

৬২. Ibid. p.19

৬৩. জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট করাচী, ১৯৫৯, পৃ.১৩৮-১৪১

৬৪. ঐ, পৃ.১৪৩-১৪৪

৬৫. ঐ, পৃ.১৪৬-১৫১

৬৬. ঐ, পৃ.১৫১-১৫২

৬৭. ঐ, পৃ.১৬৪-১৬৯

৬৮. *Government of East Pakistan Directorate of Public Instruction,* Annual Statistics Report on Public Instruction Eaxt Pakistan for 1959-60. P.25

৬৯. Ibid. pp. 25-26

৭০. Ibid.pp. 5-6

৭১. Ibid. pp. 27-27

৭২. Ibid. p.28

৭৩. *Education Statistic for West Pakistan,* 1959-60 The West Pakistan Bareau of Education, Pakistan, pp. 10-11

৭৪. Ibid. pp. 10-11.

৭৫. *Education Statistic for West Pakistan* 1959-60 The West Pakistan Bureau of Education. Pakistan. p. 11-14

৭৬. Ibid. p. 13-14.

৭৭. Ibid. p.14.

৭৮. *Annual Report on Public Instruction, Government of East Pakstan Directorate of Public Instruction*, 1962-63. p.6

৭৯. Ibid. p. 32-33.

৮০. Ibid. p. 34-35.

৮১. *Education Statistic for West Pakistan*, 1962-63Part-II, Secondary School, West Pakistan Bureau of Education, Lahore. p.8.

৮২. Ibid. p.8.

৮৩. Ibid. p.13

৮৪. *Report of the Commission on Students Problems and Welfare*, Karachi. 1966, pp. 228-229

৮৫. Ibid. p.28.

৮৬. Ibid. p.30.

৮৭. Ibid. p. 33-34.

৮৮. Ibid. p.21

৮৯. *Proposal for a New Education Policy*, Minsitry of Education and Scientific Research, Islamabad, July, 1969,p.8.

৯০. Ibid. pp. 22-23.

৯১. Ibid. p.23

৯২. A Personal Case Study by Adam Curle, *Planning for Education in Pakistan*, First Published in Great Britain 1966. pp. 53-54.

৯৩. *Education is Salvation, Statistical Informations of Education in East Pakistan*, The East Pakistan Education Week 1970. pp. 3,6,7.

৯৪. Ibid. p.7

৯৫. *Report on Public Instruction in East Bengal for the Period from August* 15, 1947 to March, 31, 1948. pp. 22-26.

৯৬. *Six year National Plan of Education Development*, June 1951 to 1957. pp. 39-40.

৯৭. *The First Five Year Plan* 1955-1960. Government of Pakistan National Planning Board, December 1957, pp. 582-585.

৯৮. *Annual Statistical Report on Public Instruction Government of East Pakistan,* Directarate of Public Instruction. 1958-59. p.3.

৯৯. জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, করাচী, ১৯৫৯, পৃ.২২-২৩

১০০. ঐ, পৃ.২৪-২৬

১০১. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.২৭-২৮

১০২. ঐ, পৃ.২৯-৩২

১০৩. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৫৭-৫৯

১০৪. ঐ, পৃ. ৬০ ও ৭৭

১০৫. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৬

১০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ও ৮ জানুয়ারি, ১৯৬০

১০৭. ঐ, ১৪ জুলাই ১৯৫৯

১০৮. ঐ, ২৭ এপ্রিল ১৯৬০

১০৯. *দৈনিক আজাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৬৩

১১০. *Education Statistics for West Pakistan* 1959-60, TheWest Pakistan Bureau of Education Pakistan. pp. 14-15.

১১১. Ibid, p. 15.

১১২. *Education Statistic for West Pakistan* 1959-60, TheWest Pakistan Bureau of Education Pakistan, p.15

১১৩. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction Annual Statistical Report on Public Instruction* for 1959-60. p.6.

১১৪. *Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction Annual Report on Public Instruction* for. 1962-63. pp. 7-8.

১১৫. *Education Statistic for West Pakistan* for 1962-63, Part-III, West Pakistan Bureau of Education, Lahore, p.8

১১৬. Ibid, Table-12, p.20.

১১৭. Ibid, Table-15, p.25.

১১৮. Ibid, Table-18, p.28.

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. *Report of the Commision on Students Problem and Welfare*. Government of Pakistan.1966. pp. 229-231.

১২০. Ibid, p. 35-36.

১২১. *Report of the Commision on Students Problem and Welfare*. Government of Pakistan.1966. p. 37.

১২২. Ibid, pp. 40.

১২৩. Ibid, pp. 44-45

১২৪. Ibid, pp. 47-48

১২৫. *Report of the Commision on Students Problem and Welfare*. Government of Pakistan.1966. p. 57.

১২৬. Ibid, pp. 57- 58.

১২৭. Ibid, p. 58.

১২৮. *Report of the Commision on Students Problem and Welfare*. Government of Pakistan.1966. p. 63.

১২৯. Ibid, P. 63-64. পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি চাকুরিজীবী ও শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের তেমন তারতম্য ছিল না। কিন্তু বেসরকারি সংস্থায় আকর্ষনীয় বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বেশি ছিল। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এটোমিক এনার্জি কমিশন অথবা সাইন্টিফিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরী ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কলেজ শিক্ষকদের বেতনের ব্যবধান ছিল ব্যাপক। পশ্চিম পাকিস্তানের কলেজ শিক্ষকের বেতনের পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

১৩০. Ibid, p. 232.

১৩১. *দৈনিক আজাদ*, ১ মার্চ ১৯৬৭

১৩২. ঐ, ৩১ আগস্ট ১৯৬৭

১৩৩. *Proposals For A New Educational Policy*, Ministry of Education and Scientific Research Government of Pakistan, Islamabad 1969. p.31.

১৩৪. Ibid, p. 31.

১৩৫. Ibid, p. 32.

১৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭০

১৩৭. ঐ, ৪ জানুয়ারি ১৯৭০

১৩৮. *Education is Salvation Statistical Informations Education week*1970, Table.V.p. 8

E:\Ali\15-12-2011\1-5.doc 13-01-12.doc

১৩৯. Ibid, Table-VI. p.9.

১৪০. *Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate*, Government of East Pakistan March, 1968. p.8.

১৪১. Ibid, pp. 9-10.

১৪২. *The First Five Year Plan.* 1955-1960. Government of Pakistan National Planning Board, December 1957, p. 565.

১৪৩. Ibid, p. 565

১৪৪. *Report of the Commision on Students Problem and Welfare*, Government of Pakistan.1966. p. 77

১৪৫. Ibid, pp. 78-80.

১৪৬. Ibid, pp. 86-87.

১৪৭. Ibid, pp. 108

১৪৮. Ibid, pp. 111-112

১৪৯. *Proposals A New Educational Policy.* Ministry of Education and Scientific Research Government of Pakistan, Islamabad 1969. p.33.

১৫০. Ibid, p. 33

১৫১. Ibid, pp. 171-72.

১৫২. *Statistical Informations of Education in East Pakistan.* The East Pakistan Education week 1970, Tabel VII, p.10.

১৫৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *শিক্ষা ও স্বাধীনতা*, 'তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার দু'শো বছর* ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.২৫৯.

১৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০।

১৫৫. *Planning for Education in Pakistan.* A case Study by Adam Curley, Tailstock. Publications London, Sydney, Wellington, First Published in Great Britain-1966, p. 76-77.

১৫৬. *Report on Educational Progress in Pakistan* 1962-63, Presented at the 26th International conference on Publication. Geneva, July 1963, Government of Pakistan. Ministry of Education and Information. p.1.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কমিশন সমূহের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সরকারের অবহেলো। ও বৈষম্য মূলক আচরণের কারণে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় মূলত: ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের দ্বারা। পাকিস্তান সরকার ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলগত কোন পুরিবর্তনের দিকে না গিয়ে স্কুল কলেজের সংখ্যা হ্রাস করতে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় এবং যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই নিয়মিত বেতন না পাওয়া, স্কুলের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, স্কুলগৃহ মেরামত ও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে সরকার জেলা শহর ও রাজধানীর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অফিস ও বাসভবনে পরিণত করে। অন্যদিকে শিক্ষা বাজেট সংকুচিত করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, পরীক্ষার ফিস, হোস্টেলের সীট ভাড়া ও বইয়ের দাম বাড়ান হয় বলা যায় পূর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের (১৯৪৭) শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা করে। এই প্রতিবাদ সভার উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা।[১] সভার পর একটি বিক্ষোভ মিছিল সচিবালয় ও মন্ত্রিদের বাসভবনে যায়। বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাংলা ভাষার দাবি সমর্থন করাতে বাধ্য করে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থা এবং শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তারা বলেন ১৯৪৭ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষকগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ভারত বিভক্তির পর অধিকাংশ শিক্ষক দেশ ত্যাগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তরফ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, নঈমুদ্দিন আহমদ প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপির দাবিসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১। শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করতে হবে, প্রারম্ভিক বেতন বর্তমানের ১৫০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৫০/- টাকা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository
২। অধ্যাপকদের প্রচলিত বাধ্যতামূলক অবসর লাভের বয়স বৃদ্ধি করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ষাট বৎসর করতে হবে।

৩। নিয়োগ এবং পদোন্নতির সময় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা চলবে না।

৪। অবিলম্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিয়োগ করে বর্তমানে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৫। অধ্যাপকবৃন্দের অভাব অভিযোগ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

৬। যারা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদেরকে রাখবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এই আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার, জরিমানা ও গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থান থেকে শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিজ নিজ এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়।[২]

ঢাকা শহরে ছাত্রী বিক্ষোভ

ইডেন এবং কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়কে অগণতান্ত্রিকভাবে একত্রীভুক্তিকরণের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে ব্যাপক ছাত্রী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। দুই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাড়াও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এতে যোগ দেয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর ছাত্রীরা ধর্মঘট করার পর বেলা দু'টায় সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। ছাত্রীদের এই ধর্মঘট ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। ১৮ নভেম্বর ঢাকা কলেজের ছাত্ররাও ধর্মঘট করে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যায় এবং তিনি সাক্ষাৎ করতে অসম্মতি জানালে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেয়। এই তিন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ও নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সমর্থন করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে। কিন্তু ছাত্রদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বিবৃতি দেন। তিনি বলেন,"আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের ধর্মঘটের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। তরুণ মুসলিম ছাত্রীদের রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করিয়া বেড়ান অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং অশোভন। ইহা মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী।"[৩] কিন্তু ধর্মঘট প্রত্যাহার না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ এক বিবৃতিতে দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্রীরা ৬ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় ক্লাশে যোগদান করে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট

১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ৪ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। কিন্তু সরকার দাবি দাওয়া অগ্রাহ্য করায় শিক্ষকগণ ১ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে শুধু শিক্ষকগণই নয় জনসাধারণও

Dhaka University Institutional Repository
বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে। কিন্তু সরকার শিক্ষকদের দাবি দাওয়া মেনে নিতে অস্বীকার করায় দুই মাস স্থায়ী হওয়ার পর ২ জুন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। শিক্ষকদের এই ধর্মঘট দাবি-দাওয়া আদায়ে ব্যর্থ হলেও সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়।[৪]

বেসকারি শিক্ষা সম্মেলন ১৯৫০

শিক্ষা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজের আহ্বানে ১৯৫০ সালের ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরে একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে সম্মেলন শুরু হলে সরকার সমর্থক ছাত্র-কর্মীরা গোলযোগ শুরু করে ফলে সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে স্থানান্তর করা হয়। সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল সরকারের শিক্ষা সংকোচননীতি, জনগণের আর্থিক সংকট ও শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া, শিক্ষা বাজেট বরাদ্দ কম, শিক্ষকদের সংকট, মোহাজের ছাত্রদের সমস্যা ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানান হয় এবং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করা হয়। দাবিসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১। পুলিশ, আইবি ইত্যাদি খাতে টাকা কমিয়ে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভাতা কমিয়ে শিক্ষাখাতে টাকা বাড়ানো। অবিলম্বে বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ করে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি সমভাবে বন্টন করে অতিরিক্ত মুনাফা ও ব্যবসা কর বনিয়ে ঐ সকল অর্থ শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে।

২। (ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজের ঘাটতি বাজেট সম্পূর্ণ পূরণ এবং উহাদের সংস্কারের জন্য সরকারি অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করে একদিকে ছাত্রদের বেতনের হার কমাতে হবে অন্যদিকে শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধি করতে হবে।

(খ) স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে। উপরন্ত পূর্বতন হারের ও শতকরা ২৫ ভাগ বেতন হ্রাস করতে হবে।

৩। (ক) অবিলম্বে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে এবং প্রাইমারি শিক্ষকগণের সম্মানজনকভাবে বেতন ও ভাতা দিতে হবে ও উঠিয়ে দেওয়া প্রাইমারি স্কুলগুলি পুনরায় চালু করতে হবে।

(খ) একজন প্রাথমিক শিক্ষকের নিম্নতম বেতনের হার মাসিক ৫০ থেকে ৬০ টাকা কম হলে চলবে না।

(গ) প্রতিটি শহরের মহল্লায় এবং বয়স্কের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

৪। (ক) মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সংস্কার করে গণতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিম্নতম বেতনের হার ১৫০ টাকা কম হলে চলবে না এবং সরকারি ভাতার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় মানের সহিতোসমতা রক্ষা করতে হবে।

(গ) চারিটি ভাষা শিক্ষার দুঃসাধ্য বোঝা চাপানো, বোর্ডের বিবেচনা শূন্য কারিকুলাম ও সিলেবাসের সংশোধন করতে হবে। বিশেষত উর্দুকে স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

৫। (ক) মফঃস্বল কলেজগুলিতে দুই বৎসরের মধ্যে অনার্স কোর্স খুলতে হবে।

(খ) সমস্ত স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ অর্থ মঞ্জুর করতে হবে।

(গ) বেসরকারি কলেজগুলির অধ্যাপকদের নিম্নতম প্রাথমিক মাহিনার হার ৩০০ টাকার কম হলে চলবেনা।

(ঘ) অবিলম্বে সরকারি বেসরকারি কলেজগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্টাফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য সরকারকে বিশেষ সাহায্য (আর্থিক ও পরিকল্পনামূলক উভয় প্রকার) ও অতিরিক্ত শিক্ষাভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সংস্কারের জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণ যে সকল দাবি করিয়াছে তা মানতে হবে ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ দাবিও মানতে হবে।

৬। কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করে অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(ক) মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজে পরিণত করতে হবে এবং অটোমেশনের অবসান ও কারিকুলাম সংস্কার করতে হবে।

(খ) ঢাকার এম.বি. ডিগ্রী এবং বেসরকারী মেডিকেল স্কুলগুলির ডিগ্রীর সরকারি অনুমোদন চাই।

(গ) কনডেনসড এম.বি ও বি.ই কোর্স যথাক্রমে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলিতে প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের যথোপযুক্ত সংস্কার ও সরঞ্জাম চাই। এজন্য যথোপযুক্ত টাকা মঞ্জুরি ও সেই টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঙ) সপ্তম মান হতেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোকেশনাল কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। প্রবৃত্তি অনুসারে (aptitude) শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

৭। অবিলম্বে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য আগামী বৎসরের মধ্যে- ক) প্রত্যেক শহরে বালিকা বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন মেয়ে হোস্টেল স্থাপন করতে হবে।

(খ) উক্ত পরিকল্পনার কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করতে হবে এবং উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তার নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। মোহাজের ছাত্রদের শিক্ষার সকল সুযোগদানের জন্য- (ক) গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত কমিটি নির্ভরযোগ্য বোর্ডের সাহায্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে অবিলম্বে কাজ শুরু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উক্ত পরিকল্পনার কাজে পর্যাপ্ত টাকা মঞ্জুর করতে হবে এবং উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) পরীক্ষার্থী মোহাজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফি মওকুফ, বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যারা সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারে নাই তাদের পরীক্ষার সাময়িক অনুমতি দিতে হবে।

৯। অবিলম্বে ছাত্রাবাসের সমস্যার প্রতিকারার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করতে হবে।

১০। হুকুম দখলীকৃত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসগুলির হুকুম দখল আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১১। (ক) বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

(খ) বাংলাভাষা আন্দোলনের সময় জনতার মিছিলের মুখে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সকল প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পরিপূর্ণ করতে হবে এবং তা কেন এতদিনে ও পালন করা হলো না তাহার কৈফিয়ত দিতে হবে।

(গ) শিক্ষার উর্দ্ধতন মান পর্যন্ত মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে চালু করার আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

(ঘ) আরবিহরফে বাংলা লেখার ১৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র অবিলম্বে তুলে দিতে হবে এবং এ ধরণের কোন প্রকার সরকারি প্রচেষ্টা করা চলবেনা।

(ঙ) পাকিস্তান রেডিওর উর্দু মিশ্রিত বিকৃত বাংলা প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পাক রেডিও প্রোগ্রামে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলা থাকতে হবে। বাংলার খ্যাতনামা যে সকল ব্যক্তিকে রেডিও হইতে বহিষ্কার করা হয়েছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে এবং অবিলম্বে তাদেরকে ফিরিয়া আনতে হবে।

১২। (ক) ছাত্রদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রামে যোগদান করায় এ পর্যন্ত যতজনের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাহাদের সকলের ওপর হতে বহিস্কার আদেশ ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিনাশর্তে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

(খ) স্কুল-কলেজে মিটিং ইত্যাদির গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে এবং কোন কারণেই স্কুল-কলেজ পুলিশের হস্তক্ষেপ চলবে না।

(গ) সমস্ত ছাত্র বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি অথবা প্রকাশ্য আদালতে বিচার করতে হবে।

১৩। জাতিসংঘের মানবিক অধিকার বিলের সর্ব স্বীকৃত আদেশের খাতিরে শিশুশ্রম (Child Labour) রদ করার এবং ছাত্র ও যুব সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবিলম্বে একটি স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। (ক) পূর্ব পাকিস্তানের একটি সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার্থে অবিলম্বে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে।

১৫। সরকারি নীতির ফলে উদ্ভূত শিক্ষা সংকোচনের কারণ ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণের জন্য ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মিলিত বেসরকারি কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

১৬। পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর দমননীতি চালাবার জন্য যে গোপন সার্কুলার দিয়াছেন (Memo No. 300 G.A.C) অবিলম্বে তাহা প্রত্যাহার করতে হবে।[৫] ছাত্রদের এই সব দাবির ফলে পূর্ব বাংলায় একটি কার্যকর শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মেলনে গণশিক্ষা পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিক্রিয়া

পূর্বে সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক লিখতেন শিক্ষকগণ। প্রকাশকগণ সেগুলো ছাপিয়ে জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালকের অধীনে টেক্সট বুক কমিটির কাছে দাখিল করতেন। তারা পুস্তক বাছাই করে প্রতি বিষয়ের জন্য একাধিক পুস্তক অনুমোদন করতেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের পর পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পূর্ববঙ্গ সরকার টেক্সটবুক কমিটি উঠিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত টেক্সটবুক বোর্ড স্থাপন করে। স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিপননের দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। টেক্সট বুক কমিটির আমলে শিক্ষকগণ দশ-বিশটি অনুমোদিত বইয়ের মধ্য হতে যে কোন একটি বেছে নিতেন। নবম-দশম শ্রেণীতে গিয়ে সমগ্র দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা একই সাহিত্য পুস্তক পড়ত। টেক্সটবুক বোর্ড শিক্ষকদের হাত থেকে সর্বোত্তম বই বেছে নেয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয় তাই পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি টেক্সটবুক বোর্ড প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে। সমিতির উদ্যোগে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটিই ছিল পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রথম শিক্ষা সম্মেলন যাতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গুরুত্বপূর্ন বক্তৃতা দেন।[৬]

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের (১৯৫৭) বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের প্রতিক্রিয়া

যুক্তফ্রন্ট সরকার জোটবদ্ধভাবে বেশি দিন ক্ষমতায় ছিল না। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান বিভিন্ন সময়ে প্রাদেশিক সরকারে ছিলেন। মাঝে কিছুদিন গভর্ণরের শাসনও জারি ছিল। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত সরকার একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল ছাত্র জনতার শিক্ষা বিষয়ক দাবির প্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ভিত্তিতে। এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ কোন রিপোর্ট প্রদান করেনি বরং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশ পেশ করে মাত্র। কিন্তু এই কমিশনের মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মাদ্রাসা ও ইসলামপন্থী ব্যক্তিবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিভিন্ন সভা সমাবেশে। কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তাহলো: A reappraisal of the Madrash type of education is also called for. This education does not do any good either to the individual or to the society. It will be no exaggeration to say that Madrasha education is a total waste. [৭] এই শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনেও কোন কাজ দেয় না এবং সমাজ জীবনেও কোন কাজ দেয় না। যদি বলা হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণ অপচয়, অপকর্ম তাহাতে কোন অতিরিক্ত বলা হবে না। সমালোচকরা মনে করেন এই উক্তি অত্যন্ত অশোভনীয় হয়েছে। কমিশনের অন্য একটি উক্তিতে বলা হয়। A system of universal, compulsory and free education for all boys and girls between the ages of 6 and 14 years should be introduced within the course of the next 15 years, if not earlier"[৮] বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদেরকে দেওয়া বাধ্যতামূলক, না দিলে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে হবে অথচ তথায় কোরআন হেফজ করার বন্দোবস্ত রাখাতো দূরের কথা কোরআন পড়ার নাম গন্ধেরও উল্লেখ সেখানে রাখা হয়নি। এছাড়াও প্রাইমারীতে খেলা-ধূলা গানবাদ্য ও নাচ রাখারও সমালোচনা করা হয়। Co Education in secondary schools should be permitted এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বলা হয় হাই স্কুলে যুবক যুবতীদের এক সাথে পড়তে দিলে চরিত্র, ধর্ম ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাদের পৃথকভাবে পৃথক পরিবেশে পড়ার সুপারিশ করা হয়। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডিগ্রী কোর্সের সাথে কোরান হাদিস শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানায়।[৯] শিক্ষা সংস্কার কমিশনের (১৯৫৭) বিপক্ষে বিবৃতিপ্রদান এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সামিতির সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ পূর্বের শিক্ষা সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হতাশা প্রকাশ করেন এবং বলেন, আগের সংস্কার কমিশনে সুপারিশ শুধু সুপারিশই রয়ে গেছে। শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের আমলেও একাধিক কমিটি হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। জনাব আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর সময়েও শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল কিন্তু এই কমিটিও শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সুফল বয়ে আনেনি। কমিটি সমূহের রিপোর্ট কখনো জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়নি। এ জন্য আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট কাগজে প্রকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করার আহ্বান জানান হয়। এবং এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান। [১০]

১ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে ঢাকা ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার খাদেম জনাব রশিদুদ্দীন আহাম্মদ শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আজ দশ বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

অতীত হইল পাকিস্তান হাছিল হইয়াছে। এই দশ বৎসরে শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী সরকার সমূহ আদৌ চিন্তা করেন নাই। সম্প্রতি বর্তমান সরকার শিক্ষা সংস্কার কমিশনের এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। মনে হয় কমিশনের রিপোর্ট যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য একথা রিপোর্ট প্রণয়নকারী লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এছলামী তমুদ্দুন রক্ষা ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ সেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ছক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। প্রত্যেকটি মুসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার সহিতোজড়িত। ব্রিটিশ আমলেও বাংলায় মক্তব শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং কোরআন ও দিনিয়াৎ শিক্ষাকে বলবৎ করা হইয়াছিল। আর আজ স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রাইমারী শিক্ষা হইতে কোরআন ও দীনিয়াতকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা শিক্ষা সচিবকে জানাইয়া দিতেছি এই কোরআন ও দীনিয়াৎ শিক্ষার উচ্ছেদ সাধনকে পাকিস্তানের একটি মুসলমানও বরদাশত করিবে না। শিক্ষা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত অবান্তর উক্তি করিয়াছেন উহার সমালোচনা করিতেও একজন পাক নাগরিকের দুঃখ ক্ষোভের সীমা থাকে না। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে, পাকিস্তানের মুসলমানেরা তাহা কখনো সহ্য করিবে না। যদি জনমতের বিরুদ্ধে জবরদস্তি করিয়া এই রিপোর্ট কার্যকরী করা হয় তাহা হইলে মুসলিম জনসাধারণ উহা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। তাহারা উহার প্রতিবাদে গণআন্দোলন করিতে বিন্দু মাত্র ইতস্তত করিবে না।"[১১]

১৯৫৭ সালের ১ অক্টোবর নেজামে ইসলামি পার্টির উদ্যোগে বিয়ানীবাজার স্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল লতিফ। এই সভা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সমীপে জোর দাবি জানায় যে, "আইন কমিশন হতে জনাব আই আই কাজি ও জনাব পারভেজকে বাদ দেওয়া হোক। কারণ যারা নবীর (সাঃ) সুন্নতকে সরাসরি অস্বীকার করেন ইসলামি আইন কমিশনে তাদের স্থান পাওয়া শুধু হাস্যকর নয় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিপূরক বটে এবং উপযুক্ত আলেম দ্বারা বোর্ড গঠন করা হোক। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ইহা ইসলামি শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র মাত্র। সুতরাং এই সভা দাবি করছে অবিলম্বে কমিশনের রিপোর্ট এমনভাবে সংশোধিত করা হোক যাতে মুসলমান জন সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ লাভ করতে পারে।" [১২]

১১ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হলে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ ইয়াছিন। সভায় রিপোর্টের নিন্দা করে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বক্তৃতায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

"এই সভা কমিশনের রিপোর্টকে ইসলাম দ্রোহিতার শামিল বলে অভিহিতোকরছে এবং রিপোর্ট হতে অনৈসলামিক ধারা সমূহ বাদ দিয়া ইহা সংশোধন করার জোর দাবি জানায়। এই রিপোর্ট প্রাইমারী স্কুল সমূহে কোরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় অত্রসভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অনতিবিলম্বে শিক্ষা কমিশনে

Dhaka University Institutional Repository
রিপোর্ট সংশোধন করতঃ কোরআন ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জোর দাবি জানায়। সরকার কর্তৃক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত টাকা বন্টনের ব্যাপারে মাদ্রাসাসমূহের প্রতি বৈষম্য না করে স্কুলের সমপরিমাণ মাসিক সাহায্য ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য দানের জোর দাবি জানায়।" [১৩]

১২ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে বগুড়া জেলার অন্তর্গত জোড়া নজমুল উলুম সিনিয়র মাদাসা প্রাঙ্গনে আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ মুযাম্মিল আলীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, "কমিশনের রিপোর্ট ধর্ম ও কোরান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারি মঞ্জুরিপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত দেশের মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রাখা হবে না। এই সভা উক্ত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সভা মনে করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তার সরকারি আইন কানুন ও রীতিনীতির দ্বারা ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকীর্ন করে তুলেছিল এখন তারা স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী মুসলমান দ্বারা শাসিত তবুও তাদের সেই আন্তরিক দাবিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই জন্য সভায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্র হতে বৈষম্যমূলক নীতি উঠিয়ে দিয়ে তথায় জনমতের সমর্থনীয় ইসলামি বিধান প্রবর্তনের জোর দাবি জানায়। তাদের ধারণা একমাত্র ধর্মশিক্ষার অভাবেই দেশে নৈতিক চরিত্রহীনতা ও দূর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে।" [১৪]

শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে সারা দেশে অসংখ্য প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ সভায় মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক অংশ গ্রহণ করে। মোট ৮৫টি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত। প্রতি সভায় শিক্ষা সংস্কার কমিশন রিপোর্টের ইসলামি শিক্ষার প্রতি উপেক্ষামূলক ধারাগুলি প্রত্যাহার, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত ১নং ধারা ১০নং ১নং ধারা এবং ১২নং ধারার পরিবর্তন করে মুসলমান বালক বালিকাদের জন্য কোরআন ও ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং নৈতিকতা বিরোধী ধারাগুলি প্রত্যাহার, মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ১০নং ধারায় উল্লেখিত যুবক যুবতীদের সহশিক্ষার সুপারিশ বর্জন এবং মাদ্রাসা সম্পর্কিত ১১নং ধারায় মাদ্রাসা স্থাপন করার জন্য পুর্বাহ্নে লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা সম্পুর্নরূপে বাতিলের দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। [১৫] ১ জানুয়ারি ১৯৫৮ সালে ঢাকা জেলা বোর্ড হলে মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর এর সভাপতিত্বে শিক্ষাবিদদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকে বাংলা ও উর্দুভাষায় প্রকাশ করে ধীরভাবে বিবেচনার জন্য তিন মাসের সময় দাবি করা হয় এবং ইহার পর সরকারি উদ্যোগে পুনরায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা শামসুল হক এবং গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। সভায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি পর্যায়ে উন্নীত করার দাবি জানান হয়। সভায় আরো প্রস্তাব করা হয় যে, দেশে শিক্ষা পুনর্গঠনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার বিভিন্নস্তরে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। গোলাম আজম বলেন শিক্ষার মত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের পক্ষে অনুচিত। গোলাম মোস্তফা বলেন, এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যদি জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার শামিল হবে। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য তমুদ্দুন ও আদর্শ বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা চলবে না। সভায় প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিল। [১৬]

সংস্কার কমিশনের (১৯৫৭) প্রক্ষে সরকারি প্রতিক্রিয়া

১৯৫৭ সালের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা এবং প্রতিবাদের কারণে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এক এশতেহারে বলা হয়: প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের কেবলমাত্র একটি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রশ্ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট যে সব সুপারিশ করা হয় সে সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এই মর্মে প্রবল সমালোচনা উত্থিত হয় যে, সরকার এবং কমিশন মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা বিলোপের পক্ষপাতী। কমিশনের রিপোর্ট সতর্কতার সাথে বিবেচনার পর সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কমিশনের যেরূপসহানুভূতিশীল ও ঘনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উহার রিপোর্ট বিবেচনা করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই এবং উহার আসল উদ্দেশ্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে আরবী,পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য কমিশনের ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধেও কমিশন কোনরূপ সুপারিশ করে নাই। ভাষা সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে যাহা উল্লেখ করা হয়েছে তাহা কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যমের সহিতোসংশ্লিষ্ট এবং স্বভাবতই উহা মাতৃভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরে আরবী, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কমিশনের সুপারিশের সহিতোসঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সমূহ অনুসন্ধান ও এই সম্পর্কে ১৯৫৮ সালের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট পেশের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে একক সাধারণ শিক্ষার প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে কমিটি মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখবে। বিশেষ গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখার ব্যবস্থা করা হবে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। [১৭]

৪ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে-

চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খান প্রক্টর জগন্নাথ কলেজ, সদস্যবৃন্দ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী অফ এডুকেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পুর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মওলানা মকবুল আহম্মদ, ইব্রাহিম খান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন এস.পি.এ, ফেনী আলিয়া

Dhaka University Institutional Repository
মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা মোঃ ওবায়দুল হক, শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা তোজাম্মেল হোসেন এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মওলানা মুফতী আমিনুল এহসান। শিক্ষাপদ্ধতির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে বলে:

১। জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির মনোভাব যাতে গড়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে অধ্যবসায় ও সেবার অভ্যাস যাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি যাতে হয় এবং দেশের উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার যোগ্য ও চরিত্রবান লোক যাতে গড়ে উঠতে পারে এমনভাবে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করতে হবে।

৩। ছাত্রদের আগ্রহ এবং বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা এবং তাদেরকে শিক্ষার কোন বিভাগে ভাল করতে পারবে তা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে; কারিগরি, কৃষি ও অন্যান্য পর্যায়ের ছাত্রদিগকে গ্রহণের সময়ে তাদের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। [১৮]

মুলত: শিক্ষা সংস্কার কমিশনের (১৯৫৭) রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। শিক্ষার অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তেমন বিরোধিতা করা হয়নি বরং কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৯) বা শরীফ কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ৫ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে মন্ত্রীসভা পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা শুরু করে। পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চূড়ান্ত হলে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভা ১৯৬০ সালের ৭ জানুয়ারি কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদন করে। ৮ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এক বেতার ভাষণে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সমূহের চারটি বিষয়ের প্রতি জাতির মনোযোগ আহ্বান করে বলেন, 'প্রয়োজনীয় পন্থায় আমাদের জনশক্তি তথা তরুণ তরুনীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার পথ নির্দেশ এই শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনায় রহিয়াছে।' তিনি আরো বলেন, 'কমিশনের সুপারিশে এই মর্মে অভিমত প্রদান করা হইয়াছে যে, শিক্ষার্থী শিশুর শিক্ষাগত সুযোগ পিতামাতার সম্পদের দ্বারা নির্ধারিত না হইয়া তাহার বুদ্ধিগত সামর্থ ও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত।' তিনি বলেন আমি আজ একথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, বহু অভিজ্ঞজন ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রচুর আলাপ আলোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি বাস্তবানুগ ও কার্যোপযোগী পরিকল্পনা বাহির করা হইয়াছে। ইহা অনুসরণ করিলে নিঃসঙ্কোচে আমাদের জনগনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। শিক্ষা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে দেশের এই প্রয়োজন পূরণ হইবে বলিয়া আমি মনে করি। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আমার সরকার যে সিদ্ধান্ত গহণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ্যে

Dhaka University Institutional Repository
প্রচার করা হইতেছে। সুতরাং আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন মনে করিনা। তবে এই পরিকল্পনার চারটি দিক রহিয়াছে। প্রথমত: আমাদের প্রয়োজনীয় পন্থায় কিভাবে জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাতে তাহার পথ নির্দেশ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত: কলা অথবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত ফলোদয় যাহাতে যোগ্যতা ও কৃতিত্বের দিক দিয়ে বিশেষ করে অন্য যে কোন শিক্ষার সহিতোতুলনা যোগ্য হয়, ইহাতে তাহার আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃতীয়ত: পিতামাতার সম্পদের দ্বারা না হইয়া বরং শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত সামর্থ ও প্রবণতার দ্বারা শিক্ষাগত সুযোগ নির্ধারিত হওয়া উচিত বলিয়া ইহাতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। চতুর্থত: কিরূপে মুসলিম হিসেবে আমাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা যায় এবং দুইটি অঞ্চল পৃথক হওয়ার ফলে ও ভাষাগত বিভিন্নতার দরুন পাকিস্তানে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে কিরূপে সেগুলির কয়েকটি অতিক্রম করা যায় তাহার পথ নির্দেশও ইহাতে রহিয়াছে।' [১৯]

পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামি করণের চক্রান্ত আইয়ুব খানের সময়ে চরম আকার ধারন করে। আইয়ুব খান বলেন "পাকিস্তান আদর্শ রাষ্ট্র এবং ইসলামের মূলনীতি আদর্শই আমাদের জাতীয় উৎস। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে জাগতিক উন্নতিতেও আমাদের তৎপর হতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "ইসলামি করণ প্রক্রিয়ার অর্থ হিসবে ধর্মীয় শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হয়েছে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পাঠ্যক্রম সংশোধণ করে ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।"[২০] কিন্তু আইয়ুব খানের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় যেমন চরম আঘাত হানে তেমনি শিক্ষার আর্থিক দায়দায়িত্ব শুধু জনগনের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং শিক্ষা সংকোচন নীতিকে প্রবল করা হয়। এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা রুখে দাড়ায় এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদের এই আন্দোলনে সর্বস্তরের জনগণেরও সমর্থন ছিল।

শরীফ কমিশনের আটজন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিলেন চারজন। দুইজন শিক্ষা প্রশাসন থেকে, একজন অর্থনীতিবিদ একজন প্রকৌশলী অধ্যাপক। এই চারজনই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট আদৌ সকল সদস্যের সমবেত ও সমন্বিত চিন্তার ফসল কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেও এর দায়দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলেনি, গ্রাম-গঞ্জে স্কুলঘর নির্মানের ব্যয় গ্রামগঞ্জের দরিদ্র জনসাধারনকেই বহন করতে বলা হয়। ভাষার বিতর্কিত প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। জোর সুপারিশ রাখা হয় কতিপয় উন্নত মানের আবাসিক স্কুলের জন্য। এখানে কল্যানধর্মী রাষ্ট্র বলতে আসলে একটি সুবিধাভোগী কল্যাণকেই বোঝান হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কাঠামোর গুনগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি তবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ে। সমস্টিগত স্বার্থ চাপা পড়ে যায় অন্যদিকে কতিপয় ভাগ্যবানের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ব্যয় বহুল আবাসিক স্কুল গড়ে উঠে। প্রতিটি সেনানিবাসে একটি করে বনেদি স্কুল গড়ে উঠে। প্রতিটি সেনানিবাসের একটি করে বনেদি স্কুল দেশের শিল্পপতিদের কাছ থেকে উপঢৌকন পায়। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।[২১]

চাঁদপুর কলেজের অধ্যক্ষ এ ডবলু চৌধুরী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বলেন " ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সহিতোযুক্ত করা সম্বন্ধে রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে দেশের বেসরকারি কলেজগুলির ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই সম্পর্কে সরকার কোন নীতি গ্রহণ করবেন রিপোর্টে তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। চাঁদপুর কলেজের ছাত্রীরা বলেন, নারী শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি শর্ত অত্যন্ত কঠোর। মফসলের ছাত্রীদের অভিভাবকরা তাদের কন্যাদের দূরাঞ্চলে ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরণ করতে রাজী হবে না।" [২২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ভাইস চ্যান্সলর জনাব হামিদুর রহমান ২১/১/১৯৬০ সালে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান কালে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের প্রশংসা করলেও কমিশন কর্তৃক আই. এ পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যায়ের আওতা হতে সরিয়ে ফেলার সুপারিশের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং কারিগরী ও বৃত্তি মূলক শিক্ষাদানের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সমালোচনা করেন। [২৩] শরীফ কমিশনের সুপারিশে ছাত্রদের বেতন তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেবার সুপারিশ করা হয়। প্রচলিত বেতন যোগাড় করতে দেশের দরিদ্র পিতা-মাতাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় তার উপর ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করায় অনেক পিতামাতা পুত্র-কন্যার লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। ছাত্ররা পর পর দুইবার অকৃতকার্য হলে তাদের আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হবে না। কারণ স্কুলের স্থানাভাবের দরুণ এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এইরূপ বহু নজীর আছে যে দু'বার তিনবার অকৃতকার্য হয়ে চতুর্থবার কৃতকার্য হয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এইরূপ ব্যবস্থায় বহু ছাত্রের শিক্ষা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ছাত্রদের অকৃতকার্য হওয়ার পিছনে প্রচলিত ব্যবস্থাও দায়ি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ষাটটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে সিনিয়র স্কুলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত, সাতক্ষীরা ও অন্যান্য কয়েকটি কলেজের ডিগ্রী ক্লাশ বাতিল করে দেয়া, উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরকারি কলেজ রাজশাহী কলেজকেও বেসরকারি কলেজে পরিণত করার সিদ্ধান্তের ফলে দেশের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এছাড়া ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ষাটভাগ ছাত্রদের নিকট থেকে আদায় করার সিদ্ধান্ত এবং কমিশনের সিনিয়র জুনিয়র ন্যূনতম শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। [২৪]

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট গ্রন্থকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল আমাদের জাতীয় জীবনের ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে এবং উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে। অন্যত্র উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্টতর

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।[২৫] শরীফ কমিশন পাকিস্তানের জন্য একটি অভিন্ন বর্ণমালার সুপারিশ করে অথচ সাত বৎসর পূর্বে পূর্ব বাংলায় সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার জনগণ যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে তখন শরীফ কমিশন অত্যন্ত সুকৌশলে ভাষা সম্পর্কে বলে: পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করতেই হয় তাহা হলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে, সেই আরবীর (নাস্‌খা) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায়না। এছাড়াও যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, রোমান বর্ণমালা উর্দু ও বাংলার মধ্যে কেবলমাত্র সামান্য পরিমানেই একটি সাধারণ বিষয়ের ব্যবস্থা করত পারবে।[২৬]

বলা যেতে পারে বাঙালির উপর বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে পশ্চিম পাকিস্তানিশাষক গোষ্ঠী ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে আরবীকে বাংলার বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। শরীফ কমিশনই পূর্ব বাংলায় ভাষা বিতর্কের অবসান কল্পে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাংলা বর্ণমালা সমুহের সংস্কার ও উন্নয়নে করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালার এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারন করা উচিত, যাহা পাকিস্তানি ভাষা সমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হবে। এছাড়াও কমিশন আরো সুপারিশ করে: (ক) হয় সরকারকে নাসখ বা রোমান বর্ণমালা সমূহ উদ্ভাবনে এবং বাংলা বর্ণমালা সংস্কারে উৎসাহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে। অথবা (খ) বিকল্পভাবে সরকারের পক্ষে তিনটি ভাষাবিদ কমিটি নিয়োগ করা উচিত যাহাদের একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নয়নকৃত মুদ্রণযোগ্য একটি উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ করিব, দ্বিতীয়তটি বাংলা বর্ণমালা সংস্কার করবে এবং তৃতীয়টি উর্দু ও বাংলার জন্য একটি রোমান বর্ণমালা গঠন ও মান নির্ধারন করবে।[২৭] শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শরীফ কমিশন অর্থ সংস্থান সম্পর্কে শিক্ষাকে বিনিয়োগ অর্থাৎ লাভ-ক্ষতির ব্যবসার সাথে তুলনা করেছে। কমিশন বলে, শিক্ষা সস্তায় পাওয়া যায় না। অর্থনীতিবিদের সমালোচনা করে বলে যে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগনের রীতি ছিল শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হিসেবে না দেখিয়ে একটি ব্যয়বহুল সমাজ সেবামূলক কাজ হিসেবে দেখা।[২৮]

শরীফ কমিশনে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা বলে মন্তব্য করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতটা দাবি জানিয়ে থাকে উহার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাহাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমক স্কুল এবং নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করায় জনসাধারনের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অবৈতনিক শিক্ষার ধারনা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।[২৯] কমিশনের এই ধরনের মন্তব্য পূর্ব বাংলার জনগণ মেনে নিতে পারেনি। তারা

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের এই ধরণের মন্তব্যকে সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে দায়িত্ব না নিয়ে জনসাধারণের উপর সে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার দূরভিসন্ধি মনে করে।

শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে যা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল তাহলো উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ ছিল: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে আমরা অতীব জোরের সহিতোসুপারিশ করছি যে, স্নাতক (Graduate) ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বৎসর মেয়াদী কথা উচিত হবে।[৩০] কশিনের সুপারিশের এই বিষয়টি ছাত্ররা শিক্ষা সংকোচননীতি হিসেবে বিবেচনা করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৫৯) প্রকাশিত হলে শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশে ছাত্র সমাজ সুসংগঠিত ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্ররা স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। প্রথমে আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ সময়ে সারা দেশে মেডিকেল স্কুল ও ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন এমনকি ধর্মঘট পালন করছিল। তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাশ কোর্সের ব্যাপারে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সর্ব প্রথমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ডিগ্রী ক্লাশের ছাত্র এম.আই. চৌধুরী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা ইংরেজির অতিরিক্ত বোঝার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ডিগ্রী স্টুডেন্ট ফোরাম নামে সংগঠন পরে ইষ্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম নামে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এই আন্দোলনে নিয়োজিত ছিল।[৩১]

শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের গুনগত পরিবর্তন ঘটে ১৯৬২ সালের ১০ আগষ্ট। ঐদিন ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনয়নের নেতা কাজি ফারুক আহমদ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষা আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন এক ও অভিন্ন । ১০ আগষ্টের সভায় ১৫ আগষ্ট ১৯৬২ সালে সারাদেশে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং দেশব্যাপী সকল ছাত্রদের কাছে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ১৫ আগষ্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল কলেজের ছাত্ররা এতে অংশ গ্রহণ করে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালের কর্মসূচী পালনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটারিয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হন। এতে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর পক্ষে এনায়েতুর রহমান, কামাল আনোয়ার বাসু, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক, জগন্নাথ কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, কায়দে আজম কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি নূরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ বাগমার প্রমুখ।[৩২]

১৯৬২ সালের ১৫ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ। প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অবিরাম ধর্মঘট পাল করা হয়। নয়-দশ বৎসরের স্কুলের বালক-বালিকারা ও মিছিলে সামিল হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে প্রেসনোটে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয়। ঐ দিন ভোরে ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করে। তারা কার্জন হলের সামনে মন্ত্রিসভার সদস্য হাসান আসকারির মার্সিডিজ গাড়ী পুড়িয়ে দেয় ও পুলিশের জিপেও আগুন ধরিয়ে দেয় ছাত্ররা। সার্জেন্ট হাফিজ নবাবপুর রেলক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে ধাওয়া গ্রেফতার ও গুলি চালালে কয়েকজন শহীদ হন। হাই কোর্টের নিকট পুলিশ গুলি করলে এখানেও কয়েকজন শহীদ হন। ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে মেহনতি মানুষের শতকরা ৯৫ জন অংশ গ্রহণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে নৌকার মাঝিরা বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে আসে।[৩৩]

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে পল্টন ময়দানে সব সংগঠনের ছাত্রদের নিয়ে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অবিলম্বে ছাত্রদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আপাতত আন্দোলনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পল্টন ময়দানে ছাত্রদের উদ্যোগে এটাই ছিল প্রথম জনসভা এবং নাম দেয়া হয় ছাত্র জনসভা। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের কয়েক দফা আলোচনা হয় এবং সরকার শরীফ কমিশন রিপোর্ট স্থগিত রাখার ঘোষনা দেন। একই সাথে ১৯৬৩ সালের জন্য যে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছিল পরীক্ষা না নিয়েই তাদের সকলকে পাস করিয়ে দিয়ে ডিগ্রী প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যা পরবর্তীকালে আইয়ুব খার স্বৈরাচারী শাসন বিরোধী এবং গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের জাতিসত্বা বিকাশের আন্দোলনে দানা বাধে। রিপোর্টে এমনসব উপাদান ছিল যা বাঙালি জাতিসত্বার আশা আকাঙ্খা বিরোধী অর্থাৎ সমগ্র রিপোর্টটি রাজনৈতিক ধ্যান ধারনা এবং সমাজ চেতনার আওতাধীন ছিল যার ফলে একে বাতিল করার আন্দোলন শিক্ষাঙ্গন থেকে প্রসারিত হয়ে দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই রিপোর্টের অনেক টেকনিক্যাল উপাদান ইতিবাচক ছিল এবং সেগুলি পরবর্তীকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু হয়েছে। যেমন কোর্স সিস্টেম, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স। আন্দোলনের চাপে রিপোর্টটির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ হওয়া তো দূরের কথা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার করে স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনীত হয়। [৩৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ইউরোপের আদলে গড়ে তোলা হলেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশিশাসকদের প্রতিষ্ঠিত পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা দেয়নি। তাদের সাথে অব্যাহতোবিরোধ করেই বিশ্ববিদ্যালয়কে তার স্বাতন্ত্র্য যতটুকু সম্ভব রক্ষা করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১৯২২ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে স্যার আশুতোষ সিনেট সদস্যদে প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন;

> Take it from me that as long as there is one drop of blood in me, I will not participate in the humiliation of the university This university will not be manufactory of slaves. We want to think truly we want to teach freedom. We shall inspire the rising generation with thoughts and ideals that are high and ennobling. We shall not be a part of the secretariate of the government What is the offer? Two and a half lacs? And you solemnly propose that we should barter away our independence for it. What will Bengal say? What will India say? What will the post graduate teacher say? They will resign tomorrow. They will go into banishement rather than take money under those humiliating conditions. What will posterity say? Will not future generations cry shame, that the Senate of the Calcutta University

Dhaka University Institutional Repository

bartered away their freedom for two and a half lacs of rupees? We will not take the money. We shall go from door to door all through Bengal. Our cause is just and we shall not submit to humiliating conditions. Our postgraduate teachers would starve themselves, than rather give up their freedom. I call upon you, as members of the Senate to stand up for the rights of your University. Forget the government of India. Do your duty as senators of this University as true Sons of your Almamater. Freedom first freedom second freedom always nothing else will satisfy me" [৩৬]

পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খার শাসনামলে প্রণীত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স-১৯৬১। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ৮নং ধারার ১নং উপধারাতে। এতে বলা হয়েছে "The provincial Government, shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the university its building, laboratories and equipment, and of any institutions associated with the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquirey to be made in like manner in respect of any matter connected with the University. [৩৭] এই অধ্যাদেশের ৮ নং ধারার ৩নং উপ ধারায় বলা হয়েছে "The provincial Government shall communicate to the Syndicate its views with reference to the results of any such inspection or inquiry and shall after as curtaining the opinion of the Syndicate thereon, advise the university upon the action to be taken" [৩৮] সিন্ডিকেট কোন সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে সরকার কি করবেন তাও স্পষ্ট করে একই ধারায় ৫ নং উপধারাতে উল্লেখ করা হয় এতে বলা হয় "Where the syndicate does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Provincial Government, the Gevernor, exercising his individual judgment may after considering explantations furnished or representaions made by the syndicate if any issue such direction as he may think fit and the Syndicate shall comply with those directions. [৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে সরকার যে কোন আদেশ দিতে পারবেন বলে ১১ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় " Notwithstanding anything to the contrary contained in this ordinance or in any other law for the time being in force, the Chancellor may if he is satisfied that exceptional circumstances seriously interfering with the normal activities of the University exist, pass such orders as he considers necessary in the interest of the University. Any such order passed by the Chancellor shall be binding on the authorities, officers and members of the University and the Vice-Chancellor shall give effect to such orders. Such order shall not be called in questions in any count of low"[৪০] এই আইনের দ্বারা ভাইসচ্যান্সেলর কার্যত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি সরাসরি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপস্থিতি সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে । সিন্ডিকেট ও একাডেমিক পরিষদে সরকারি মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। ডীন নির্বাচন প্রথা বাতিল করে বলা হয় ডীন উপাচার্য কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। কিন্তু এই আইনের সবচাইতে সমালোচিত অংশটি ছিল Dacca University Employees Efficiency and Discipline statutes. এই আইন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বা শিক্ষককে যে কোন অজুহাতে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ৩নং ধারার 'ই' উপধারাতে বলা হয়েছে যে, "... is engaged or is reasonably suspected of being engaged in subversive activities or activities detrimental to the interest of the University, or to the state or is reasonable suspected of being associated with others engaged in such activities, and whose retention in service is therefore considered prejudicial to the interest of the University or national security"[৪১] শরীফ কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তীব্র ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। শরীফ কমিশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হয়েছিল। ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করার জন্যই সরকার ১৯৬১ সালের অর্ডিন্যান্স জারি করে। ১৯৬১ সালের আইনের মাধ্যমে শিক্ষকদের একাডেমিক স্বাধীনতা হরন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছিলেন " In the context of Bangladesh: Teaching of Theoritical Physics is a must" একটি নির্দোষ প্রবন্ধ According to his concept of truth. তিনি বলেছিলেন এ সময়ে আমাদের যন্ত্রপাতি নাই। অতএব আমাদের মেধাবী ছাত্ররা যদি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পড়ে তাহলে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে।.এই প্রবন্ধ লেখার জন্য তাকে শুধু সতর্কই করা হয়নি তার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘ সময়। [৪২]

আইন পরিষদ সদস্যদের প্রতিক্রিয়া

প্রাদেশিক পরিষদে সরকার বিরোধী সদস্য মি: আব্দুল আলিম ও মোল্লা আবুল কালাম আজাদ শরীফ কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেন, শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট তৈরী করেছে তা পাগলের

Dhaka University Institutional Repository
প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী হঠাৎ ছাত্রদের অনেক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত ফিস এতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রসার এক রকম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টে ধনীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর এই কমিশনের একজন সদস্য হয়েও বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী পেতে হলে শতকরা ৭০ নম্বর পেতে হবে অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এর চেয়ে অনেক কম পেয়েও ১ম শ্রেণী পায়। ১ম শ্রেণী না পেলে ভাল চাকরী পাওয়া যায়না। ফলে C.S.P., P.S.P এবং ফরেন সার্ভিস এর মত উচ্চ পদের চাকরী গুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানিছাত্ররা অগ্রাধিকার পাবে এবং উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাবে সরকারি বৃত্তি নিয়ে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরী হবে কেরানী আর স্কুল মাস্টার। ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর পুলিশের সঙ্গে সহযোগীতা করে ক্লাশরুম ও হলো থেকে ছাত্রদের ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেন এবং ছাত্রদের অভিযুক্ত করে বিবৃতি দেন অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নিজে দাড়িয়ে জামিন হয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পুলিশের কাছ থেকে মুক্ত করেন। তার সহযোগীতায় ছাত্ররা পুলিশের হয়রানী ও ঝামেলা থেকে রক্ষা পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এমনসব অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন যার জন্য ছাত্ররা নির্বিবাদে নিরাপত্তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে পারছেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনি রাজনীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন ফলে যারা তার প্রিয়পত্র ও মতাদর্শের তাদের কোয়ার্টার ও প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মিসেস ফরিদা খান বি,এ ডিগ্রী নেন শান্তিনগর এবং এম. এ. তে দ্বিতীয় শ্রেনী পাস তাকে স্থায়ী শূণ্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয় অন্যদিকে বিভাগীয় প্রার্থী মিঃ সাজ্জাদ ইউসুফ খাঁর বিদেশিবিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেও তাকে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের এক মাসে মধ্যে মিসেস ফরিদা খান কোয়ার্টার পান অন্যদিকে সিনিয়র শিক্ষক যারা ১৫ বৎসরের বেশি সময় চাকরী করলেও তাদের কোয়ার্টার দেওয়া হয়নি। বাংলা বিভাগের মিঃ মনিরুজ্জামান প্রবেশিকায় ১ম বিভাগ, ইন্টারমিডিয়েট এ ১ম বিভাগ, বি.এ অনার্স-এ ১ম শ্রেণী এবং এম.এ-তে ১ম শ্রেণী পেলেও তাকে বাদ দিয়ে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয় মিঃ রফিকুল ইসলামকে যিনি প্রবেশিকা দ্বিতীয় বিভাগ, ইন্টারমিডেয়েট এ দ্বিতীয় বিভাগ, বি.এ (পাশ) তৃতীয় বিভাগ এবং এম.এ.তে ১ম শ্রেণী। ছাত্র আন্দোলনের কারণে ভাইসচ্যান্সেলর ৪/৫ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং পরীক্ষাসমূহ স্থগিত করা হয় ফলে ছাত্রদের সেশনজটের সৃষ্টি হয়। ভাইসচ্যান্সলরের নির্দেশে ছাত্রদের যে ভাবে টেনে হেঁচড়ে (manhandle) চোর ডাকাতের মত নিয়ে যাওয়া হয় তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও সভ্যদেশের ইতিহাসে বিরল। আসির কমিশন (Asir Commission) গঠন করা হয় কিন্তু সরকার এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ছাত্র মিঃ মোমেন ও সিরাজের বিষয়টির পুনতদন্তের দাবি করা হয়। পূর্বে জনগনের নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository
প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট সমস্ত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পাদপীট ছিল। এতে জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় কি হচ্ছে সে বিষয়ে জানতে পারত। কিন্তু সরকার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করে কোর্ট ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বাতিল করে সিন্ডিকেট গঠন করা হয়েছে যে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। [৪৩]

ছাত্রদের ওপর পুলশী নির্যাতন

১৯৬২ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের সময় ছাত্রদের উপর বর্বর হামলা চালান হয়। প্রচুর ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। অনেককে ফৌজদারী মামলায় জড়ানো হয়। সারা প্রদেশে সরকার ছাত্রদের উপর অত্যাচার চালায়। ছাত্রদের কোন সংবাদ পত্রিকার ছাপান নিষিদ্ধ থাকায় দেশবাসী তাদের কথা জানতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুইজন ছাত্রের ডিগ্রী প্রত্যাহার, ২২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে রাসটিকেট করা হয় এবং ২৪ জনের উপরে ১ বৎসরের জন্য মুচলেকা প্রদানের আদেশ জারি করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজনকে বহিস্কার করা হয়। ঢাকা কলেজ থেকে ১০ জন এবং আর্ট কলেজ থেকে ৭ জনকে বহিস্কার করা হয়। ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বয়কট আন্দোলনের স্মৃতি দিবস হিসেবে পালন করে। সরকারি দমননীতি প্রতিবাদ ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহতোরাখে। সরকারি দমনীতির প্রতিবাদে এবং মতিয়া চৌধুরীকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রীরা ১৯ সেপ্টেম্বরে শোভাযাত্রা করলে পুলিশ বর্বর আক্রমন চালায়। ফলে সমগ্র ছাত্রী সমাজ এবং ঢাকা শহরের মহিলো। সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সরকার একদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলে অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসন সংখ্যা কমানো হয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতার উপর নির্ভর না করে অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানের উচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাত্র আন্দোলনে ও সংগঠনে অংশ নেওয়া মেধাবী ছাত্রদের ভর্তি হতে বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের ছাত্রাবাসে স্থান দেওয়া হয়নি। [৪৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্র সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারে দাবিতে ১ এপ্রিল ১৯৬৩ সালে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সহিতোলক্ষ্য করিতেছি যে, "বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার প্রদেশব্যাপী ছাত্র নির্যাতনের যে স্টীম রোলার চালাইয়া যাইতেছে তাহা চরমে উঠিয়াছে। মাসের পর মাস ছাত্রদের আটক করে মূল্যবান ছাত্র জীবন নষ্ট করা হইতেছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। এই অত্যাচারের মাত্রা ছাত্রদের ছাড়িয়ে আপামর জনসাধারণের উপর গিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকদের দাবি মেনে না নিয়ে তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হইতেছে।"[৪৫] চট্টগ্রামের গুলিবর্ষণ ও ঢাকার ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। স্পীকার কর্তৃক ১২ টির মধ্যে ১১টি প্রস্তাব বাতিল করা হয় এবং কর্মসূচী পরিবর্তন করায় বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য ১২ এপ্রিল ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ঢাকায় ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের কারণে মূলতবী প্রস্তাবগুলি করা হয়। এছাড়া ও জাতীয় পরিষদে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারেও বৈষম্য প্রকাশ করা হয়। এ ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর পর্বে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ শেহাবুল্লাহ বলেন, শুধু মেধার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পকিস্তান হতে কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৫৭ জন মেধাবী ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। উক্ত সংখ্যার মধ্যে মাত্র ২৪৫ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। [৪৬]

ছাত্রদের প্রতিবাদ

১৫ এপ্রিল ১৯৬৩ সালে ছাত্রদের দাবি দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পুলিশের লাঠি চার্জ সম্পর্কিত অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, তিনি তার ওয়াদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্বভৌমত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট রহিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, দাবি দিবসের ঘটনাটি বিতর্কমূলক। বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫ শত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২০ জনের বেশি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নাই। বাকী সবাই কলেজের ছাত্র।' [৪৭] ছাত্ররা তাঁর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে হাঙ্গামা

গভর্ণর মোনায়েম খানের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অংশ গ্রহণকে কেন্দ্র করে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মোনায়েম খানের কাছ থেকে সনদ নিতে অস্বীকার করে। ছাত্রদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, মঈদ চৌধুরী, আলী হায়দার খান প্রমুখ যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চ্যান্সেলর নিয়োগের দাবি জানান। সর্বদলীয় ছাত্র প্রতিনিধিদের সমাবর্তন বয়কট সভায় সরকার সমর্থক এন.এস.এফ দল হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রক্টর অফিসে হকিষ্টিক, রড ইত্যাদি রাখা ছিল। শেখ ফজলুল হক মনী, রাশেদ খান মেনন সমাবর্তনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ ছাত্রদের নির্যাতন চালায় এবং ছাত্রদের ওপর গ্রেফতারী পরওয়ানা ও আত্মসম্পর্নের নির্দেশ দেওয়া হয়। সমগ্র প্রদেশে ১৪ শত স্কুল, ৭৪ টি কলেজ বন্ধ এবং ১২ শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ মার্চ দৈনিক আজাদ, সংবাদ ও ইত্তেফাকের ওপর শোকজ নোটিশ জারি করা হয় ও ত্রিশ হাজার টাকা জামানত তলব করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে এ সব পত্রিকায় শূন্য সম্পাদকীয় পরিবেশন করা হয় এছাড়া সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা চলবে না গলাটিপা প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল কর, 'বাক-স্বাধীনতা দিতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগাণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। সংবাদপত্রের মালিকরা রীট করে জয়লাভ করে। সরকার ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সব রকম সংবাদ প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে এক মাস কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র নির্যাতন

২৮ মে ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র নির্যাতনের ৩০ দিনের সংবাদ প্রচার করে। আজাদ প্রকাশ করেঃ কোন বিশেষ কারণে গত একমাস যাবত ছাত্রদের সম্পর্কে কোন সংবাদ আজাদে প্রকাশ করা হয় নাই। ৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রের এম.এ. ডিগ্রী প্রত্যাহার, ৫ বৎসরের জন্য ৪ জন ৩ বৎসরের জন্য ৬ জন এবং ২ বৎসরের জন্য ১৪ জনকে রাস্টিকেট করা হয় ও ২০ জন ছাত্রকে সদাচারের গ্যারান্টি দানের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ১৯ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। কলাভবনের ৩ জন এবং ঢাকা কলেজের ৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এম.এ ডিগ্রী প্রত্যাহারকারী ছাত্র ২ জন হলেন শেখ ফজলুল হক মনী এবং ইসমত আলী। পাঁচ বৎসরের জন্য যাদেও বহিস্কার করা হয় তাদের মধ্যে ঃ (১) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি কে এম. ওবায়দুর রহমান; (২) ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি একে বদরুল হক, (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনয়নের সহ-সভাপতি এ.এস.এম. রাশেদ খান মেনন এবং সওগাতুল আলম। তিন বৎসর জন্য বহিস্কার করা হয় তদের মধ্যে ঃ হায়াৎ হোসেন, আনোয়ারুল চৌধুরী, মনসুর উদ্দিন আহমদ, জাকির আহমদ, আব্দুল করিম, সৈয়দ মতিউর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক মিয়া, সিরাজুল আলম খান, কাজি মোজাম্মেল ইসলাম আরিফুর রহমান, হুমায়ুন কবির এবং কামালউদ্দিন শিকদার। মুসলেকা দিতে সম্মত না হওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ফেরদৌস কোরেশী এক বৎসরের জন্য বহিস্কার হন।[৪৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স পুনঃ সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ সংশোধন করে ২৪ নং ধারাটি সংযোজন করে। এতে বলা হয়ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমস্ত কলেজের শিক্ষকবৃন্দ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না বা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সমালোচনা করতে পারবেন না। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা ইহার অনুমোদিত কোন কলেজের কোন কর্মচারী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, মত প্রকাশ বা কোন ধরণের সাহায্য দান অথবা আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোপক্ষভাবে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। পাকিস্তানের কোন আইন পরিষদে সে প্রার্থী হতে পারবে না ক্যানভাস হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। অর্ডিন্যান্সের নয়া সংশোধনী অনুযায়ী উপরোক্ত কারণের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে অপসারন করার ব্যবস্থা আইনটিতে রয়েছে এবং চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বা কলেজ গভর্নিং বডির নিকট হতে অনুরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কাগজপত্র তলব করে তিনি যাহা বিবেচনা করবেন তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এই আইন অনুযায়ী যদি কোন অধ্যাপক মৌখিকভাবে বা সংবাদপত্রে লিখিত প্রবন্ধে সরকারি কার্যের কোন ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন তবে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বরখাস্ত হবেন। সরকারের সমালোচনা করে কোন মন্তব্য করা যাবে না অথচ সরকারের বা ক্ষমাতাসীন দলের পক্ষে প্রশাস্তিমূলক মত প্রকাশ করতে পারবেন। এই সংশোধিত অধ্যাদেশটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজ গভর্নিং বডির স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা হয়। কলেজ শিক্ষক সমিতি ও বুদ্ধিজীবীমহলো এই নতুন কালা কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কারণ এই আইনের দ্বারা তাদের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও খর্ব করা হয়। তারা দেশের রাজনীতিক গতি-প্রকৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার এমনকি তৃতীয় পাঁচশালা (১৯৬৫-৭০) পরিকল্পনার ভুলত্রুটি এবং কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক গলদ, বন্যা নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত আশু করনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি জাতীয় জরুরী কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মন্তব্য বা প্রবন্ধ লিখতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ২৪নং ধারাটির চ্যালেঞ্জ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুর রাজ্জাক ২৩ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে হাইকোর্ট একটি রীট আবেদন করেন। বিচারপতি সাত্তার এবং বিচারপতি আলীকে নিয়ে গঠিত ডিভিশনে বেঞ্চ প্রাথমিক শুনানীর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর একটি রুল জারি করে বিধিনিষেধ আরোপ সংশ্লিষ্ট নির্দেশটি কেন অবৈধ এবং বিধি বহির্ভুত বলে ঘোষণা করা হবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন। আবেদনকারীর কৌশলী ড. আলীম আল রাজী বলেন; 'সংশ্লিষ্ট সংশোধিত বিধানটি শিক্ষকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক, অধিকার খর্ব করেছে। উহা শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারে সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শাসনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে কোন আইন রচিত হতে পারে না।[৫০]

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের চারদফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট পালন করে। তাদের দাবি চারটি (১) শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং সমুদয় বেসরকারি স্কুলে একই প্রকার বেতনের হার প্রবর্তন (২) প্রত্যেক বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রবর্তন এবং টাকায় বার পয়সা করে চাঁদা প্রদান (৩) প্রতি এক বৎসর চাকুরির জন্য এক মাসের বেতন গ্রাচুইটি দানের ব্যবস্থা এবং (৪) মাহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করে ১৫ টাকার স্থলে ত্রিশ টাকা করা। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শিক্ষকরা অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করে। ৪ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে কে.এল জুবিলি হাইস্কুল, নবকুমার ইনিস্টিটিউশন, পলাশী গার্লস হাইস্কুল নুতন পল্টন লাইন হাইস্কুল সমূহ শারদীয় ছুটির পর খোলা হয় কিন্তু প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা স্কুলে উপস্থিত হতে বিরত থাকেন। ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল খোলার পর শিক্ষকদের অসম্মতির কারণে আবার ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ৩৩ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবিরাম ধর্মঘট সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের চার দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। ৭ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের এই মিছিল লিয়াকত এভিনিউ, নওয়াবপুর জিন্নাহ এভিনিউ, সেক্রেটারিয়েট রোড হয়ে ডি.পি.আই অফিস এবং গভর্নমেন্ট হাউজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শিক্ষকদের এই সমাবেশে কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আলিম আল রাজি বলেন,'প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুল সমূহের ব্যয়িত সর্বমোট অর্থের শতকরা মাত্র ২২ ভাগ বহন করে সরকার অথচ মাধ্যমিক স্কুলের যাবতীয় কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় নিয়েছেন।' ১৯৬০ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন হতেই সর্বমোট ব্যয়ের শতকরা ৫৪ ভাগ এবং দানশীল ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বাকী ২৪ ভাগ খরচ মেটান হত। তিনি বলেন, যথাযথ পরিমাণ সাহায্য প্রদান না কর সরকার বেসরকারি স্কুলগুলির সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছেন এবং খেয়াল খুশিমত কর্তৃত্ব করছেন। তিনি ধর্মঘট শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আগাম শারদীয় ছুটির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সরকারি হিসেবে র ভিত্তিতে প্রকাশ করেন যে, মাস্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল শিক্ষকগণ একশত পঁচিশ টাকা হতে শুরু করে শেষ জীবনে মাত্র তিনশত টাকা পর্যন্ত বেতন পান। এছাড়াও বি.এ.বি.এড প্রাপ্ত শিক্ষকগণ অনুরূপভাবে একশত হতে একশত পঁচিশ টাকা এবং প্রশিক্ষণবিহীন বি.এ.বি.এসসি অথবা বি.কম পাস শিক্ষকগণ মাত্র ষাট টাকা থেকে একশত ষাট টাকা বেতন পান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য না আছে মাহিনার কোন নিয়মিত স্কেল, না আছে তাদের চাকরী সংক্রান্ত আইন কানুন। ফলে আজীবন শিক্ষকতা করার পর বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। অপরদিকে সরকারের অন্যান্য বিভাগে কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় কেবলমাত্র কাগজে দস্তগত প্রদানকারীদের জন্য। [৫১]

সরকার কর্তৃক ধর্মঘটী শিক্ষকদের শাস্তি প্রদান

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল সমুহের ম্যানেজিং কমিটির সাথে কোন পরামর্শ না করেই ধর্মঘটী শিক্ষকগণকে ব্যাপকহারে বরখাস্ত করতে শুরু করে। এছাড়া ধর্মঘটী শিক্ষকদের অনেকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শাস্তিমূলক ভাবে নোটিশ প্রদান করা হয়। শিক্ষক ধর্মঘটের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে বরিশালের ডেপুটি কমিশনার বরিশাল এ.কে ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার এবং পূর্ব পাকিস্তান শক্ষা সমিতির সভাপতি এম.এ কুদ্দুসকে বরখাস্তের নোটিশ প্রদা করে। ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার সেখানকার নাসিরাবাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক কনফেডারেশনের সভাপতি মুখলেছুর রহমান এবং উক্ত স্কুলের একজন শিক্ষককে বরখাস্তের নোটিশ প্রদান করে। ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার পূর্ব পার্কিস্তান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নবকুমার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নানকে এবং ঢাকার সদর মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক কনফেডারেশনের সেক্রেটারী ও কে. এল. জুবিলী হাইস্কুলের হেডমাস্টার কামরুজ্জামনকে "শিক্ষক ধর্মঘট সংগঠনে আপনি প্রধান পান্ডার ভূমিকা গ্রহণের দায়ে এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের নাশকতামূলক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে উস্কানী দানে নিয়োজিত থাকার দরুন

Dhaka University Institutional Repository

কেন বরখাস্ত করা হবে না তার কৈফিয়ত তলব করা হয়।"[৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি প্রশ্নে প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন প্রেসনোটে, শিক্ষা উজিরের বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা ও সমালোচনার জবাবে বলা হয় যে, বেসরকারি শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সরাসরি পরিচালনাধীন এবং ম্যানেজিং কমিটি তাদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিধানের জন্য দায়ি এ ব্যাপারে সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নাই। অথচ ধর্মঘটী শিক্ষকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসন কর্তৃপক্ষ ম্যানেজিং কমিটির সাথে কোনরূপ পরামর্শ না করেই শিক্ষকদের বরখাস্ত করে।[৫২ক]

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের দাবি

লাহোর দূর্গে আটক ছাত্রনেতা সৈয়দ আলী মোখতারের মুক্তি (২) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন (৩) তিন বৎসরের আইন শিক্ষা কোর্স বাতিল (৪) শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র বেতন হ্রাস, (৫) প্রত্যেক কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ খোলা প্রভৃতি দাবি নিয়ে ২৬ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি দাওয়া পূরণ না হলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ ধর্মঘট শুরু করবে। অন্যদিকে পুর্ব পাকিস্তানের ন্যায় করাচীতেও ছাত্র-শিক্ষকগণ ধর্মঘট পালন করেন। বেসরকারি কলেজের শিক্ষকগণ ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ এবং শহরের ছাত্রগণ ৭ ডিসেম্ব ধর্মঘট শুরু করলে করাচীর আঞ্চলিক শিক্ষক ডিরেকটর করাচীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করে। ছাত্র-শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি ছিলঃ (১) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, (২) তিন বৎসর মেয়াদী আইন কোর্স বাতিল (৩) কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ চালু (৪) করাচীতে একটি মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বেতন হ্রাস (৬) শিক্ষকদের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা। করাচীতে ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর পুলিশ হামলা চালায়। এতে কয়েকজন ছাত্র নিহতোহয়। করাচীতে পুলিশের গুলিবর্ষনে ছাত্র হত্যা এবং খুলনা জেলার বাগেরহাটে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর গুন্ডাবাহিনী (সরকারি পৃষ্ঠপোষক) ও পুলিশের অমানুষিক হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন, সভা অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বের করে এবং ডিসেম্বর ১৪ তারিখে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে। প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আব্দুল মান্নান করাচীর ঘটনা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি ভোক্সওয়াগণ গাড়ীতে করে জগন্নাথ কলেজে উপস্থিত হলে ধর্মঘটী ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং সরকারের পক্ষে ওকালতি না করার অনুরোধ জানান। এই সময় গাড়ীর ভিতরে অবস্থানরত পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও তার সঙ্গীগণ ছাত্রদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। ছাত্রদের প্রতি অশোভন উক্তি ও আক্রোশমূলক মনোভাব প্রদর্শনের ফলে ধর্মঘটী ছাত্রগণ উত্তেজিত হয়ে তাদের আক্রমন করে। পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository
বেগতিক দেখে সঙ্গীগণ পলায়ন করেন এবং পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে অধ্যক্ষের কক্ষে আশ্রয় নেন। ছাত্ররা সেক্রেটারীর গাড়ী উল্টিয়ে অগ্নি সংযোগ করে। [৫৩]

বাংলা কলেজের পরিস্থিতি সম্পর্কে ৭৫ জন শিক্ষাবিদের যুক্ত বিবৃতিঃ আবু আহম্মদ হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ মুর্তজা আলী, কবি সুফিয়া কামাল, জহুর হোসেন চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, আহমদ শরীফ প্রমুখ ৭৫ জন সাহিত্যিক কবি, অধ্যাপক ও সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন- "ঢাকাস্থ বাংলা কলেজের উন্নয়ন কর্মসূচি সরকারের তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৫-৭০) অন্ত র্ভূক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যই হয়ত সরকার কলেজটিকে গুরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ নাকি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। কলেজ স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব অবশ্যই টেক্সটবুক বোর্ডের। বাংলা কলেজের এই উদ্যোগ উক্ত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাঞ্চনীয়। তদপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ন জিজ্ঞাসা এই যে, কলেজ কর্তৃক নিয়োজিত পুস্তক প্রণেতাগণ উপযুক্ত প্রস্তুতি ও দক্ষতার অধিকারী কিনা। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রবর্তন ও প্রচলন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য এবং এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত প্রচলন সম্ভাবনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এ প্রচেষ্টার দায়িত্ব ও অধিকার কেন্দ্রীয় সংস্থা ভিন্ন অপর কাহারো হাতে ন্যস্ত করা উচিত নয়। বস্তুত এই ধরণের দায়িত্বশীল কাজে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস আদৌ সমর্থনীয় নয়। কেননা তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া ও শক্তির অপচয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি শোনা যাচ্ছে যে, বাংলা কলেজ তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে নতুন ধরণের বানান ও রীতির প্রচলন করিতে চাহিতেছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে চালু করার কাজ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড ও টেক্সটবুক বোর্ডের যৌথ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার দিয়েই শুধু সাফল্য মন্ডিত হইতে পারে। প্রসঙ্গত বাংলা কলেজ পরিচালনা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলা একাডেমি যেভাবে অভিজ্ঞ ও দেশবাসীর আস্থাভাজন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত বাংলা কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলে চলিবে না। পরিতাপের বিষয় সেই বিচারে এই কলেজের বর্তমান সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই সন্তোষজনক বলিতে পারি না। সেই সঙ্গে আবার দেখা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহাতে কলেজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ ঘূনিভুত হইবার কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলনে উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, অতিশয় প্রয়োজনীয় এই নিরীক্ষাটির দায়িত্ব যদি বাংলা কলেজ কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার উপর ছাড়িয়া না দিয়া কলেজ স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলা উন্নয়নবোর্ড, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড, টেক্সটবুক বোর্ডের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর অর্পন করা হয় এবং বাংলা

Dhaka University Institutional Repository
কলেজটিকে অবিলম্বে সরকারি কলেজে পরিণত করা হয় তাহা হইলে ইহার সাফল্য নিশ্চিত হইতে পারে। অন্যথায় এই প্রতিষ্ঠান মঙ্গল না আনিয়া বরং শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়া দেখা দিবে। বাংলা কলেজকে সরকারি কলেজে পরিণত করা হইবে তাহারই প্রথম পদক্ষেপ যাহাতে অদুর ভবিষ্যতে সমস্ত সরকারি বেসরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হইতে পারে। এই দিকে আমরা সকল সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"[৫৪] ৭৫জন শিক্ষাবিদের বিবৃতির সমালোচনা করে বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন'৭৫ জন শিক্ষকের বিবৃতি কোটারী সার্থেই ইর্ষাপ্রসূত এবং উক্ত শিক্ষাবিদদের সুপারিশ ডিটেক্টরিয়াল ও আমলাতান্ত্রিক। তিনি বিবৃতি দানকারীদের সমালোচনা করে আরো বলেন, বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ বাংলার উন্নতির ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।'[৫৪ক]

১৫ জুলাই ১৯৬৪ সালে ঢাকার ২২জন নেত্রীস্থানীয় মহিলো। এক বিবৃতিতে সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে অবিলম্বে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করার জোর দাবি জানান। তারা বলেন যে, সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচনীতির ফলে শিক্ষা জীবন ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস শিক্ষদের বেতনের শোচনীয় নিম্নহার, প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন ও পাঠ্যপুস্তকের উচ্চ মূল্যের উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে তারা অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাত্রদের বেতন ও পাঠ্যপুস্তকের মূল্য হ্রাস, শিক্ষকের বেতনের উপযুক্ত হার নির্ধারণ এবং বছর বছর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন না করার দাবি জানান।[৫৫]

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৬) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

প্রকৃতপক্ষে হামুদুর রহমান কমিশনকে শিক্ষা কমিশন বলা যায় না। কারণ এই কমিশনে শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য ছিল না। ছাত্রদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে কিংবা ক্ষতি করে এমন বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা, ছাত্র কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার পদ্ধতি ঠিক করা, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির পথ নির্ণয়, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬৪ সালে তীব্র আকার ধারণ করে। তাই প্রেসিডেন্ট শিক্ষা আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান এবং শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠন করেন। কমিশন প্রশ্নপত্র বিতরন করে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রনয়ন করে। পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই রিপোর্ট প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক. স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নারী শিক্ষা, শিক্ষক প্রসঙ্গ, পরীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository
পদ্ধতি, ভাষা, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে । কিন্তু কমিশন ছাত্রদের ২২ দফা দাবির যুক্তি খন্ডন করে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তাবায়নের পক্ষেই মত প্রকাশ করে। অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার দাবি অস্বীকার করে কমিশন মন্তব্য করে, We appriciate their desire for the attainment of high level of universal education but we regret that we are unable to hold that this demand in their realistic or economically sound. [৫৬]

কমিশন ছাত্র সংগঠনগুলি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পোষণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কেও কমিশনের মন্তব্যে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ছাত্র সংগঠণ সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য ছিল বিভিন্ন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠন ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর অস্বীকৃতি প্রাপ্ত ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণত ছাত্র- বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সময় এগুলির অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে-

1. The Democratic Students Federation বা গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশন (C. &. F)
2. The Inter Collegiate Body বা আন্তঃ কলেজ পরিষদ (ICB).
3. The All Pakistan Students Organization বা নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা (A.P.S.O).
4. The National Students Federation বা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N.S.F).
5. The Karachi Students Federation বা করাচী ছাত্র ফেডারেশন (K.S.F)
6. Islami Jamiat-e-Talaba বা ইসলামি জামায়াতে তালাবা
7. The Girl students Congress
8. The National Students organization (N.S.O) (Opertating only in Lahore and Lyallpur).
10. The West Pakistan Students League

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংগঠন হচ্ছে:

1. East Pakistan Students Union (E.P.S.U)
2. East Pakistan Students League (EPSL)
3. National Students Federation (N.S.F)
4. Students Force (S.F)
5. Islami Chattro Sakti. [৫৭]

কমিশনের বক্তব্য ছিল এই সব অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছাত্র সংগঠন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। তাই এই সব সংগঠন বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে দেশের অবস্থা অস্থিতিশীল করে তুলছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ গঠনের পক্ষে মতামত রেখেও কমিশন এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত রাখা ও

Dhaka University Institutional Repository

এসব ছাত্র সংসদের তৎপরতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে। ১৯৬২ সালে গড়ে উঠা শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপারে কমিশন সরকার ও পুলিশ কর্তৃক অনুসৃত পদক্ষেপকে পরোক্ষভাবে দায়ি করে। এসবের মোকাবেলার জন্য কমিশন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ও তা সম্ভব না হলে নিয়ন্ত্রন করার প্রস্তাব করে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন ছাত্র সংগঠন গুলোকে সরকারি দপ্তরে রেজিষ্ট্রেশন করার বিধান জারি করার জন্য সারকারের কাছে সুপারিশ পেশ করে। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি ধরণের ভূমিকা পালন করবে এই সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেঃ

(i) 'that the law and order agencies should not deal directly with the students over the hands of education authorities so far as their conduct within the precincts of their institutions is concerned' (ii) and 'that the police whilst having all freedom of action in a public place should not enter any educational precincts unless requested to do so in writing by the head of that institution'.[৫৮]

কমিশন ছাত্ররা যাতে আন্দোলন করার মত সত্যিকার কোন ইস্যু না পায় তার ব্যবস্থা করা এবং আন্দোলন করার মত সব কারণ এক সাথে দূর করতে না পারলেও বিক্ষোভের মূল কারণসমূহ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রন করা। হামুদুর রহমান কমিশন ছাত্র অসন্তোষের কারণসমূহ অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত হলেও কমিশন ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য করে। এছাড়াও কমিশন শরীফ কমিশনের (১৯৫৯) রিপোর্টকেই সমর্থন করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সমাজ শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন ও সংগ্রামের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন দেয়। এই নির্বাচনে ভোটাররা ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রের। তাই ভোটারদের ভয়ভীতি, কারচুপি ও টাকার বিনিময়ে আইয়ুব খান জয়লাভ করে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধের পর পূর্ব পকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। ভারত ইচ্ছে করলেই পূর্ব পাকিস্তান অতি সহজেই দখর করে নিতে পারত। ফলে হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্রদের প্রবল অসন্তোষ দেখা দিলে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

আইন পরিষদে ফৌজদারী আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ সালে ছাত্র রাজনীতিতে প্ররোচনা দণ্ডনীয় অপরাধ এই মর্মে ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হয়। বিরোধী দলের তীব্র বিরোধিতার পরও সরকারি দল ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জনবিরোধী ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৪ পাস করা হয়। উল্লেখিত সংশোধনীতে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩৯ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধের জন্য শাস্তি বিধানের উল্লখ করা হয়। পাকিস্তানে দণ্ড বিধির ১৯৩৯ ধারায় ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও ছাত্রদের উস্কানিদান দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষনা করে। বিরোধী দলীয় বক্তারা ১৫৩৯ নং ধারার সংশোধনীতে পুলিশকে বিনা প্ররোচনায় গ্রেফতারের ক্ষমতা দান এবং উক্ত ধারার আনীত অভিযোগকে জামিনের অযোগ্য অপরাধে পরিণত করার তীব্র সমালোচনা করেন। [৫৯]

ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলন

২ আগষ্ট ১৯৬৬ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্রগণ বর্ধিত বেতন হ্রাস, কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রত্যাহার, কলেজ ও ছাত্রাবাসে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে পুনধর্মঘট পালন করে এবং বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ছাত্রগণ 'ছাত্রবেতন হ্রাস কর' অধ্যক্ষের পদত্যাগ চাই' হামুদুর রহমান কমিশনে রিপোর্ট বাতিল কর 'দমননীতি চলবে না' ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কর' প্রভৃতি শ্লোগান সহ বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন করে ডিপি আই অফিসের সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ শোভাযাত্রাটিকে বাধা দেয়। ছাত্রগণ ডিপিআই অফিসের সম্মুখে পুলিশ বেষ্টিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল ডিপিআই এর সাথে সাক্ষাৎ করে বেতন বৃদ্ধি রহিতোএবং ৪ জন ছাত্রের উপর থেকে শোকজ নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। কিন্তু ডিপিআই কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কোন আশ্বাস প্রদান করেননি। উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাশে মানবিক বিভাগে বেতন ৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে ৫ টাকা থেকে ৯ টাকা, বি.এস.সি ক্লাশে বেতন ৫ টাকা হতে ১০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। সরকারি কলেজ সমূহের বেতনবৃদ্ধির প্রভিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহতোরাখে। ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজ এবং সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রীরা বেতন বৃদ্ধি, সীটরেন্ট ও বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা সহকারে ডিপিআই এর সাথে সাক্ষাত করেন। উল্লেখ্য পূর্বে কোন সীট ভাড়া ছিল না। রাজশাহী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট বিক্ষোভ মিছিল ও শোভাযাত্রা করে। ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্ররা বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে কালব্যাজ ধারণ এবং অনির্দিষ্টকালে জন্য কালব্যাজ ধারণ ও ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। [৬০]

Dhaka University Institutional Repository
১৯৬৬ সালের ২০ আগষ্ট জে.এম. সেন হলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রামাস্থ শাখার উদ্যোগে বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন বর্তমানে কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তির সন্তান সন্ততিরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করছে। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কোন সাধারণ রাষ্ট্রে শিক্ষার সুযোগ লাভ একটি জন্মগত অধিকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অর্থাভাবে জনগণ তাদের সন্তান সন্ততিদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে পারছেন না ফলে ছাত্ররা বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশের সকল নাগরিকের জন্য আমরা শিক্ষার অধিকার চাই। আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব। তিনি ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে কর্তৃপক্ষ নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে বলে বক্তারা মনে করেন। চট্টগ্রাম শহর ইউনিয়ন সভাপতি আনোয়ারুল কবীর সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের প্রাক্তন সহ সভাপতি শ্রীপংকজ ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শফিকুল মওলা এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের চৌধুরী। সভা শেষে হাজার হাজার ছাত্র এক শোভাযাত্রা বের করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ এবং হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিলও ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্লোগান দেয়।[৬১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (Amendment) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৬ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যদের বিরোধিতা

১৯৬৬ সালের ৮ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যদের তুমুল বিরোধিতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১ম ও ২য়) সংশোধনী অর্ডিন্যান্স গৃহীত হয়। ১ম সংশোধনী অর্ডিন্যান্স অনুসারে গভর্নরকে চ্যান্সেলর নিয়োগের ও স্বীয় স্থিরীকৃত নিয়ম অনুযায়ী চ্যান্সেলর কর্তৃক কনভেনশন অনুষ্ঠানের (পেশাগত ডিগ্রী, গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী প্রদানের জন্য) ও চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে (পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও অনার্স ডিগ্রীপ্রদানের জন্য) কনভেনশন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা প্রদান এবং সিন্ডিকেট সদস্যদের সংখ্যা ১১ হতে ১৫ জনে বর্ধিত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী অর্ডিন্যান্স ১৯৬৬-এর তীব্র সমালোচনা করেন স্বতন্ত্র দলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আহমেদুল কবীর, বিরোধী দলীয় সদস্য ডাঃ আজহারউদ্দিন আহমদ, শামসুর রহমান, আজিজার রহমান সরকার, নূরুল হক, বজলুল গনি প্রমুখ। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে সংশোধনী অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁরা বলেন যে, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত আলোচ্য অর্ডিন্যান্সটির কার্যকরীকরণ বন্ধ রাখা হোক। গভর্ণর কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের বিধানের অবসান দাবি করে আহমেদুল কবির বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা রচিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের একটি প্যানেল হতে ভাইসচ্যান্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। স্বতন্ত্র দলের নেতা আসাদুজ্জামান খান বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত চ্যান্সেলরের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকবে ততদিন গভর্নরের মত রাজনৈতিক ব্যক্তিকে চ্যান্সেলর নিয়োগ করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বলবৎ রয়েছে ততদিন সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষদের দ্বারা ডিগ্রী বিতরনের ব্যবস্থা করা হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী অর্ডিন্যান্সকে কালাকানুন আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে, আলোচ্য অর্ডিন্যান্সটি গৃহীত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সামান্যতম স্বাধীন পরিবেশ টিকে আছে তা বিলুপ্ত হবে। যে কোন মুহূর্তে আপনি-আপনার ডিগ্রী হারাতে পারেন এই স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতার তীব্র নিন্দা করেন। সিন্ডিকেটের যে কোন সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার যে কোন ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডিগ্রী কেড়ে নিতে পারবেন। অর্ডিন্যান্সের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক হচ্ছে যে, ডিগ্রী কেড়ে নেওয়ার অনুরূপ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরনাপন্ন হওয়া যাবে না। তাঁরা এই আইনের প্রতিবাদ করে বলেন, এই ধরণের বল্‌গাহীন ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। ইহা ছাত্র শিক্ষক প্রয়োজন বোধে পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য এমনকি মন্ত্রী ও সিন্ডিকেটের কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ও ব্যবহৃত হতে পারে। সংশোধনী অর্ডিন্যান্সের তীব্র সমালোচনা করে আহমেদুল কবীর বলেন যে, এক ব্যক্তির শাসনামলে এক ব্যক্তির চিন্তা সকল মস্তিস্কে প্রবিষ্ট করার দুঃসাহসী মতলবেই অর্ডিন্যান্সটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্সটির প্রণেতাগণ চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলরের মর্জি মাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছে অর্ডিন্যান্সগুলির ব্যর্থতার সবচাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার পরিবেশ ও মানউন্নয়নে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপকে নানা ভাবে সংকুচিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। তিনি বলেন যে, সরকার ও কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অবদান রয়েছে। বিদেশিশাসনামলেও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও মর্যাদা ছিল, চ্যান্সেলর ছিলেন নাম মাত্র। ১৯৬১ সাল থেকে সরকার একটি পর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ কুলুষিত করেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই যে কোন ব্যক্তি চ্যান্সেলর হতে পারেন। অথচ শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠে শাসন পরিচালনার ব্যাপারে এহেন পদাধিকারী ব্যক্তিকেই সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাই পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই অর্ডিন্যান্সটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। মিঃ নূরুল হক বলেন সেকশন ৬-এ ভাইস চ্যান্সেলরের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার ফলে ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে, কমিটি আছে সেই কমিটির সদস্য প্রফেসরগণ ভাইস চ্যান্সেলরের ভয়ে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে ভয় পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিবেশে একজন সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদের জন্ম হয় সেই পরিবেশ নষ্ট হবে। যে কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীমত সিন্ডিকেট গঠন করা যাবে অর্থাৎ এই আইনের ফলে সিন্ডিকেটের ক্ষমতা হরন করা হয়েছে।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী অর্ডিন্যান্স ১৯৬৬ (The Rajshahi University (Amendment) Ordinance 1966, East Pakistan Ordinance No. 11 of 1966)

১৯৬৬ সালের ৯ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ৬২-২৫ ভোটে গৃহীত হয়। সংশোধনী ধারায় উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারবে না। অর্ডিন্যান্সটির তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনা করেন বিরোধী দলীয় সদস্য মোসলেম উদ্দিন খান, মোল্লা আবুল কালাম আজাদ, আজিজার রহমান সরকার, ড. আজহার উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আশরাফ হোসেন, আহমেদুল কবীর, শামসুর রহমান, মোঃ সিরাজুদ্দিন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সৈয়দ আশরাফ হোসেন বলেন যে, ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতি করবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের বাগে আনা ও ছাত্রদের রাজনীতি হতে দূরে রাখার মতলবেই ক্ষমাতসীন সরকার অর্ডিন্যান্সটি প্রনয়ন করেছে। তিনি বলেন, ছাত্ররা পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। দুনিয়ার সমস্ত দেশে জাতীয় আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছাত্ররা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্ররা ভিয়েতনামের মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে অথচ পাকিস্তানে ভিয়েতনাম ইস্যুতে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠি পেটা করে। তিনি বলেন, ছাত্ররা দলীয় রাজনীতি করে না, ক্ষমতাসীন রাজনীতি করে না। তারা জাতীয় রাজনীতি হতে দূরে থাকতে পারে না।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব

খাদ্যদ্রব্য জনজীবনে বিভিন্ন সমস্যা, নিজেদের শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। তিনি মনে করেন সরকারি নীতি, কার্যকলাপ, অর্ডিন্যান্সের দৌরাত্মে গোলযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গায়ে জুতা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইহা সকলের কাছেই অনভিপ্রেত। কিন্তু এগুলি বন্ধ করতে হলে ছাত্রদের প্রতি সরকারের অনুসৃত নির্যাতনমূলক নীতি পরিহার করতে হবে। কর্তৃপক্ষের হটকারী কার্যক্রমের ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করা হয়। ১২ শত ছাত্রকে হলো থেকে বহিস্কার করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে এবং কথায় কথায় শিক্ষকদের উপর " শোকজ" নোটিশ জারি করা হয়। বিগত কয়েকবছরে ৫ বার সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ছাত্রদের নির্মমভাবে প্রহার করেছে এবং বহু ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়। মোল্লা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, চ্যান্সেলরের পক্ষে কনভোকেশনে ভাষণ প্রদানের ও ডিগ্রী বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে সরকার আলোচ্য সংশোধনী অর্ডিন্যান্স পরিষদে পেশ করে। কিন্তু সংশোধনী অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য কোনদিন চরিতার্থ হবে না। কারণ যে কারণে চ্যান্সেলর কনভোকেশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি সেই একই কারণে ভাইস চ্যান্সেলর ও তা করতে পারবেন না। তিনি হাই কোর্টের বিচারপতিকে কনভোকেশন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার ক্ষমতা প্রদানের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, অর্ডিন্যান্স প্রিয় সরকার একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করছেন কিন্তু অর্ডিন্যান্সগুলির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ও চিন্তার স্বাধীনতা নস্যাৎ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository
তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি দূর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ আনেন। দূর্নীতির প্রমানস্বরূপ তিনি পরিষদে চিঠি প্রদর্শন করেন। স্বতন্ত্র দলীয় সদস্য মোসলেম উদ্দিন খান বলেন, অর্ডিন্যান্স সমূহ জারির পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশ অধিকতর উন্নত ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অশিক্ষা, অসত্য, গুন্ডামি, ষড়যন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারের পাদপীঠে পরিনত হয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য আইন ও অর্ডিন্যান্সের মত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ব্যক্তি বিশেষের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানষে রচিত হয়েছে।৮ তিনি ভাইসচ্যান্সেলরকে প্রদত্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় তীব্র সমালোচনা করেন। কারণ অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, ভাইস চ্যান্সেলরই শুধু সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, সিলেকশন বোর্ড ও উচ্চতর শিক্ষা পরিকল্পনা উন্নয়ন ও অন্যান্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি আরও বলেন যে, মনোনীত সিন্ডিকেট বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভর্নরকে ছাত্রদের ডিগ্রী কেড়ে নেওয়ার, যে কোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও অধ্যাপকদের চাকুরি হতে বরখাস্ত করার যে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনিশ্চিয়তার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। অর্ডিন্যান্স জারি করে ছাত্রদের সৎ, রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। মোঃ সিরাজুদ্দিন বলেন যে, অর্ডিন্যান্স মারফত সরকার ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করার এবং জাতীয় আন্দালন হতে তাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। জনগনের মৌলিক অধিকার ও ভোটাধিকার কায়েমের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালনে ছাত্রদেরকে কোন অর্ডিন্যান্স দ্বারাই নিবৃত্ত করা যাবে না। পরিষদ সদস্য আজিজার রহমান গভর্নর কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের বিরোধিতা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও উহার আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষদের ভোটে নির্বাচিত একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠন ও উক্ত নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক ভাইসচ্যান্সেলর নির্বাচিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হোক। সদস্য শামসুর রহমান বলেন যে ১৯৫৮ সালের পর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাচার্যের নিযুক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত। এন.এস.এফ নামে ছাত্র সংগঠনটি সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। ড. আজাহারউদ্দিন বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত গভর্ণর ছিলেন অরাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তাঁরা চ্যান্সেলর হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাযোগ দেখা যেত না। কিন্তু বর্তমান গভর্নর রাজনৈতিক ব্যক্তি ও অর্ডিন্যান্স বলে সকল ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ লেগেই আছে। তিনি ব্যক্তি বিশেষকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদানের বিরোধিতা করেন। শামসুর রহমান আরো বলেন যে, কথায় বলে কোন জাতিকে যদি ধ্বংশ করতে চাও তো সে দেশের বই-পুস্তক আগে ধ্বংস করো। সেই রকম যদি কোন জাতিকে পঙ্গু করতে হয় বা তাকে অন্য সাঁচে ঢালতে হয় তাহলে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কে নিয়ন্ত্রণ কর। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, Provided further that the university shall have power to frame

Dhaka University Institutional Repository

statutes for constituting one Governing Body for both the Degree and Intermediate section of college which have not been bifurcated. [৬৩]

বিশ্ববিদ্যলয় শিক্ষক সমিতির প্রতিক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চার জন প্রবীন শিক্ষকের উপর কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। এই ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদের উপর কতিপয় ছাত্রের হামলায় প্রতিবাদে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করায় তাদের উপর এই আদেশ জারি করা হয়ে। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বলেন যে, দেশের নাগরিক ও সমাজের কৃতবিদ্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনা করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আছে। অপর এক প্রস্তাবে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই ব্যবস্থার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির অন্তর্নিহিতোবিপদ উপলব্ধি করে এ ব্যপারে আর ব্যবস্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবেন। কারণ আবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় প্রদেশের উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক জীবন দূষিত এবং উচ্চ শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন শিক্ষক আব্দুল রাজ্জাকের উপর নোটিশ প্রদানে বিস্ময় প্রকাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েলর শিক্ষকগণ বলেন যে, অধ্যাপক রাজ্জাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ বৎসর ধরে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করছেন, তার বিরুদ্ধে নোটিশ প্রদানে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই তাঁরা মনে করেন আব্দুর রাজ্জাকের ন্যায় অতি সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে সামান্য অভিযোগে অপসারনের প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রতি প্রচন্ড হুমকি স্বরূপ । [৬৪]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬৬ (The Chittagong University Ordinance, 1966, East Pakistan Ordinance No ix of 1966) এর বিরুদ্ধে পরিষদে বিতর্ক ঃ

ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই রকম অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভাইস চ্যান্সেলরকে বেশি অধীন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলরকে বহাল বা পদচ্যূত করার অধিকার চ্যান্সেলরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। স্বতন্ত্রদলের নেতা আসাদুজ্জামান খান বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নাই। সিন্ডিকেটের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যগণ হয় ভাইস চ্যান্সেলর ও চ্যান্সেলরের অধীন ব্যক্তি, না হয় সরকারের মনোনীত ব্যক্তি । বিরোধী দলের সদস্য সিরাজুদ্দিন অর্ডিন্যান্সের উপর আনীত অনুমোদন প্রস্তাব উপস্থাপনকালে অভিযোগ করেন যে, সরকারের ভুলনীতির ফলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অর্ডিন্যান্সের দ্বারা চ্যান্সেলরকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহতোহচ্ছে। পূর্বে গভর্নরের সাথে রাজনীতির সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে গভর্নর রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ভাইস চ্যান্সেলরকে সম্পূর্ন চ্যান্সেলরের অনুগত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী চ্যান্সেলরের খেয়ালখুশির উপরই ভাইস চ্যান্সেলরের চাকুরি নির্ভরশীল যা Clause 10 sub-clause (4) এ বলা হয়েছে। "The chancellor may, if he is satisfied that exceptional circumstances seriously interfering with the normal activities of the university exist pass such order as the considers necessary in the interest of the University any such order passed by the chancellor shall be binding on the authorities, officers and teachers of the University and such order shall not be called in question in any of law'.[৬৮] পূর্ব বাংলার প্রদেশিক পরিষদে বিরোধীদলের সদস্য নূরুল ইসলাম খান বলেন যে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রন করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শান্তি ব্যহতোহতে বাধ্য। এই ব্যবস্থা দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর বিরোধী দলের সদস্য মোসলেম উদ্দিন খান অভিযোগ করেন যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিপীড়নের স্থানে পরিণত করা হয়েছে। তিনি বলেন যারা সরকারের নীতিতে বিশ্বাস করেন না তাদের নিপীড়ন ও নাস্তানাবুদ করা হয়। তিনি আরও বলেন, অর্ডিন্যান্স দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলকে ক্ষমতাহীন করে চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে সকল ন্যস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ নং ধারার বিরুদ্ধে ও তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ধারাটিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিতোসংশ্রব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অবাঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করা হয়েছে। ধারা মোতাবেক এই বিধান অমান্য করলে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিষদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান অভিযোগ করে বলেন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ৬ নং ধারায় শাসনতন্ত্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লজ্ঘন করা হয়েছে এবং বিশ্বের অন্য কোন দেশে এই ধরনের বিধান নাই বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের বয়স ২১ বৎসরের উর্দ্ধে এবং তাহাদের ভোটাধিকার ক্ষমতাও রয়েছে। অনেকে বিরোধীদলের হয়ে বিগত নির্বাচক মন্ডলী নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ইহারা শুধু ছাত্র নয়, নাগরিকও। কাজেই মেলামেশার সুযোগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে শাসনতন্ত্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তবে উল্লেখযোগ্য যে কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।[৬৮ক]

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University (Amendment) Ordinance 1967-(This ordinance Promulgated on 2nd September 1967) এর বিরুদ্ধে পরিষদে বিতর্ক

এই অর্ডিন্যান্সের বিরোধীতা করেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মিঃ মোসলেম উদ্দিন খান। তিনি অর্ডিন্যান্সের Clause 4. New Sectionb 56 (1) line 8, যাতে বলা হয়েছে by any outhority or officer of the University কে বিশেষ ক্ষমতা (extraordinary power) প্রদান করা হয়েছে, যে ক্ষমতা বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেতনভুক্ত কর্মচারী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আবার সেকশন 24(1) এ An employee of the University shall be bound by the following conditions of service namaly:

(a) He shall not take part in or subscribe in aid of or assist in anyway any political movement or any activities tending directly or indirectly to exit disaffection against the government as by law established or to promote feeling or hatred or enmity between different classes of Pakistani citizens, or to disturb the public peace.

(b) He shall not canvass or interfere or use his influence or stand as a candidable in any election to a Legislative Body in Pakistan. [৬৬]

এই আইন বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আইন উল্লেখ করা হয় এবং কোন শিক্ষকের বা বেতনভুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই ধরণের আচরনের প্রমান পাওয়া গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা (by any authority or officera of the University) তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থাৎ তাদের বরখাস্ত করতে পারবে। ১৯৬১ সালের আইনের ৯ নং ধারায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা (officers of the University) বলতে বোঝান হয়েছে- চ্যান্সেলর ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিষ্ট্রার, ডীন, প্রভোষ্ট, ইন্সপেক্টর অব কলেজ, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং অন্যানা্য অফিসার যা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এর আওতায় পড়ে। অন্যদিকে অধ্যাপক রীডার এবং লেকচারার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত। এই আইনের মাধ্যমে একজন ডেপুটি রেজিষ্ট্রার একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যে কোন অজুহাতে শাস্তি দিতে পারবেন এমনকি এই আইনে একজন হেড ক্লার্ক ও অফিসারের মর্যাদা পায় এবং তার ও স্বাধীনতা ছিল যে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, রীডার বা লেকচারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হলে তা একাডেমিক কাউন্সিলে মাধ্যমে হওয়া উচিত। কারন আইনের সেকশন ২৩ নং বলা রয়েছে- The academic council shall be the academic body of the University and shall be responsible for the maintenance of standerd of instruction, educations and examinations within the University. [৬৬ক]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে পরিষদ সদস্য আজিজার রহমান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের বিরোধীতা করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ত অফিসিয়ালদের জন্য সরকারের সন্দেহ কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেশের মেধাবী স্কলার তৈরী হচ্ছে এবং ড. হুদার মত লোকদের যারা তৈরি করেছে তিনি ও আজ তার শিক্ষকদেরকে সন্দেহের চোখে দেখছেন বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন বর্তমান চ্যান্সেলর তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেছেন একথা তিনি নিজেই বলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি আরও বলেন যে, একজন অর্থনীতিবিদকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন? তিনি যদি উত্তরে বলেন সুবিধাজনক নয় তার মানে হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোপক্ষভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এই অপরাধে চ্যান্সেলর তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন। হাইকোর্ট হচ্ছে Source of Lative source of Law অথচ সেই হাই কোর্টের ক্ষমতা নষ্ট করা হয়েছে এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে Anit Government অর্থ Anti state নয়। তিনি আইনটির বিরোধিতা করে আরও বলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রন করার জন্য শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ এমনকি জুনিয়র হাইস্কুলকে পর্যন্ত সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে। জুনিয়র হাইস্কুল খোলার জন্য (open) অনুমতি নিতে হয় DPI এর কাছ থেকে, ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য আসতে হয় গভর্ণরের কাছে যে অনুমতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এছাড়াও আইন করা হয়েছে তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। সৈয়দ আশরাফ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অর্থ তৈরীর ফ্যাক্টরী হিসেবে মনে করলে ভুল হবে। কলকতা বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল তথাকথিত শিক্ষিত লোক তৈরী করা যা তাদের প্রশাসনের সাহায্য করবে। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় যুগ পর এমন একটা আইন তৈরী করতে যাচ্ছে যেখানে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার ওয়াবদার সাথে তুলনা করছে। ১৯৫২ সালে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর সামনের কাতারে ছিলেন এবং শিক্ষকরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৮ জন অধ্যাপক এক যোগে চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার নোটিশ দিয়েছিলেন তাদের ইস্তফা দেওয়ার কারণ ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পুলিশ ঢুকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে, ছাত্রদের মারধর করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি চালানো হয়েছে, ছেলেদের বুকে গুলি চালানো হয়েছে। এ.কে ফজলুল হক ১৯৫৫ সালে এই Statute তুলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন। An employee of the university shall be bound by the following conditions of the service namely' তিনি বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের কোন বিধি থাকতে পারে না। এটিকে বাতিল করা হয়। তাই সৈয়দ আশরাফ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্ডিন্যান্স জারির সমালোচনা করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মতের

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-শিক্ষকের সমাবেশ। যে কোন ব্যক্তি তিনি সরকারি কর্মচারী হোন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোন কারখানার কর্মচারী হোন, ছাত্রী হোন, কৃষক হোন তার একটি রাজনৈতিক মতবাদ আছে। শিক্ষকদের উপর এই আইন চাপানোর অর্থ হচ্ছে তাদের মাথার উপর তরবারী ঝুলিয়ে রাখা।[৬৭] পরিষদ সদস্য মিঃ এ. এস. ওয়াহিদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এই আইনের দ্বারা শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার হরন করা হয়েছে। ৩ ও ৪ নং ধারা অনুযায়ী কোন কোর্টের ডিগ্রী বা রায় যদি কোন শিক্ষকের পক্ষে বা কর্মচারীর অনুকুলে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আদালত প্রদত্ত উক্ত রায় বানচাল করতে চান তাহলে এই অর্ডিন্যান্স বলে উক্ত কোর্টের রায় অগ্রাহ্য ও অকর্মন্য হবে। তিনি এই আইনকে দমনমূলন, স্বৈরাচারী, একনায়কত্ব শাসনের নির্দশন বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন প্রাক-স্বাধীনতার যুগেও বিশ্ববিদ্যালয় কেন যে কোন সরকারি বেসরকারি বিভাগের কর্মচারীর পক্ষে তার কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত স্থান ছিল আদালত। সরকারের ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি কোন অপকর্ম করা হয়, কারও উপর অবিচার করা হয় সেটাকে শুদ্ধ করার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগসাজসে পরিষদে যে অর্ডিন্যান্স পেশ করা হয়েছে তা বাস্তবিক ন্যায়নীতি ও স্বাভাবিক বিচার পদ্ধতির বরখেলাপ। এই দমনমূলক আইন প্রনয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা, আদালতের পবিত্রতা এবং আইনের পবিত্রতা কলুষিত করা হয়েছে। কবি ইকবালের ভাষায়ঃ ইস্তেহাতে কৌমেরা তাহযীবে গুফত অথ্যাৎ জাতির অধপতনকে এরা সভ্যতা বলে দাবি করে।[৬৭ক]

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে ক্লাস থেকে বের হয়ে আসে। সামরিক শাসন লঙ্ঘন করার অপরাধে সামরিক কর্তৃপক্ষ চারটি ছাত্র সংগঠনের ছয়জন ছাত্র নেতাকে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় ঢাকার সামরিক কর্মকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। যাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ তোফায়েল আহমদ এ.এস.এম আব্দুর রব (ছাত্রলীগ), মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা (ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ) মোস্তফা কামাল (ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ) মাহবুবুল্লাহ (ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ) ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এল,এম.এফ। তবে ছাত্রদের গ্রেফতার করা হলেও জনসাধারণ ও শ্রমিকরা ছাত্রদের পক্ষ নেবে এই আশংকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সামরিক শাসন লংঘন কারীদের মার্জনার কথা বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করে।[৬৮]

নূর খান কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ইয়াহিয়া খানের (২৫ মার্চ ১৯৬৯) ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বেশ তৎপরতা দেখা যায়। প্রথম থেকেই সরকার ছাত্র শিক্ষকদের খুশী করার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২৮ এপ্রিল ১৯৬৯ সালে সামরিক সরকার নতুন একটি শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রকাশ করেন। এতে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় ছাত্ররা শুধু পরিচালিত হবে না, পরিচালনায় অংশ নেবে। ছাত্রদের ইউনিয়ন ও সংগঠন করার অধিকার থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রন হ্রাস করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি মঞ্জুরিকমিশন গঠন করা হবে। সকলের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হবে।[৬৯] এই রূপরেখার আলোকে প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য ও সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার মার্শাল নূর খান একটি নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

নয়া শিক্ষানীতি পক্ষে বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এবং মাদ্রাসা সমূহের সংগঠন এই কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ ছাড়া অধিকাংশ সমর্থন করে। পুর্ব পাকিস্তানে ইসলামি সংগঠনগুলি এই কমিশনের প্রতি বেশি সমর্থন জানায়। কমিশনের যে সুপারিশ এর প্রতি উভয় পাকিস্তানে সমর্থন জানান হয়নি তাহলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতির প্রস্তাব। নূর খান কমিশনের সুপারিশের প্রথম দিকে ছাত্রদের তুলনায় অন্যান্য পেশাজীবী বিশেষ করে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে একসভার আয়োজন করে। সভায় কমিশনের প্রস্তাবসমূহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়। সমিতির সদস্যরা বলেন শিক্ষানীতি প্রণয়নের পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে সব সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই গ্রহণ করায় তারা সন্তুষ্ট । তবে শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত শিক্ষকনীতিতে ২১ দফা সংশোধনী আনে। এতে ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক করার প্রস্তাব করা হয়। তবে শিক্ষক সমিতির ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবির প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বিবৃতি প্রদান করে ঢাকা শহর ইসলামি ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দ। ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নূরুল ইসলাম এ সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির ও ওকালতিকারকদের কখনো বরদাস্ত করা হবে না বলে বক্তব্য দেন।[৭০]

পাকিস্তান লেখক সংঘ মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় পাকিস্তান সরকারের খসড়া শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা প্রচলনের উদ্যোগকে সমর্থন জানালেও মুনীর চৌধুরী বলেন, সরকারি আমলাদের চিন্তা নায়ক বা পন্ডিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু সৎচরিত্র হয়ে কাজ করে যাওয়া। মাতৃভাষা চালুর প্রশ্নে কোন সংঘর্ষ দেখা দিলে তা পন্ডিতরাই সমাধান করবেন। ইংরেজি বাতিল হলে দেশ বিচ্ছিন্ন হবে এসব প্ররোচনা হাস্যকর বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৭১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়ে কতিপয় সংশোধনী দাবি করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন দাবি করেন কিন্তু পাঠ্য

Dhaka University Institutional Repository
তালিকা নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনায় ছাত্র প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সমীচীন হবে না বলে মন্তব্য করেন। কারণ তারা মনে করেন ছাত্ররা কী পড়বে তা তারা ঠিক করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতিও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি রাখার বিরোধিতা করে, তবে সমিতি শিক্ষার সর্বস্তরে বেশভূষা ও চালচলনে ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করার আহ্বান জানায়। [৭২]

পাকিস্তান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির ঢাকা শাখা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে সাধারণ শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার স্থান উল্লিখিত না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগের পর ছাত্রদের অন্তত শতকরা ৭০ জনকে পেশাগত কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত। সমিতি শিক্ষক সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে স্কুল পর্যায়ে ১ঃ২৫ কলেজ ১ঃ ১৫ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ঃ১২ করা প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। [৭৩]

জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (বি.এন.আর) নিপাভবনে নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই সভায় ব্যুরোর পরিচালক ড. হাসান জামান ইসলামিয়াত শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামিক আদর্শ প্রবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। তিনি সকল অনার্স ও এম. এ শ্রেণীতে ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকতত্ত্ব বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং এম.এ শ্রেণীতে পাকিস্তানের ইতিহাস ও আদর্শ এবং নামাজের সময়কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করার সুপারিশ করেন। আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন। তিনি উল্লেখ করেন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিটি স্কুলে আনুপাতিক হারে বিজ্ঞান শিক্ষকের হার হচ্ছে ০.৭ ভাগ। সে তুলনায় প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। ড. কাজী মোতাহার হোসেন বলেন পূর্বের শিক্ষানীতির তুলনায় নতুন শিক্ষানীতিটি আরও ভাল। কারন এতে বড় বড় প্রতিশ্রুতি আছে, এগুলির বাস্তবায়ন আসল কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদে ছাত্র-প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, এতে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হতে পারে। তবে তিনি একথাও বলেন যেহেতু এটি একটি নতুন ধারণা তাই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা যেতে পারে। [৭৪]

ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দীন বলেন, মুসলমানদের অবনতির কারণ হচ্ছে ইসলাম প্রচারের সময় আমরা যে কথা বলি তা আমল করিনা। এভাবে আমরা শুধু নিজেরাই নিজেদের ধোকা দিচ্ছি না আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করছি। তিনি আরও বলেন ইসলাম সত্যের ধর্ম কিন্তু এ সত্যের ধর্ম এখন কোথায়? ইসলাম পন্থীদের কথায় ও কাজে মিল না থাকার জন্য নতুন প্রজন্ম শুধু লক্ষ্যহীনই নয় তারা নাস্তিকতার দিকেও ঝুঁকে পড়ছে। আমরা কোরআন পাঠ করলেও তার অর্থ বেঝার চেষ্টা করি না। প্রতি ঘরে ঘরে কোরআন শরীফ আছে এটিই বড় কথা নয়। সভাপতির

Dhaka University Institutional Repository
ভাষণে পীর মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থিব প্রয়োজনের শিক্ষার কিছু অভাব রয়েছে তাই কর্মক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পঙ্গু হয়ে আছি। তিনি বাংলায় বক্তৃতা করেন। [৭৫]

ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ) দুলন সমর্থিত অংশ নূর খান প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষা নীতি নিয়ে র্সপ্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এন.এস.এফ এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক দুলন ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে কিছুটা সংশোধনের দাবি করেন। তারা বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি অধ্যয়ন সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণ করার নীতি বাদ দিতে হবে। তবে এই শিক্ষানীতি নিয়ে বিভিন্ন মসজিদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা এই শিক্ষা প্রস্তাবনার মোবারকবাদ জানায়। [৭৬]

পূর্ব পাকিস্তানের ৩১ জন ছাত্রনেতা ১৩ আগষ্ট ১৯৬৯ সালে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, নূর খান প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে তাদের কোন সমর্থন নেই কারণ ইহা ছাত্রদের ১১ দফার পরিপন্থী। তাঁরা দাবি করেন শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে এবং আদর্শ রক্ষার নামে স্কুলসমূহে ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা চলবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে নেতারা বলেন, অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ভাষার বোঝা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ, ছাত্রলীগ (তোফায়েল), রোকেয়া হলো ছাত্র সংসদ ইউকসু, রাকসু, ডাকসু, বাকসু, জগন্নাথ হলো , ফজলুল হক হলো , সলিমুল্লাহ হলো , ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর করেন। এ দিন ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও এক বিবৃতিতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির পাঁচটি মুল নীতির সাথে একমত হয় বলে জানান। তাঁরা বলেন, ইসলামি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা হোক। ভাষার বোঝা কমানোর দাবি করে বিবৃতিদাতারা বলেন, তানা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের ৪টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের ৫টি ভাষা শিখতে হবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন কবি জসিমউদ্দীন, বদরুদ্দীন উমর, শহীদুল্লাহ কায়সার, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান আতাউস সামাদ প্রমুখ। [৭৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন ডাকসু সভাপতি তোফায়েল আহমদ। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সভাপতি শামসুদ্দোহা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর বক্তব্য রাখার সময় পাকিস্তান ইসলামি ছাত্রসংঘের একদল কর্মী সভা কক্ষে প্রবেশ করে 'ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম কর','ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চাইনা', প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকে ও চেয়ার ছুড়তে থাকে। ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমদ মাইকে দাড়িয়ে বারবার বিক্ষোভ কারীদের শান্ত হওয়ার আবেদন জানান কিন্তু একদল ছাত্রসংঘকর্মী লাঠি নিয়ে

সভাকক্ষে প্রবেশ করে এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। Dhaka University Institutional Repository সংঘর্ষে ঢাকা শহর ইসলামি ছাত্র সংঘের সভাপতি আবদুল মালেক আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ইদরিস আলী, ছাত্রলীগ নেতা নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু প্রমুখ গুরুতর আহতোহন। কলাভবনের ডীনের নেতৃত্বে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং পুনরায় আলোচনা সভা শুরু হয়। ছাত্রনেতারা এই আক্রমনের নিন্দা করে গণতন্ত্রের দুশমন এসব ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র আসন থেকে উচ্ছেদ করার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান। সভায় অন্য এক প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের সমবায়ে নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠন এবং শিক্ষা যেহেতু একটি প্রাদেশিক বিষয় সেহেতু এসব কমিশন হবে প্রদেশভিত্তিক। উল্লেখ্য যে, আহতোইসলামি ছাত্র সংঘের নেতা আব্দুল মালেক মারা যায়। [৭৮]

পাকিস্তান শাসনামলে গঠিত প্রতিটি শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নূর খান প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনে শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক গ্রহণযোগ্য বিষয় থাকলেও ঐসময় পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, ফলে এই শিক্ষা কমিশনের উদ্যোগও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র:

১. *Morning News*, December-7, 1947 উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খন্ড, ঢাকা: সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ পৃ. ৪৩১

২. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাসন, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৬-৪৫০

৩. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২৬ মার্চ ১৯৮১, পৃ.১০৫-১০৬

৪. বাংলাদেশের ইতিহাস পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯

৫. *নওবেলাল* (সিলেট) ৫ অক্টোবর ১৯৫০ উদ্ধৃতঃ ড. নিতাই দাস, *বাংলাদেশ সমাজ রাজনীতি ও শিক্ষা*, ঢাকা: মীরা প্রকাশন, ২০০০ পৃ.৯৩-৯৬

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পৃ.২৫৬, ৩৪২-৩৪৩

৭. *Report of the Educational Refoms Commission of East Pakistan* 1957 Government of East Pakistan Part-1, p.3.

৮. Ibid. p.9

৯. দৈনিক আজাদ-৪ জানুয়ারি ১৯৫৮

১০. ঐ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

১১. ঐ, ১/১০/১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১২. ঐ, ১৫/১০/১৯৫৭

১৩. ঐ, ১৫/১০/১৯৫৭

১৪. ঐ, ১৫/১০/১৯৫৭

১৫. ঐ, ১২/১১/১৯৫৭

১৬. ঐ, ০২/০৯/১৯৫৮

১৭. ঐ, ১৯/০১/১৯৫৮

১৮. ঐ, ০৫/১০/১৯৫৮ ও ১৭/১২/১৯৫৮

১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক* ৯ জানুয়ারি ১৯৬০

২০. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা*, ঢাকা:তিষা বুকস ট্রেড, ২০০৩ পৃ.১৩০

২১. জিল্লুর রহমান সিদ্দীকি, *বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঃ সংকট ও সম্ভবনা*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ৬০-৬৪

২২. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬০

২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬০

২৪. ঐ, ১ জুন ১৯৬০

২৫. *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ.৩৪৯

২৬. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৩৭০

২৭. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৩৭৩

২৮. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৩৯৫-৩৯৬

২৯. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.৩৯৮

৩০. ঐ, ১৯৫৯, পৃ.২৪

৩১. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২৫০

৩২. ঐ, পৃ. ২৫০-২৫৯

৩৩. ঐ, পৃ. ২৫১-২৫৩

৩৪. ৩৪ ঐ, পৃ. ২৫৫

৩৫. ড. সৈয়দ সফিউল্লাহ, *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গ*, বালাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনে ২৫,২৬,২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও পরিসংখ্যান সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ মালা সংকলন পৃ. ৭৭

৩৬. Hundred years of the University of Calcutta 1857-1957. P-200. উদ্ধৃতঃ শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জানুয়ারি- ২০০১, পৃ,১১০

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. *Dhaka Gazette, The Dacca University Ordinance* 1961. Governmemcnt of East Pakistan. June 29. 1961 P.1140.

৩৮. Ibid

৩৯. IBid

৪০. Ibid p.1141

৪১. Ibid p. 1182

৪২. ড. অজয় রায়, শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জানুয়ারি ২০০১. পৃ. ১১৭

৪৩. Speech by Mr. Abdul Alim and Mollah Abul Kalam Azad Assembly Proceedings official Report, East Bengal Legislative assembly, 25th June 1962.

৪৪. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী, প্রাদেশিক সম্মেলন ১৯৬৫, পৃ. ১১-২৮

৪৫. *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৬৩

৪৬. ঐ, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৩

৪৭. ঐ, ১৬ এপ্রিল ১৯৬৩

৪৮. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৪৯. ঐ, পৃ. ৬৯-৭০

৫০. *দৈনিক আজাদ*, ১২ অক্টোবর, ৮ ও ২৪ নভেম্বর ১৯৬৪

৫১. ঐ, ৫ অক্টোবর, ১৯৬৪

৫২. ঐ, ৯ অক্টোবর ১৯৬৪

৫২. ক. ঐ

৫৩. ঐ,১, ৮ ও ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৪

৫৪. ঐ, ১৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৪

৫৪. ক. ঐ

৫৫. ঐ, ১৬ জুলাই ১৯৬৪

৫৬. *Report of the Commission on student problem and welfare*, Karachi 1966. p.33.

৫৭. Ibid p.8

৫৮. Ibid pp.177-191.

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

৬০. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ আগষ্ট ১৯৬৬

৬১. ঐ, ২২ আগষ্ট ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬২. Speech by Mr. Asaduzzaman Khan. Mr. Ahmadul Kabir. Mr Shamsur Rahman. Mr. Azizur Rahman Sarker others. East Pakistan Provincial Assembly Proceedings. Budget Session 1966-67. Vol-30 8th July 1966.

৬৩. Speech by Mr. Moslemuddin Khan, Mr Shamsur Rahman. Azizar Rahman Sarker and others. East Pakistan Provincial Assembly Proceedings Budgets Secsion 1966-67. Vol-30, 9th July 1966.

৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মে ১৯৬৬

৬৫. Speech by Mr. Sirázuddin, Asaduzzaman Khan. Azizar Rahman Sarkar, Md. Moslemuddin Khan and others, East Pakistan Provincial Assembly Proceedings, First Session 1967. Vol-30 7th and 18th July 1967.

65.ক. Ibid

৬৬. Speech by Mr. Moslem Uddin Khan, Assenbly Proceeding official report. East Bengal legistative Assembly. 17th January 1968.

66.ক. Ibid

৬৭. Speech by Mr. Moslem Uddin Khan,Mr. A. S Wahed Khan. Mr. Azizar Rahman Sarkar and others, Assembly Proceedings offical Report East Bengal Legisative Assembly, 17th January 1968.

67.ক. Ibid

৬৮. আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, সম্পাদক নূরুল হুদা. ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৯৬. পৃ. ১৬৫-১৬৬

৬৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ জুলাই ১৯৬৯

৭০. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* পূর্বোক্ত পৃ. ৪৪০

৭১. ঐ পৃ. ৪৪১

৭২. ঐ

৭৩. ঐ

৭৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ আগস্ট ১৯৬৯

৭৫. ঐ, ৯ জুলাই ১৯৬৯

৭৬. ড. মোহাম্মদ হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩

৭৭. ঐ পৃ. ৪৪৩-৪৪৪

৭৮. ঐ পৃ. ৪৪৪-৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুসলিম পূর্ব যুগে বাংলায় একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যা তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুর, পাহাড়পুর, সীতাকোর্ট, শালবন প্রভৃতি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে শুধু ধর্ম ও ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, কাব্য পড়ান হতোনা পাশাপাশি সে সময়ের বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক, কৃষি ও জলবিজ্ঞান, সেচপদ্ধতি ও করিগরী শিক্ষাও দেওয়া হত। অতীশ দীপঙ্কর শুধু বৌদ্ধ ধরে পন্ডিত ছিলেন না, কৃষি ও জলবিজ্ঞানও ছিলেন।[১] মুসলমান শাসনামলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী কোন পদক্ষেপ না থাকায় হিন্দু-বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি টোল ও চতুষ্পাঠী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য মক্তব ও মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান শাসকদের মধ্যে হোসেন শাহী আমল (১৪৯৪-১৫৩৮) নানাদিক থেকে গৌরবময় ছিল। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে ড. এম. আর তরফদার তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: " শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণভাবে কোন স্তর অর্জন করেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়না। হোসেন শাহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। মনে হয় শিক্ষা ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির এবং ছাত্রদের ফিকহ্ এবং আইন সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেওয়া হত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শাসক কর্তৃক এ ধরণের শিক্ষায়তনসমূহ সাধারণ মানুষের অবস্থা পরিবর্তনে কতটা সফল হয়েছিল তা পরিস্কারভাবে জানা যায় না।" [২] ঐশ্বর্যশালী মোগল আমলেও ঢাকা, মুর্শিদাবাদে বা রাজমহলে ঐতিহ্যবাহী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলমান আমলে শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে বেতন/চাঁদা কিছুই গ্রহণ করা হতোনা। বরং ইহার বিপরীতে শিক্ষার্থীর আবশ্যক কিতাবপত্র, বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, লেবাস পোষাক এমনকি তেল-সাবানের ব্যয় পর্যন্ত সরকার, আমীর-ওমরা এবং দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ বহন করতেন। কেহ মসজিদ, কেহ পীর-বোজর্গের খানকাহ যা মাজারের জন্য উহার খরচ বহন করতেন এবং মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিরাট লাখেরাজ সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যেতেন। কেহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এমনকি তজ্জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যেতেন। ১৮২৮ সালে ইংরেজ সরকার এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বেতন প্রথার প্রবর্তন করে।[৩]

ইংরেজ শাসনামলে ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলমানদের জন্য কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা (১৭৮১) এবং জোনাথন ডানকান কাশীতে একটি সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১) প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান হতোসনাতনী বিষয়ে ও প্রথায় এবং এর উদ্দেশ্যে ছিল মোল্লা ও পুরোহিতোতৈরি করা। মি: অলিভার ১৭৯২ সালে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাবে বলেন- " ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট মতের শিক্ষা ও উপাসনার উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা হোক। শিক্ষিত হইলে ভারতবাসীগণ খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। যেহেতু শিক্ষিত লোকেরা বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মানুবর্তিতা ও ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতির পথকেই অধিকতর পছন্দ

Dhaka University Institutional Repository

করে, অতএব শিক্ষার ফলে ভারতে আমাদের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পক্ষান্তরে লোক অশিক্ষিত থাকিলে দেশে বিপ্লব ও অশান্তির সৃষ্টি করিবে।"[৪]

শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোম্পানি ১৮২৩ সালে একটি 'শিক্ষা কমিটি' গঠন করে। কমিটির সুপারিশ ছিল যে, নেটিভ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশীয় সনাতনী শিক্ষা প্রদানই শ্রেয় এবং সনাতনী পদ্ধতিতেই। শিক্ষার বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত থাকবে প্রাচ্য (ওরিয়েন্টাল) বিষয়সমূহ যেমন: হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য ও প্রাচ্য দর্শন, অন্যদিকে মুসলমান ছাত্রদেরর জন্য-আরবিও ফারসি ভাষা এবং মুসলিম দর্শন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন টোল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসা খোলার সুপারিশ করা হয়। সরকারি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন শুরু করে যার নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন রায় ও তার সহকর্মীরা। তাঁদের দাবি ছিল শিক্ষা হওয়া উচিত ধর্ম নিরপেক্ষ উদার, অধ্যয়নের বিষয় প্রাচীন ভাষা, দর্শন ও সাহিত্যের পরিবর্তে পশ্চিমা উদার দর্শনশাস্ত্র, ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান আধুনিক গণিত, পদার্থ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি। রামমোহনের মতে কমিটি সুপরিশকৃত " the Sanskrit System of education would be the best calculated step to keep this country in durkness if such had been the policy of the British Legislature" কিন্তু কমিটি রামমোহনের দাবি প্রত্যাখান করে। সংস্কৃত ভিত্তিক প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮২৪ সালে।[৫]

প্রগতিশীল সমাজের শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ সালে মেকলে সুপারিশকৃত শিক্ষা প্রবর্তনে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মত দেওয়া হয়, তবে প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে ইংরেজ শাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি সুশিক্ষিত গোষ্ঠী তৈরি করা। ফলে আধুনিক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইংরেজ সরকার বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন রক্ষণশীল, তাই সরকার এমন কোন পদক্ষেপ নিতে চায়নি যার ফলে মুসলমান সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশে দুই সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা-একটি আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি পুরাতন ঐতিহ্যিক মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকে। ১৮৮২ সালের ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, ১৯০৪ সালের লর্ড কার্জনের সংস্কার, ১৯১৯ সালের স্যাডলার কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে একে আধুনিক এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নীত করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এমনকি পাকিস্তান শাসনামল ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা যায়নি।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১-৪৫ পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি.এ পর্যন্ত পাশ করা ছাত্রদের পঞ্চবার্ষিকী

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান প্রকাশ থেকে। তবে এই পরিসংখ্যানের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। উল্লেখ্য ভারত বিভাগের পূর্বে বাংলার স্কুল কলেজগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হত। নিম্নে ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা থেকে বি.এ পাশের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

প্রবেশিকা: ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা সংখ্যা ছিল- ৩৩,৩৭৬ জন। এদের মধ্যে মুসলিম- ৬৭১৭ হিন্দু ২৬,১০৯ জন, খ্রিষ্টান ৩৯৮ জন এবং অন্যান্য ১৫২ জন। ১৯৪২ সালে মোট সংখ্যা ৪৩,০০৪ জন, এদের মধ্যে মুসলিম ৯,৫৩৫ জন, হিন্দু ৩২,৭৭৭ জন, খ্রিষ্টান ৪৮৮ জন ও অন্যান্য ২০৪ জন। ১৯৪৩ সালে মোট সংখ্যা ৩৮,৮৫০জন, এদের মধ্যে মুসলিম ৯,০০৫ জন, হিন্দু ২৯,৩৮৯ জন, খৃষ্টান ৩৩৮ জন ও অন্যান্য ১১৮ জন। ১৯৪৪ সালে মোট সংখ্যা ৩৬,৭৪২ জন, এদের মধ্যে মুসলিম ৮,১০৬ জন, হিন্দু ২৮,১৩৪ জন, খ্রিষ্টান ৩৭৭ জন ও অন্যান্য ১২৫ জন। ১৯৪৫ সালে মোট সংখ্যা ৪২,৪৯৮ জন, এদের মধ্যে মুসলিম ১০,০৪১ জন, হিন্দু ৩১,৯৫২ জন, খৃষ্টান ৩৬৭ জন ও অন্যান্য ১৩৮ জন।

আই,এ : ১৯৪১ সালে মোট পাশের সংখ্যা ৯,১৩৩ জন। এদের মধ্যে ১৯৮৯ জন মুসলিম, ৬,৯২৯ জন হিন্দু, ১৫৩ জন খ্রিষ্টান এবং ৭১ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৪২ সালে মোট সংখ্যা ৯,৪৪৩ জন এদের মধ্যে ২০৮৯ জন মুসলিম ৭,০৭৬ জন হিন্দু ১৯১ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ৮৭ জন। ১৯৪৩ সালে মোট সংখ্যা ৭,১০১ জন। এদের মধ্যে ১,৮৭৭ জন মুসলিম, ৫,১২৭জন হিন্দু, ৭১ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ২৬ জন। ১৯৪৪ সালে মোট সংখ্যা ৭,২৪২ জন । এদের মধ্যে ১,৬৬৩ জন মুসলিম, ৫৪৮০ জন হিন্দু, ৮৩ জন খ্রিষ্টান ও ১৬ জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৪৫ সালে মোট সংখ্যা ৮,২৯৫ জন। এদের মধ্যে ১,৮৯৯জন মুসলিম, ৬,২৬৮ জন হিন্দু, ৭৮ জন খ্রিষ্টান ও ৫০ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

আই,এস,সি : ১৯৪১ সালে মোট পাশের সংখ্যা ৪,৭৩৩ জন। এদের মধ্যে ৪৫২ জন মুসলিম, ৪,২৫৭ জন হিন্দু, ৮৭ জন খ্রিষ্টান এবং ৩৭ জন অন্যান্য। ১৯৪২ সালে মোট সংখ্যা ৪,৮৮৮ জন এদের মধ্যে ৪৭৩ জন মুসলিম ৪,২৪৭জন হিন্দু ১২৬ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ৪২ জন। ১৯৪৩ সালে মোট সংখ্যা ৪,৫২৯ জন। এদের মধ্যে ৪৪৯ জন মুসলিম, ৩,৯৬৯ জন হিন্দু, ৯৫ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ১৬ জন। ১৯৪৪ সালে মোট সংখ্যা ৫,২০৪ জন । এদের মধ্যে ৪৯৯ জন মুসলিম, ৪,৬১৩ জন হিন্দু, ৭১ জন খ্রিষ্টান ও ২১ জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৪৫ সালে মোট সংখ্যা ৫,৯৪৫ জন। এদের মধ্যে ৫৪০ জন মুসলিম, ৫,৩১৮ জন হিন্দু, ৬৯ জন খ্রিষ্টান ও ১৮ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

Dhaka University Institutional Repository

বি.এ : ১৯৪১ সালে মোট পাশের সংখ্যা ৪,৭৬৭ জন। এদের মধ্যে ৮৩৭ জন মুসলিম, ৩,৮২৩ জন হিন্দু, ৮৯ জন খ্রিষ্টান এবং ৮ জন অন্যান্য। ১৯৪২ সালে মোট সংখ্যা ৫,৮৭২৮ জন এদের মধ্যে ৯৭৬ জন মুসলিম ৪,৫৩২ জন হিন্দু, ১৬৩ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ৫২ জন। ১৯৪৩ সালে মোট সংখ্যা ৫,২৬৮ জন। এদের মধ্যে ১,১৯৬ জন মুসলিম, ৩,৯৬০ জন হিন্দু, ৮৪ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ২৮ জন। ১৯৪৪ সালে মোট সংখ্যা ৫,০১৯ জন । এদের মধ্যে ১,১৬৭ জন মুসলিম, ৩,৭৬৪ জন হিন্দু, ৬৯ জন খ্রিষ্টান ও ১৯ জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৪৫ সালে মোট সংখ্যা ৪,৪৩০ জন। এদের মধ্যে ১,০৫৯ জন মুসলিম, ৩,১৯৬ জন হিন্দু, ৬৪ জন খ্রিষ্টান ও ১১ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

বি.এস.সি : ১৯৪১ সালে মোট পাশের সংখ্যা ১,৩১২ জন। এদের মধ্যে ৮০ জন মুসলিম, ১,২১০ জন হিন্দু, ১৯ জন খ্রিষ্টান এবং ১৩ জন অন্যান্য। ১৯৪২ সালে মোট সংখ্যা ১,৬৬২ জন এদের মধ্যে ১৯৪ জন মুসলিম ১৪০৭ জন হিন্দু, ৪০ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ২১ জন। ১৯৪৩ সালে মোট সংখ্যা ১,৭৮৮ জন। এদের মধ্যে ১৫৫ জন মুসলিম, ১,৬০৭ জন হিন্দু, ১৯ জন খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ৭ জন। ১৯৪৪ সালে মোট সংখ্যা ১,৫৩১ জন । এদের মধ্যে ১৪৯ জন মুসলিম, ১,৩৬৫ জন হিন্দু, ১৪ জন খ্রিষ্টান ও ৩ জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৪৫ সালে মোট সংখ্যা ১,৫৯০ জন। এদের মধ্যে ১২০ জন মুসলিম, ১,৪৪৩ জন হিন্দু, ২৮ জন খ্রিষ্টান ও ৯ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।[৬] এই পরিসংখ্যান থেকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মানুষ আশা করেছিল শিক্ষা-দীক্ষায় তারা উন্নতি সাধন করবে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে তার শিক্ষার মানদন্ডের উপর। দেশকে সব দিক থেকে উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষার বুনিয়াদকে শক্ত করে গড়ে তোলা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে পাঁচটি উদ্দেশ্য থাকে, যথা- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা এবং প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষন তৈরি করা। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেন, "আমাদের দেশে যারা শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করেছে তারা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করছেন না, তারা মতলব করছেন যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকে পিটিয়ে পিটিয়ে মাটির দলায় পরিণত করতে হবে অর্থাৎ পাকিস্তানিজাতি অংগীভূত প্রাদেশিক শাখা জাতিগুলিকে শিক্ষাযন্ত্রে মাড়াই করে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন করে ফেলতে হবে। তারা যেন চাচ্ছেন যে, পাকিস্তানিশুধু পাকিস্তানিই হবে তাদের আর মোটেই বাঙালি, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচী থেকে কাজ নেই।"[৭] পাকিস্তান শাসনের প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে শাসক শ্রেণী এই নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব হাজার মাইলের বেশি এবং নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পুরাতন ঐতিহ্য ইত্যাদির দিক দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ অনেক বেশি স্বতন্ত্র। তাই অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট সচেতন জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না এই সত্যটি বুঝতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘ সময় লেগেছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাঁর অধিকাংশই পূর্ব বাংলার প্রত্যাখাত হয়। জনগণ আন্দোলন অব্যাহতোরাখে। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচীতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার যে রূপরেখা তৈরী করা হয়, তা নিম্নরূপ:

১. পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামি আদর্শ অনুপ্রাণিত হবে যে আদর্শের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব,(Universal brotherhood of man), সামাজিক গণতন্ত্র (Social Democracy) এবং সামাজিক ন্যায় বিচার (Social Justice) বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করবে।
২. ছাত্রদের তাদের নিজস্ব ধর্মের মৌলিক নীতি বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৩. শিক্ষায় আত্মিক, সামাজিক এবং পেশাগত বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে।[৮]

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হওয়া উচিত বলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ মনে করেন। তবে এতে ব্যয় বেশি হওয়ায় প্রথমে পাঁচ বছর মেয়াদী করা হবে এবং সরকারের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যপ্তিকাল হবে ৮ বছর।[৯] তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার প্রচেষ্টা বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয় যেমন পাকিস্তান শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলার শিক্ষাবিদগণ হান্টার কমিশনের কাছে স্বাধীনভাবে সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানায়। তারই ফলোশ্রুতিতে হান্টার কমিশন ১৮৮৩-৮৪ সালে আইন সভায় জনহিতকর আইনবলে সরকারি আওতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত স্থানীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং এই সাথে স্কুল বোর্ড গঠিত হয় যা প্রাথমিক শিক্ষার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল।[১০] কিন্তু এই উদ্যোগের ফলেও বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি না হয়ে পিছিয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৪ সালে ১১ মার্চ শিক্ষা বিষয়ক এক প্রতিবেদনে বলা হয়:- 4 Villages out of 5 are without schools; 3 boys out of 4 grow up without education and only 1 girl in 40 attends any kind of school.[১১] ১৯২৬ সালে প্রথমবার প্রাথমিক শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করা হয় কিন্তু প্রস্তাবটি পাশ হয়নি। ১৯৩৬ সালে এবং ১৯৪৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার কথা বলা হয়।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি (১৯৫১) প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক পরিষদে বেঙ্গল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত অর্থ না পাওয়ায় দুই বৎসর পর এই প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে একুশ দফার জনপ্রিয় দাবি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার মধ্যে একটি দাবি ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। কিন্তু সরকারি সাহায্য পর্যাপ্ত না থাকায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৩] বাধ্যতামূলক এলাকার স্কুলের শিক্ষকের বেতন ছিল ৫০ টাকা এবং বাধ্যতামূলক নয় এমন স্কুলে শিক্ষকের বেতন ছিল ১৪-১৯ টাকা। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭ সালে বাধ্যমূলক স্কুলগুলিকে মডেল এবং নন-মডেল স্কুলে পরিণত করা হয়। উভয় স্কুলের শ্রেণীসংখ্যা শিক্ষক, কারিকুলাম সবই এক কিন্তু মডেল স্কুলের শিক্ষকের বেতন ৫০ টাকা এবং নন-মডেল স্কুলের শিক্ষকের বেতন ৩১ টাকা। একই গ্রামে দুই স্কুলের একই শিক্ষা ব্যবস্থা অথচ দুই স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের মধ্যে তারতম্যের ফলে শতকরা ৯০ জন শিক্ষকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এতে শিক্ষা মানের অবনতি হচ্ছে বলে প্রাদেশিক পরিষদে পরিষদ সদস্য মি: সিরাজুদ্দিন আহমদ অভিযোগ করেন।[১৫]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলো:

১. সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং স্টাফদের মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।
২. বিশেষভাবে কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত অর্থাৎ লাইব্রেরী, দালান, অন্যান্য যন্ত্রপাতির উন্নতি ফি বৃদ্ধি।
৪. নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

এই পরিকল্পনা প্রাথমিক স্কুল নিবন্ধন প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি। শিক্ষার গুণগত মানের লক্ষনীয় উন্নয়ন ঘটেনি।[১৬] প্রাথমিক শিক্ষা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় প্রাদেশিক পরিষদে পরিষদ সদস্য আব্দুল হাকিম বলেন, "২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫ লক্ষ বালক-বালিকা শিক্ষা গ্রহণ করছে অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ প্রথম শ্রেণী থেকে ঝরে পড়ে, বাকীরা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে ঝরে পড়ে। শতকরা ১২ জন উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। একমন চাউলের দাম যেখানে ৩৩ টাকা সেখানে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেতন পান মাসে ৩৬ টাকা। এদের চেয়ে যারা মজুর শ্রমিক তারা ৫০/৬০ টাকা বেতন পান। শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন না দিয়ে তার কাছ থেকে সুশিক্ষা আশা করা যায় না। শিক্ষকের বেতন না বাড়ালেও প্রশাসনিক ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। বিভাগ পূর্ব সময়ে সমগ্র বাংলার জন্য একজন Director of Public

Dhaka University Institutional Repository

Instruction দুই জন Assistant Director of Public Instruction ছিলেন। বাংলা ভাগ হওয়ার পর অর্ধবাংলার জন্য একজন Director of Public Instruction দশ জন Assistant Director of Public Instruction, ৪টি বিভাগের জন্য ৪ জন Deputy Director বা Inspector যা পূর্বেও ছিল। অফিসারের সংখ্যা বাড়াতে টাকার প্রশ্ন উঠে না কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথা বললে বলা হয় এত টাকা কোথায় পাব?" [১৭]

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৫৯) সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করা হলেও এটি দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি। সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে বলে সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে না দিয়ে তা স্থানীয় জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় স্থানীয় জনসাধারণ জমি, গৃহ, আসবাবপত্র ও শিক্ষাদানের উপকরণাদি সরবরাহ এবং শিক্ষকদের জন্য গৃহ সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থানীয় কমিটি বা সংস্থাসমূহের উপর ন্যস্ত করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করে। [১৮]

ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ সম্পর্কিত কমিশনের (১৯৬৬) মন্তব্য ছিল সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় হয়েছে বলে মনে হয় না। কমিশন সুপারিশ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০) পূর্ব পাকিস্তানে ১০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ হাজার নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক কৃষিকোর্স প্রবর্তনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা ত্বরান্বিত করা উচিত। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে আরবিবর্ণমালা ও কায়দা পড়ান উচিত বলে কমিশন মন্তব্য করে। [১৯]

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার ইচ্ছা সরকারের ছিল না বরং কখনও কখনও এর বিরোধিতা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে জাতীয় পরিষদে সমগ্র প্রদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি সম্মিলিত একটি বিরোধী দলীয় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন প্রাদেশিক পরিষদের শিক্ষামন্ত্রী মফিজ উদ্দিন আহমদ। প্রাদেশিক পরিষদের বেসরকারি দিবসে বিরোধী দলীয় সদস্য ডা. আজহার উদ্দিন তার প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামলূক করার প্রস্তাব বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাবটির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলেও বলেন, সমগ্র প্রদেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারটি একটি এলাহি কান্ড এবং রাতারাতি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। তিনি আরো বলেন, তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৫-৭০) ৫২ লক্ষ ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

হবে। তিনি জনাব আজহারকে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ করেন। বিরোধী দলের সদস্য আব্দুল হামিদ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, "সরকার উন্নয়নের নামে গ্রামাঞ্চলের ৯৬ হাজর টাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কিছু দালান করেছেন বটে কিন্তু সেই দালানী বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীর্ঘদিন বেতন পান না বা বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরিপান না। উন্নয়ন দেখানোর জন্য দালান না করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান। বিরোধী দলের আব্দুল মালেক বলেন, যে সরকার নিম্নস্তরের শিক্ষার দিকে মোটেই নজর দেন নাই । আজ পর্যন্ত দেশে মাত্র শতকরা ১৯ জন শিক্ষিত এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে উপযুক্ত ৪০ লক্ষ ছাত্র শিক্ষা লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত। নতুন শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাবনায় (১৯৬৯) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক কোন পরিবর্তনের কথা না বলে বলা হয় প্রাথমিক এবং মিডল স্কুলকে একীভূত করে মৌলিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হোক এবং শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক।[২১]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ক্রমেই অনুসরণ করা হয় তবে বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা করা হয়। বোর্ড কর্তৃক ১৯৫০ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক পরীক্ষার নাম পরিবর্তন করে' মেট্রিকুলেশন' করা হয়। বাংলা ১০০ নম্বরের স্থলে ২০০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের ধর্মীয় বিষয় (উর্দু) আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্রমে তেমন পরিবর্তন করা হয়নি শুধুমাত্র মেয়েরা জন্য অংকের পরিবর্তে 'পাটিগণিত ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি' বিষয় নিতে পারত যা অংকের মত এবং বিষয়টি ১০০ নম্বরের একপত্র বিশিষ্ট ছিল।[২২]

১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অবশ্যই দু'টি নীতি নির্ভর হবে। প্রথমত: উহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি দ্রুত বর্ধিষ্ণু সমাজে যোগ্য ও সুখী জীবন যাপনোপযোগী জ্ঞান আহরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল বিষয়সমূহ শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয়ত: এতে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে যাতে সে জীবনে সুনির্দিষ্ট বৃত্তি ও জীবিকার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। এছাড়াও বলা হয় জাতীয় ভাষা, বিজ্ঞান,গণিত শিক্ষাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং সাহিত্যের চেয়ে একটি কার্যকরী বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ান উচিত।[২৩] মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ সরকার গ্রহণ করলেও আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ, ছাত্র বেতন থেকে ৬০ ভাগ ও পরিচালক মন্ডলী বহন করবে শতকরা ২০ ভাগ। এতেও শর্ত আরোপ করা হয় যে, যেসব স্কুলের প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষক, গৃহ ও সাজ সরঞ্জামসহ বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে শুধু সেই সব স্কুল মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ সরকারি সাহায্য পাবে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় কমিশন রিপোর্ট (১৯৬৬) ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ কোন সুনিশ্চিত মূল সমস্যা বা ইস্যুর করা উল্লেখ করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের দাবির বিপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। পাঠ্যক্রম নির্বাচনে পূর্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। কিন্তু সরকারি অর্থের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলা হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমাত্রিক কোর্স (diversification course) প্রবর্তনের কথা বলা হয়। [২৫]

নয়া শিক্ষানীতির জন্য প্রস্তাব (১৯৬৯) এ কমিশন মাধ্যমিক স্তরে পেশাভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনের জন্য মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে পেশাভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়। তবে কমিশন শিক্ষা কাঠামোর সংস্কার, শিক্ষা প্রশাসনের পুণর্বিন্যাস, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। [২৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৯২০ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় কোর্ট বা সিনেট এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা সিন্ডিকেটের উপর। উপাচার্যের নিয়োগের ক্ষমতা এককভাবে চ্যান্সেলরকে দেয়া হয়নি। কার্যকরী কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে আচার্য উপাচার্যকে নিয়োগ করবেন এবং আইন দ্বারা তাঁর কার্যপদ্ধতি বেঁধে দেওয়া হয়।[২৭] বলা যায় ব্রিটিশ সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর প্রথম অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকরী সংসদ বা সিন্ডিকেটকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (East Bengal Education Ordinance 1947, Ordinance NO. 1. 1947) পরের বছর আরেকটি সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে বা সিনেটে ৫০ জন পছন্দমত ব্যাক্তিকে সদস্য মনোনয়ন দানের ক্ষমতা গ্রহণ করে কোর্টকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (Dacca University Amendment Ordinance 1948, EB. ordinance No XIX of 1948.) এইসব আইনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক-ছাত্রদের সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পূর্ববঙ্গ সংশোধনী) আইন ১৯৫৩-৪৫ এ জারি করা হয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের কোন শিক্ষক বা কর্মচারী নির্বাচনে প্রচারণা বা নিজে প্রার্থী হতে পারবে না। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে আচার্য এবং আচার্যের উপর উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা অর্পন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিক্ষকদের মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। সামান্য অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনওয়ারুল হকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বিধির দক্ষতা ও শৃঙ্খলার অভিযোগ আনা হয়। তাঁকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসাত্মক কার্যের অভিযোগে চাকরী হতে অপসারণ করা হয়। ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক লিখিত একপত্রে বলা হয় যে, চ্যান্সেলর মনে করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তানের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে চাকরীতে বহাল রাখা উচিত হবে না। সুতরাং আপনাকে অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধানমতে চাকরী হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো । উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আদালতে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। [২৭]

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন অব্যাহতোরাখে তখন সরকার তাদেরকে ভয়ভীতি, বহিস্কারসহ বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছাত্রদের আন্দোলন এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ ওসমান গণি ছাত্রদে রাজনীতি করা সম্পর্কে বলেন, " ছাত্রদের রাজনীতি হতে দূরে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হচ্ছে ছাত্র অসন্তোষের প্রধান কারণ। রাজনীতিবিদগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের ব্যবহার করে। যে সব ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পথে সমস্যার সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আসন্ন নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় আসুন না কেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় গঠনমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।" [২৮]

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সেই ধরণের প্রশাসন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কাজ ত্বরান্বিত হয়। বাধা মুক্তভাবে তা করা সম্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে ১৯৬৫ সালে International Association of University (I.A.U)-এর চতুর্থ সাধারণ কনফারেন্স কর্তৃক কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে ৫টি অত্যাবশ্যকীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে-

১. পছন্দমত শিক্ষক ও স্টাফ নিয়ুক্তির অধিকার;
২. ছাত্র নির্বাচনে নিরঙ্কুশ অধিকার;
৩. প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং একাডেমিক মান নির্ণয়ের ক্ষমতা ও অধিকার;
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত গবেষণা ও প্রকল্প ও কর্মসূচী চূড়ান্ত করার স্বাধীনতা;
৫. বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ বন্টন করে নেয়ার দায়িত্ব। [২৯]

কিন্তু পাকিস্তান শাসনের পুরো সময় ধরে শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। একের পর এক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স পাশ করে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের যৌথ অধিকার হরণ করা হয়। তাঁদের স্বাধীন চিন্তাচেতনায় বাধা দেওয়া হয়। বিদেশিসংস্থা থেকে প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের অধিকাংশ অর্থও পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় পাকিস্তানে ৫০০টি কলেজের মধ্যে ২২৫টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৯০ ভাগ অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান এই সংখ্যা ছিল ৫০:৫০ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পাওয়া যায়। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ০৫টি পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে উচ্চ শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায় সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তাঁর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের চরিত্র থেকে একটি কট্টর ধর্মীয় ও সামরিক ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[৩০] অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যে চরম বৈষম্য ও অবহেলো র স্বীকার হয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তারই ফলশ্রুতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের অংশ পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. অজয় রায়, *শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা: কিছু অনিয়মিত ভাবনা* হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা, সূচীপত্র প্রকাশনা. ২০০২, পৃ. ২৫-২৬

২. উদ্ধৃত: অজয় রায়, ঐ, পৃ. ২৪-২৫

৩. *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩২শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ,চৈত্র ১৩৬৭

৪. ঐ

৫. উদ্ধৃত: অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৭

৬. *মাসিক মোহাম্মদী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪. পৃ. ৭০৩

৭. *সওগাত*, শ্রাবণ ১৩৫৯

৮. *Proceedings of the Pakistan Educational conference* held at Karachi from 27th November to 1st December 1947. Education division. Government of Pakistan. Pp-32-33.

৯. Ibid. pp.31-32.

১০. মোহাম্মদ হান্নান, *শিক্ষা ব্যবস্থা* হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা. ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনা, ২০০২, পৃ. ৪২২

১১. উদ্ধৃত: মোহাম্মদ হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

১২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ২০০১, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, *সর্বজনীন শিক্ষা: অতীত,বর্তমান, ভবিষ্যত* হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনা, ২০০২, পৃ. ৭৭-৭৮

১৪. Speech by Mr. A.F.M. Abdul Jalil Assembly Proceedings Official Report. East Bengal Legislative Assembly. 17th September 1956. Vol. Xv. No.1.

১৫. Speech by Mr. Sirajuddin Ahmad, Assembly Proceedings Official Report. East Bengal Legislative Assembly. First Session 25th June 1962. Vol. 21.

১৬. Dr. W.M. Zaki, Education development in Pakistan A Study of Educational development in Relation to Manpower Requirements and resource Availability, Ministry of education, Government of Pakistan. Islamabad 1968.

১৭. Speech by Abdul Hakim, Assembly Proceedings Official Report. East Bengal Legislative Assembly. First Session 25th June 1962. Vol. 21.

১৮. *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ. ২২৩-২২৬

১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ এপ্রিল ১৯৬৬

২০. ঐ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫

২১. *Proposals for a New Educational Policy*, Ministry of education and scientific Research, Government of Pakistan. pp.8-9.

২২. আবুল খায়ের খান চৌধুরী, *মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের ক্রমবিবর্তন* হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনা, ২০০২, পৃ. ১১৮-১১৯

২৩. *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* ১৯৫৯, পৃ. ১৭৯

২৪. ঐ, পৃ. ১৮০-১৮১

২৫. *Report of the Commission on Students Problems and welfare*. Karachi 1966, pp.30-34.

২৬. *Proposals for a New Educational Policy*, Ministry of education and scientific Research, Islamabad. July 1969, pp.22-23.

২৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৪

২৮. ঐ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৪

29. ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলম, শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ২০০১, পৃ. ১২৮

৩০. আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, *দৈনিক যুগান্তর*, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

GOVERNMENT MIDDLE AND JUNIOR HIGH SCHOOLS IN EAST PAKISTAN TILL MARCH 1968

Name of School	Post-office	Police-station	Subdivision	District
1. Chittagong Government M.E. School	Chittagong	Kotwali	Chittagong Sadar North	Chittagong
2. Kanaighat Government Junior High School	Kanaighat	Kanaighat	Sylhet Sadar	Sylhet
3. Jaintapur Government Junior High School	Jaintapur	Jaintapur	Ditto.	Do
4. Govindapur Government Junior High School	Govindapur	Madhabpur	Habiganj	Do.
5. Rajabazar Government Junior High School	Rajabazar	Chunarughat	Do.	Do.

Source: Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate. Government of East Pakistan, March, 1968. P.1

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

GOVERNMENT BOYS HIGH SCHOOLS IN EAST PAKISTAN.

Name of District	Name of Subdivision	Name of School
Dacca	Dacca Sadar South	1. Armanitola Government High School, Dacca-1.
Do	ditto	2. Collcgiate Schoo, Sadarghat, Dacca-1.
Do	ditto	3. Nawabpur Government High School, Dacca-1.
Do	ditto	4. New Government High School, Armanitola, Dacca-1.
Do	ditto	5. Government Muslim High School, Bahadur Shah Park, Dacca-1.
Do	ditto	6. Government Laboratory High School, Near New Market, Dacca-2.
Do	ditto	7. Mohammadpur Government High School, Dacca-7.
Do	ditto	8. Khilgaon Government High School, P.S. Tejgaon.
Do	ditto	9. Narinda Government High School, Dacca-1.
Do	ditto	10. Government Boys High School, Dhanmandi, Dacca-2.
Do	ditto	11. Central Government High School, Boys Section, Motijheel, Dacca-2, P.S. Tejgaon.
Mymensing h	Mymensingh Sadar South.	12. Mymensingh Zilla School, Mymensingh
Do	Jamalpur	13. Jamalpur Government High School.
Do	Kishoregan‡jv	14. Kishoregan‡jv Boys' High School Multilateral (Provincialised with effect from 1-8-1967 or any suitable date in terms of G.O. NO. 770-edn. dated. 31-7-1967).
Faridpur	Faridpur Sadar	15. Faridpur Zilla School.
Chittagong	Chittagong Sadar North	16. Chittagong Collegiate School, Ice Factory Road.
Do	ditto	17. Government Muslim High School, Chittagong Court Road.
Do	ditto	18. Nasirabad Government High School, Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

Do	ditto	19. Bakalia Government High School, Chittagong.
Chittagong Hill Tracts.	Rangamati	20. Rangamati Government High School.
Do	Bandarban	21. Bandarban Government High School.
Comilla	Comilla Sadar South	22. Comilla Zilla School.
Do	ditto	23. Comilla Government High School, Kotbari.
Do	Chandpur	24. Chandpur Technical High School.
Noakhali	Noakhali Sadar	25. Noakhali Zilla School.
Do	ditto	26. Begumgan‡jv Technical High School.
Do	Feni	27. Feni Pilot High School (Provincialised with effect from 1-8-1967 or any suitable date in terms of G.O. NO. 770-edn. dated. 31-7-1967).
Sylhet	Sylhet Sadar	28. Sylhet Government High School.
Do	ditto	29. Zakigan‡jv Government High School.
Do	Sunamgan‡jv	30. Sunamgan‡jv Government High School.
Do	Moulvibazar	31. Moulvibazar Government High School.
Do	Habigan‡jv	32. Habigan‡jv Government High School.
Khulna	Khulna	33. Khulna Zilla School.
Do	Do	34. Khulna Government High School.
Do	Bagerhat	35. Bagerhat Nurul Amin High School. (Provincialised with effect from 1-8-1967 or any suitable date in terms of G.O. NO. 770-edn. dated. 31-7-1967).
Bakergan‡jv	Bakergan‡jv Sadar South	36. Barisal Zilla School.
Do	ditto	37. Jhalakati Government High School.
Do	Bhola	38. Bhola Government High School.
Do	Perojpur	39. Perojpur Government High School.
Jessore	Jessore Sadar	40. Jessore Zilla School.
Kushtia	Kushtia Sadar	41. Kushtia Zilla School.
Rajshahi	Rajshahi Sadar	42. Rajshahi Collegiate School.

Dhaka University Institutional Repository

Do	ditto	43. Rajshahi Government High Madrasah.
Do	ditto	44. Shiroil Government High School.
Dinajpur	Dinajpur Sadar	45. Dinajpur Zilla School.
Do	Thakurgaon	46. Thakurgaon Boys' High School, (Provincialised with effect from 1-8-1967 or any suitable date in terms of G.O. NO. 770-edn. dated. 31-7-1967).
Rangpur	Rangpur Sadar	47. Rangpur Zilla School.
Do	Nilphamari	48. Saidpur Technical High School.
Pabna	Pabna Sadar	49. Pabna Zilla School.
Bogra	Bogra Sadar	50. Bogra Zilla School.

Source: Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate, Government of East Pakistan, March, 1968, pp, 2-4.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

GOVERNMENT GIRLS' HIGH SCHOOLS IN EAST PAKISTAN.

Name of District	Name of Subdivision	Name of School
Dacca	Dacca Sadar South	1. Bangla Bazar Government Girls' High School.
Do	ditto	2. Central Government Girls' High School Girls' Section,Motijheel.
Do	ditto	3. Government Girls' High School, Dhanmandi, Dacca-2.
Do	ditto	4. Quamrunnessa Girls' High School, Bengali Section, Tikatuly.
Do	ditto	5. Quamrunnessa Girls' High School, Urdu Section-2, Orphanage Road.
Do	Munshigan‡jv	6. Munshigan‡jv A.V.J.M. Girls' High School, Munshigan‡jv , (Provincialised in terms of G.O. NO. 769-Edn. dated. 31-7-1967 with effect from 1-8-1967 or any suitable date).
Do	Narayangan‡jv	7. Government Girls' High School, Narayangan‡jv .
Mymensingh	Mymensingh Sadar South	8. Vidyamayee Girls' High School, Mymensingh.
Faridpur	Faridpur Sadar	9. Faridpur Government Girls' High School, Faridpur.
Chittagong	Chittagong Sadar South	10. Dr. Khastagir's Government Girls' High School, Chittagong
Do	ditto	11. Government Girls' High School, Nasirabad. P.S. Panchlaish, Chittagong.
Comilla	Comilla Sadar South	12. Faizunnessa Government Girls' High School, Comilla.
Noakhali	Noakhali Sadar	13. Government Girls' High School, Noakhali.

Dhaka University Institutional Repository

Sylhet	Sylhet Sadar	14. Government Girls' High School, Sylhet.
Do	Hobigan‡jv	15. B.K.G.C. Girls' High School, P.S. Habigan‡jv, Sylhet. (Provincialised in terms of G.O. NO. 769-Edn. dated. 31-7-1967 with effect from 1-8-1967 or any suitable date).
Khulna	Khulan Sadar	16. Khulna Government Coronation Girls' High School.
		17. Government Girls' High School, Boyra, P.S. Daulatpur, District- Khulna.
Bakergan‡jv	Barisal Sadar South	18. Barisal Sadar Government Girls' High School, Barisal.
Jessore	Jessore Sadar	19. Government Girls' High School, Jessore.
Kushtia	Kushtia Sadar	20. Government Girls' High School, Kushtia.
Do	Chuadanga	21. Chuadanga Girls' High School, Chuadanga, (Provincialised in terms of G.O. NO. 769-Edn. dated. 31-7-1967 with effect from 1-8-1967 or any suitable date).
Rajshahi	Rajshahi Sadar	22. P.N. Girls' High School.
Do	Ditto.	23. Government Girls' High School, Rajshahi, P.S. Boalia, Dist. Rajshahi.
Dinajpur	Dinajpur Sadar	24. Dinajpur Government Girls' High School, Dinajpur.
Rangpur	Rangpur Sadar	25. Government Girls' High School, Rangpur.
Pabna	Pabna Sadar	26. Pabna Government Girls' High School, Pabna.
Do	Serajgan‡jv	27. Serajgan‡jv Saleha Ishaque Girls' High School, Serajgan‡jv. (Provincialised in terms of G.O. NO. 769-Edn. dated. 31-7-1967 with effect from 1-8-1967 or any suitable date).
Bogra	Bogra Sadar	28. Government Girls' High School, Bogra.

Note: B.K.G.C. Girls High school, Habigan‡jv, was amalgamated with Habigan‡jv Government Girls' Junior High School with effect from1-11-67 in terms of G.O. No. SI/1087-Edn., Dated November 21,1967.

Source: Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate, Government of East Pakistan, March, 1968, PP, 5-7.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

PRIMARY TRAINING INSTITUTES IN EAST PAKISTAN

District	Sub-division	Name of Institute
Chittagong	Chittagong Sadar South	1. Primary Training Institute, Patiya.
Do	Chittagong Sadar North	2. Primary Training Institute, Chittagong.
Do	Cox's Bazar	3. Ditto Cox's Bazar
Commilla	Commilla Sadar South	4. Ditto Commilla.
Do	Chandpur	5. Ditto Aligan‡jv .
Do	Brahmanbaria	6. Ditto Brahmanbaria
Noakhali	Noakhali Sadar	7. Ditto Maijdi.
Do	Do	8. Ditto Lakshmipur
Do	Feni	9. Ditto Feni
Sylhet	Sylhet Sadar	10. Ditto Sylhet
Do	Habigan‡jv	11. Ditto Habigan‡jv
Do	Moulvibazar	12. Ditto Moulvibazar
Do	Sunamgon‡jv	13. Ditto Sunamgon‡jv
Dacca	Manikgon‡jv	14. Ditto Manikgon‡jv
Do	Munshigon‡jv	15. Ditto Munshigon‡jv
Do	Narayangon‡jv	16. Ditto Narayangon‡jv
Faridpur	Faridpur Sadar	17. Ditto Faridpur
Do	Madaripur	18. Ditto Charmuguria.
Mymensingh	Mymensingh Sadear, South	19. Ditto Mymensingh
Do	Ditto	20. Ditto Primary training Institute attached to teachers' Training College for Women, Mymensingh.
Do	Kishoregan‡jv	21. Primary training Institute, Kishoregan‡jv .
Do	Jamalpur	22. Ditto Jamalpur.
Do	Netrakona	23. Ditto Netrakona.
Do	Tangail	24. Ditto Tangail.
Bakergon‡jv	Barisal Sadar South	25. Primary training Institute,Sagardi
Do	Bhola	26. Ditto Bhola
Do	Patuakhali	27. Ditto Patuakhali
Do	Perojpur	28. Ditto Perojpur
Kushtia	Kushtia Sadar	29. Ditto Kamalapur, Kushtia.
Jessore	Jessore Sadar	30. Ditto Jessore.
Do	Jhenaidah	31. Ditto Jhenaidah.
Do	Magura	32. Ditto Magura.
Khulna	Khulna Sadar	33. Ditto Khulna
Do	Satkhira	34. Ditto Satkhira

Dhaka University Institutional Repository

Do	Bagerhat	35. Ditto	Bagerhat
Rajshahi	Rajshahi Sadar	36. Ditto	Rajshahi
Do	Natore	37. Ditto	Natore
Do	Naogaon	38. Ditto	Naogaon
Dinajpur	Dinajpur Sadar.	39. Ditto	Dinajpur
Do	Thakurgaon	40. Ditto	Thakurgaon
Rangpur	Rangpur Sadar	41. Ditto	Rangpur
Do	Gaibandha	42. Ditto	Gaibandha
Do	Kurigram	43. Ditto	Kurigram
Do	Nilphamari	44. Ditto	Nilphamari
Bogra	Bogra Sadar	45. Ditto	Bogra
Do	Ditto	46. Ditto	Sonatala, Bogra
Pabna	Pabna Sadar	47. Ditto	Pabna
Do	Serajgan‡jv	48. Ditto	Serajgan‡jv .

Note: Primary training institutes are intended to turn out trained teachers for primary schools. The duration of the course is one year and the session ordinarily commences from the 1st July. Candidates for admission must have passed the Secondary School Certificate Examination or an equivalent examination and shall not ordinarily be over years of age on the 1st July of the year in which admission is sought. The rate of stipend is Rs. per month.

Source: Directory of Government Educational Institutions in East Pakistan. Government of East Pakistan. Bureau of educational Information and Statistics, March, 1968, Pp.11-12.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

JUNIOR TRAINING COLLEGES IN EAST PAKISTAN

Name of College	Year of Establishment	Course of Study offered
1. Junior Training College, Chittagong	1869	Higher Secondary Certificate (Education Group)
2. Junior Training College, Rangpur.	1882	Ditto.
3. Junior Training College, Feni, District Noakhali.	1963	Ditto.
4. Junior Training College, Jessore	1963	Ditto.

Note: Junior Training College, Dacca, was merged with Islamic Intermediate college, Dacca, with effect from the 1st July, 1966 in terms of G.O. No. 666-Edn. Dated 18-11-66.

Source: Directory of Government Educational Institutions in East Pakistan. Government of East Pakistan. Bureau of educational Information and Statistics., March, 1968, P-14

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

TEACHERS' TRAINING COLLEGES IN EAST PAKISTAN

Name of College	Year of Establishment	Course of Study offered
1. Teachers' Training College, Dacca-2	1910	B.Ed. (Group A).
2. Teachers' Training College, Mymensingh	1948	(i) B. Ed. (Group C) (ii) M.A. in Education (a One-year course after B.Ed.)
3. Teachers' Training College for Women, Mymensingh.	1952	B.Ed. (Group B) for graduates and Certificate in Education for under graduates.
4. East Pakistan College of Physical Education, Satmasjid Road, Dacca-7.	1954	(i) A One-year course Leading to Bachelor's Degree in Physical Education for Graduates. (ii) A One-year course Leading to Junior Diploma in Physical Education for under-graduates.
5. Teachers' Training College, Rajshahi.	1956	B.Ed.
6. Teachers' Training College, Comilla.	1963	B.Ed. (Group D).

Note- The foundation stone of Teachers' Training college, Comilla, was laid by General Mohammad Azam Khan, H.Q.A., the then Governor of East Pakistan, on January 10,1962. The college, however, started functioning with 113 trainees from August 1, 1963.

Source: Directory of Government Educational Institutions in East Pakistan. Government of East Pakistan. Bureau of educational Information and Statistics., March, 1968, p-15.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

GOVERNMENT MADRASAHS IN EAST PAKISTAN.

Name of College	Year of Establishment	Course of Study offered
1. Government Madrasah, Sylhet	1913	(a) Dakhil (b) Alim (c) Fazil (d) Kamil (e) High Madrasah Section (Classes VI to X)
2. Madrasah-i-Alia, Bakshibazar, Dacca-1.	1947	(a) Dakhil-6 years (b) Alim-2 years (c) Fazil-2 years (d) Kamil-2 years

Notes- The Government Madrasah, Sylhet, enrolled 280 students on the 31st October, 1966 against 339 on the same date in the previous year. The decrease in enrolment was due to delay in the announcement of the results of Final Examinations and consxequent late admission of students. The Madrasah enrolled 319 students on the 31st October, 1967.

The total enrolment of Madrasah-i-Ali, Dacca, on October 31, 1967 was 375 (including 56 in Dakhil classes, 42 in Alim Classes, 44 in Fazil Classes, 178 in Kamil Classes and 55 in Qirat Classes.)

Source: Source: Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate, Government of East Pakistan, March, 1968. p-17.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

MEDICAL COLLEGES IN EAST PAKISTAN.(1946-58)

Name of College	Year of Establishment	Course of Study offered
1. Dacca Medical College	1946	M.B.B.S.
2. Sir Salimullah Medical College, Dacca	February,1963	Condensed M.B.B.S.
3. Chittagong Medical College	1957	M.B.B.S.
4. Mymenshingh Medical College	July, 1962	M.B.B.S.
5. Sylhet Medical College	October, 1962	M.B.B.S.
6. RajshahiMedical College	1958	M.B.B.S.

Note- The M.B.B.S. course extends over a period of five years after Higher Secondary Certificate Examination. (Science Group).

Source: Bureau of Educational Information and Statistics Education Directorate, Government of East Pakistan, March, 1968. P. 25

পরিশিষ্ট-৯

উভয় পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের ১৯৩১ ও ১৯৫১ সালের শিক্ষিতে শতকরা হার নিম্নে দেখান হলো:

প্রদেশ	১৯৩১ শিক্ষিতের হার (b)	১৯৫১ প্রধান ভাষা	লিখতে পারে এমন শিক্ষিতের হার (a)
১. বেলুচিস্তান এবং স্টেট ইউনিয়ন	১.৬	উর্দু	৩.৯
২. পূর্ব বাংলা	৫.৭(d)	বাংলা	১৩.৪(c)
৩. ফেডারেল ক্যাপিটাল এরিয়া, করাচী	(c)	উর্দু	১৮.৪
৪. এন.ডব্লিউ. এফ.পি জেলা	২.২	উর্দু	৫.২
৫. পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর	২.৮(d)	উর্দু	৭.৩
৬. সিন্ধু ও খায়েরপুর স্টেট	২.০	উর্দু	৬.১

Source: Census Report of Pakistan 1951 Statement 4-F. P. 79.

পরিশিষ্ট-১০

লিঙ্গের ভিত্তিতে ১৯৬১ , ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের শিক্ষিতের শতকরা হার নিম্নে দেখান হলো:

বৎসর	উভয়	পুরুষ	মহিলা।
১৯৬১	১৭.০	২৬.০	৮.৬
১৯৭৪	২০.২	২৭.৬	১২.২
১৯৮১	১৯.৭	২৫.৮	১৩.২

Source: Bangladesh Population Census 1981. Analytical Findings and National Tables. August 1984. Bangladesh Bureau of Statistics. Table-2. P.80.

পরিশিষ্ট-১১

মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্মিলিত চূড়ান্ত ফলাফল- (গ্রুপ অনুযায়ী) ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০

বৎসর	কলা			বিজ্ঞান			বাণিজ্য			অন্যান্য			মোট		
	অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.
১৯৪৯	৪৭৮৯	১৯৭৮	৪১.৩০	২৩৫৯	১১২৭	৪৭.৭৭	১০৭	৯৩	৪৯.৭৩	-	-	-	৭৩৩৫	৩১৯৮	৮৩.৬০
১৯৫০	৫২৯৮	১১৯৫	২২.৫৬	২৩১৫	৪৯৩	২১.৩০	১২৭০	৩৭৪	৮৯.৪৫	-	-	-	৮৮৮৩	২৬৬২	২৩.২১
১৯৫১	৬৩৫০	১৫৪০	২৪.২৫	৩০৫৫	৯৩১	৩০.৪৭	১৪৩৮	৩৭৪	৭৬.০১	-	-	-	১০৮৪৩	২৮৪৫	২৪.২৫
১৯৫২	৩৮২৭	১২৯০	৩৩.৭১	২৫২০	৯১৭	৩৬.৩৯	১৯৪৪	৪৭২	২৪.২৮	-	-	-	৮২৯১	৭৯	৩২.৩১
১৯৫৩	৪১৩৬	১৪৬৬	৩৫.৪৪	২২৯৫	৮৪১	৩৬.৬৪	১৭২১	৪৭৯	২৭.৮৩	-	-	-	৮১৫২	৮৬	৩৪.১৮
১৯৫৪	৩৬৬৪	১৩৭৩	৩৭.৪৩	১৬৮২	৭৩৬	৪৩.৭৬	১৬৫১	৫৫৭	২৮.৮৩	-	-	-	৭০০১	২৬৮৫	৩৬.৯২
১৯৫৫	৬৫৯৫	১৭৪৯	২৬.৫২	২৭১২	৯৭২	৩৫.৮৪	২০১২	৭০৫	২৭.৬৮	-	-	-	১১৩১৫	-	২৮.৯৬
১৯৫৬	৭৫৪৫	২৪৩৩	৩২.২৫	২৯৯১	৮৬৬	২৮.৯৫	২০৮৮	৬৬৪	৮.৭৬	-	-	-	১২৬২৪	-	৩১.৭২
১৯৫৭	৭৬১২	২৮৭৫	৩৭.৭৭	৩২০৩	১২৩১	৩৮.৪৩	১৮৮২	৭১৭	৫.২৮	-	-	-	১২৬৭৭	-	৩৭.৫৭
১৯৫৮	৭৯২৬	২৮৮৪	৩৬.৩৯	৩৩৫৩	১৪২৭	৪২.৫৬	১৯৭৭		৬.২৭	-	-	-	১৩২৫৬	-	৩৭.৯৩
১৯৫৯	৯৩৩৩	৩১০৫	৩৩.২৭	৩৭৪৩	১২৩৩	৩২.৯৪	২৬৯৪	৭৮৬	২৯.১৮	-	-	-	১৫৭৭০	-	৪৬.৩৬
১৯৬০	৯৬৫৮	৩৬৯০	৩৮.২১	৯৩৫১	১৭৩৭	৪৩.৯৬	৩১৫২	১০৬৭	৮৩.৮৫	-	-	-	১৬৭৬১	-	৪৬.৫৮
১৯৬১	৯৮৫৪	৪৫৩৪	৪৬.০১	৪৫৩৫	২৩৯৫	৫২.৮১	৩৩৪০	১২৮৪	৩৮.৪৪	-	-	-	১৭৭২৯	-	৪৮.৬৫
১৯৬২	১৪১৭৩	৬৪৪৩	৪৫.৪৬	৭৬২১	৩৭৪৪	৪৯.১৩	৯৬৯৫	২৬২৪	৪৬.০৮	৭৩	২৮	৩৮.৩৬	২৭৫৬২	-	-
১৯৬৩	১২৫১২	৫৮৭৮	৪৬.৯৮	৬৩১২	৩২১৯	৫১.০০	৬৩২৪	৩১১৫	৪৯.২৬	৮৭	৬৪	৭৩.৫৬	২৫২৩৫	-	-
১৯৬৪	১৩৮০০	৭০০৪	৫০.৭৫	৮১২২	৪২৮৮	৫২.৭৯	৮৬৭৫	৪৪১৮	৫০.৯৩	৮১	৬৪	৯৭.০১	৩০৬৭৮	১৫৭৭৪	৫১.৪২
১৯৬৫	৫৫০১৮	২১৩৯৬	৩৮.৮০	১৭৬৬১	৭০৭২	৪০.১৫	৫৩৩৯	২৪৯৮	৪৬.৭৭	৫৮৪	২৬৭	৪৫.৭২	৭৮৫৫৭	৩১২৩২	৩৯.৭৬
১৯৬৬	২৯৯৮৩	১১৪০০	৪৭.৫৩	১১০৯৩	৫৫০৪	৪৯.৬২	১৮৮৭৩	৬৭০৪	৪৩.০৪	১৪১	১০২	৭২.৩৪	৫০৭৯০	২৩৭১০	৪৬.৬৮
১৯৬৭	৩০১৮৯	১৪৮৫৩	৪৯.২০	১৩৩৯১	৯৯২৩	৭৪.১০	১৮৬৭৩	৮৮০৮	৪৭.১৭	-	-	-	৬২২৫৩	৩৩৫৮৪	৫৩.৯৫
১৯৬৮	৩৩৭৩২	১৮৪০০	৫৪.০০	১৫২৮৯	৭৮৫৩	৫১.৩৬	১৯৩১৬	১১৬৫৭	৬০.৩৫	-	-	-	৬৮৩৩৭	৩৭৯১০	৫৫.৪৮
১৯৬৯	৩৫৯৩২	২১২৩৩	৫৯.০৯	১৭৪০৫	১১৩২৫	৬৫.০৭	২১২৮৭	১২৬২০	৫৪.০৮	-	-	-	৭৫৬৫	৪৫১৭৮	৬০.১৯
১৯৭০	৪৪১৩৮	৩২০৬৫	৭৮.৬৫	১৯৫৩১	১১৪৫৯	৫৮.৬৭	১৮৮৯০	৯৮২০	৫১.৯৯	-	-	-	৮২৫৫৯	৫৩৩৪৪	৬৪.৬১

Source: Bangladesh Bureau of Education Information and Statistic (Banbeis) Ministry of Education, Dhaka-1985, Table-2, P.3.

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক পরীক্ষার (এস.এস.সি) সম্মিলিত চূড়ান্ত ফলাফল- (লিঙ্গভিত্তিতে- প্রতিগ্রুপের) ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত

বছর	ছাত্র			ছাত্রী			মোট		
	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার
১৯৫২	২৬১৯৭	১৩২০৬	৫০.৪৭	১০৩৮	৬১২	৫৮.৪৬	২৭২৩৫	১৩৮১৮	৫০.৭৪
১৯৫৩	৩২৮৭৬	১৫৯০৯	৪৮.৩৯	১১২৮	৭০৭	৬২.৬৮	৩৪০০৪	১৬৬১৬	৪৮.৮৬
১৯৫৪	৩০৬৭৩	১৪০৪৭	৪৫.৭৯	১৩৬৭	৮০৪	৫৮.৮১	৩২০৪০	১৪৮৫১	৪৬.৩৫
১৯৫৫	৩২৮৫০	১৪৩৪৭	৪৩.৬৭	১৭৬৯	৮০৭	৪৫.৬২	৩৪৬১৯	১৫১৫৪	৪৩.৭৭
১৯৫৬	৩৪৫২৯	১৭১৬৪	৪৯.৭১	২২৪৮	১০৩৫	৪৬.০৪	৩৬৭৭৭	১৮১৯৯	৪৯.৪৮
১৯৫৭	৪৫৪৯৮	২০৭২২	৪৫.৫৪	২৯৫৩	১৬৩২	৫৫.২৭	৪৮৪৫১	২২৩৫৪	৪৬.১৪
১৯৫৮	৩৭০৮৫	১৭০২৫	৪৫.৯১	২৮৯৬	১৭০১	৫৮.৭৪	৩৯৯৮১	১৮৭২৬	৪৬.৪৮
১৯৫৯	৩৬৫৩৯	১৮৬১০	৫০.৪৩	২৯৮৪	১৫৩৬	৫১.৪৭	৩৯৫২৩	২০১৪৬	৫০.৯৭
১৯৬০	৩৯৪২০	২৩৫৯০	৫৯.৮৪	২৯৭৯	১৫৪৯	৫২.০০	৪২৩৯৯	২৫১৩৯	৫৯.২৯
১৯৬১	৫১০৩৪	২৯৮৮৮	৫৮.৫৬	৪২১৮	২৪১৬	৫৭.২৮	৫৫২৫২	৩২৩০৪	৫৮.৪৭
১৯৬২	৭০৩২১	৩৪৬০১	৪৯.২০	২২৮৮০	১২২৪৫	৫৩.৫২	৯৩২০১	৪৬৮৪৬	৫০.২৬
১৯৬৩	১০২৪৪২	৫৩২১৪	৫১.৯৫	৬৫৯৯	৪০৫০	৬১.৩৭	১০৯০৪১	৫৭২৬৪	৫২.৫২
১৯৬৪	৬০৯৩১	৪০৩০৫	৬৬.১৫	৫০৯৯	৩১৫৬	৬১.৮৯	৬৬০৩০	৪৩৪৬১	৬৫.৮২
১৯৬৫	৮৫৭৫৬	৪৫৯৫১	৫৩.৫৮	৭৮৯৮	৪৪৬২	৬৫.৫০	৯৩৬৫৩	৫০৪১৩	৫৩.৮৩
১৯৬৬	১১০৫৮০	৫৭২০৫	৫১.৭৩	১০০৪৮	৫৫২১	৫৪.৯৫	১২০৬২৮	৬২৭২৬	৯২.০০
১৯৬৭	১২৫৩২৫	৬৪৫৭৩	৫১.৫২	১০২৮২	৮৭৪৬	৮৫.০৬	২২৭১	১৬৮৪	৭৪.১৫
১৯৬৮	১৩৭০২১	৭০০১০	৫১.০৯	১৪৫৪৪	১২১৮৭	৮৩.৭৯	৩৬২৮	২৪৩৪	৬৭.০৯
১৯৬৯	১৫০৯০৭	৯৩১৫৬	৬১.৭৩	১৮৭৪০	১৬৭০০	৮৯.১১	৪২৫৬	৩১০১	৭২.৮৬
১৯৭০	১৯০৬২৭	৮৩২৫২	৪৩.৬৭	২৫২১৭	২০৭০৬	৮২.১১	৬৫৮০	৩৮০৮	৫৭.৩৭

Source: Bangladesh Bureau of Education Information and Statistic (Banbeis) Ministry of Education, Dhaka-1985, Table-1,Pp.1-2..

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল: ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত

বছর												
	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার	পরীক্ষায় অবতীর্ণ	উত্তীর্ণ	শতকরা হার
১৯৪৭	•	•	-	১১৬১	৭৭০	৬৬.৩২	৭৪৯	৬২২	৮৩.০৪	১১৩	৮১	৭১.৬৪
১৯৪৮	•	-	-	১২৪০	৬৩৫	৫১.২১	৭৪৪	৪৬১	৬১.৯৬	১২৬	৭৩	৫৭.৯৩
১৯৪৯	•	-	-	১১৯৪	৪০৫	৩৩.৯২	৮৬৫	৩৪৬	৪০.৪২	২৩১	১০০	৪৩.২৯
১৯৫০	১২২৬	৫২৫	৪২.৮২	১৪৮৩	৫৫৩	৩৭.২৯	৯২৬	৪৩৫	৪৬.৯৭	২৩৪	১১৩	৪৮.২৯
১৯৫১	১৯৬৬	১৪৩৬	৭৩.০৪	১২৬৭	৮০৬	৬৩.৬১	৬৬১	৪৫৪	৬৮.৬৮	১৮২	১১৪	৬২.৬৩
১৯৫২	২৮৪০	২০৭২	৭২.৯০	১৫৪৮	৮৭২	৫৬.২৪	৮৯৫	৬১২	৬৮০১০	২০৪	১৪৮	৭২.৫৪
১৯৫৩	৩৪০৩	২৭১২	৭৯.৬৯	২০৮৬	১২২৫	৫৮.৭২	৮৯৫	৬১২	৬৮.৩৮	২২০	১২৮	৬৪.০০
১৯৫৪	৪৪২৭	৩২৩০	৭২.৯৬	২৩৩২	১০০০	৪২.৮৮	১১৫৮	৬৭৮	৫৮.৫৫	২২০	১৩৯	৬৩.১৮
১৯৫৫	৪৮৮৪	৩২২০	৬৫.৯৩	২১৬৬	১২৫৭	৫৮.০৩	১৪৪০	৮০৮	৫৬.১১	২৮০	১৬৮	৫৯.৫৭
১৯৫৬	৪৮৯৪	৩৫৩৪	৭২.২১	২৩৮৭	১৪২৬	৫৯.৭৪	১৩৬০	৮৬১	৬৩.৩০	৩২৮	১৭৩	৫২.৭৪
১৯৫৭	৪৪৫২	৩২৮৩	৭৩.৭৪	২৬২৮	১৫৯২	৬০.৫৭	১৪২১	৯২২	৬৪.৮৮	৪১১	১৮৯	৪৫.৯৮
১৯৫৮	৪৬৫৫	৩৩১৮	৭১.৩০	২৮৮৮	১৮৪৭	৬৩.৯৫	১৬৬১	১০৫৯	৬৪.২৮	৪০৯	২৩৪	৫৭.২১
১৯৫৯	৪৯৪৪	৩৫০৯	৭০.৯৭	৩০৮৪	১৮২৫	৫৯.৮৭	১৯২২	১০৩১	৫৩.৬৪	৪২৪	২০২	৪৭.৬৪
১৯৬০	৫১৪৮	৩৪০০	৬৬.০৪	৩২৩৬	১৫৫০	৪৭.৮৯	২৩৬৬	১৩১২	৫৫.৪৪	৫১১	২১২	৪১.৪৮
১৯৬১	৫৪০০	৩৪৫৩	৬৩.৯৪	৩৫৬৪	২০৮১	৫৮.৩৯	২৪৩৯	১৩২৪	৫৪.২৮	৫১৩	২২৭	৪৪.২৫
১৯৬২	৫৯৮৮	৩৭৩২	৬২.৩২	৩৬৭৮	২১৬৫	৫৮.৮৬	২৩২৭	১২৯০	৫৫.৪৩	৬১২	২৯৯	৪৮.৮৫
১৯৬৩	৬০৩৩	৩৫৭৯	৫৯.৩২	৩৯৮০	২১৯১	৫৫.০৫	২৬১০	১৭২৯	৬৬.২৪	৭৭৪	৬৭৩	৮৬.৯৫
১৯৬৪	৩৫৫	১৪৫	৪০.৮৪	৩৬৮৯	১৮২০	৪৯.৩৩	২৮৯৩	১৯২৫	৬৬.৫৪	৬৬১	৫৪৬	৮২.৬০
১৯৬৫	১৫০৬	৬৯১	৪৫.৮৮	৩৮১৯	২১৫৩	৫৬.৩৭	৩০৮৮			৮০০	৬৫১	৮১.৩৭
১৯৬৬	৪০৩৩	২৩৮২	৫৯.০৬	৪০৫৫	২২৬৬	৫৫.৮৮	৩১৫৫	২১৭৬	৬৮.৯৭	৮৪৬	৬৯১	৮১.৬৮
১৯৬৭	৫৪০৫	৩৬১৪	৬৬.৮৪	৪৬৩৫	২৯৪৮	৬৩.৬০	৩৪৩২	২৫৫১	৭৪.৩৩	৯৭৬	৬৯৮	৭১.৫১
১৯৬৮	৫৩৮২	৩৫৮৮	৬৬.৬৬	৪৪৬২	৩১১৩	৬৯.৭৬	৩১৫৭	২৪৮৯	৭৮.৮৪	১০৩৬	৭৭৭	৭৫.০০
১৯৬৯	৬১২৩	৩৮৩৫	৬৭.৫০	৪১৭৬	৩০২৮	৭২.৫১	৩২৯৮	২৬৩১	৭৯.৭৭	১০৪০	৬৯৫	৬৬.৮২
১৯৭০		৪০২১	৬৫.৬৭	৪৪৮৩	৩৬৫২	৮১.৪৬	৩৭৯০	৩০৭০	৮১.০০	১২৭২	৯৩৫	৭৩.৫০

Source: Bangladesh Bureau of Education Information and Statistic (Banbeis) Ministry of Education, Dhaka-1985, Table-3, P.5.

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

Official Records.

- *Proceedings of the Pakistan Education Conference,* Held at Karachi From 27th November to 1st December 1947.
- *Report on Public Instruction in East Bengal for the Period* from August 15, 1947 to March, 31, 1948.
- *Report of the Madrasha Syllabus Committee,* 1947 (Syed Moazzamuddin Hossain Committee Report)
- *Report of the East Bengal Educational System Reconstruction committee,* Government of the East Bengal. 1951.
- *East Bengal Education Ordinance,* 1947.
- *Report on Public Instruction in East Bengal for the year,* 1948-49.
- *Proceedings of the Third Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan,* 1949.
- *পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ,বিজ্ঞাপন,* ১৯৫১
- *Adams Report, Vernacular Education,* Bengal and Behar, Submitted to Government in 1935,1936, & 1938.
- *Proceedings of the Education Kararchi,* 1951, Pakistan Government of Education Division. Part-1 and Part-2.
- *The East Bengal Secondary Education Act,* 1955 Government of East Bengal.
- *Proceedings of the Sixth Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan,* Held at Peshawar in 1954.
- *First Five Year Plan,* 1955-60, Government of Pakistan, National Planning Board, December 1957.
- *Report of the Education Reforms commission East Pakistan,* 1957, Government of East Bengal.
- *Six-year National Plan of Educational Developmen,t* June 1951 to 1957, Government of Pakistan.

Dhaka University Institutional Repository

- *Education Statistic for West Pakistan* for 1959-60 , The West Pakistan Bureau of Education, Pakistan.
- *Report of the commission on National Education,* 1959.
- *Curriculum for Primary Schools in Pakistan with Detailed Syllabuses*, Government of Pakistan, Ministry of Education, 1960.
- *The Dacca University Ordinance*, 1961 Government of East Pakistan.
- *The Commission on Students Problem and Welfare*, 1966, Ministry of Education, Government of Pakistan.
- *Annual Statistical Report on Public Instruction,* East Pakistan for 1958-59, Government of East Pakistan Directorate of Public Instruction.
- *Annual Statistical Report on Public Instruction*, East Pakistan for 1959-60, Government of East Pakistan Directorate of Public Instruction.
- *Annual Report on Public Instruction,* Directorate of East Pakistan for 1960-61.
- *Annual Report on Public Instruction,* Directorate of East Pakistan for 1961-62.
- *Annual Report on Public Instruction,* Directorate of East Bengal 1962-63.
- *Education Statistic for West Pakistan* for 1962-63, Part-I, Primary School, West Pakistan Bureau of Education, Lahore.
- *Education Statistic for West Pakistan* for 1962-63, Part-II, Secondary School, The West Pakistan Bureau of Education, Lahore.
- *Education Statistic for West Pakistan* for 1962-63, Part-III, Higher Education, West Pakistan Bureau of Education, Lahore.
- *Directory of Government, Educational Institutions in East Pakistan* (March, 1968), Government of East Pakistan, Bureau of Education Information and Statistic. Education Directorate.
- *Educational Development in Pakistan,* A Statistical of Educational Development in Relation Manpower Requirement and Resource Availability, Ministry of Education Government of Pakistan, Islamabad, 1968.
- *Proposals for A New Educational Policy*, Ministry of Education and Scientific Research Government of Pakistan 1969.

Dhaka University Institutional Repository

- *Education and Supply of Manpower in Pakistan,* Planning Commission, Islamabad, 1970.
- *Education is Salvations, Statistical Information of Education in East Pakistan,* Directorate of Public Instruction, East Pakistan Education Week, 1970.
- *The New Education policy of the Government of Pakistan* (Muhammad Shamsul Huq) Islamabad, 1970.
- *Government of East Bengal, B- Proceedings,* Bundle no. 70-150.
- *Government of East Pakistan Planning Department,* Annual Plan 1970-1971, Public Program and Training.
- *The Second Five year Plan* (1960-65), Government of Pakistan Planning Commission.
- *The Third Five year Plan* (1965-70), Government of Pakistan Planning Commission.
- *Bangladesh Bureau of Education Informations and Statistic* (Banbeis), Ministry of Education, Dhaka-1985.
- *Report of the Pay and Service commission* 1959-62 by the Manager, Printing Corporation of Pakistan Press, Karachi.
- *Report on Progress of Education in Pakistan* for 1947-57, Ministry of Education, and Government of Pakistan.
- *Education and supply of manpower in Pakistan,* Planning commission, Islamabad, 1970.
- *Census Report of Pakistan,* 1951.
- *Pakistan Economic Survey,* 1968-69, Government of Pakistan Ministry of Finance, Islamamabad, 1969.
- *Reports of the Advisory Panels for the Fourth five year plan* 1970-75, vol.1, Planning commission Government of Pakistan, Islamabad, July 1970.
- *Twenty years of Pakistan in statistics,* 1947-67. Ministry of economic affairs, central Statistic office.

Dhaka University Institutional Repository

- *Pakistan Economic Surve,* 1969-70, Ministry of Finance, government of Pakistan. Islamabad 1970.
- *Assembly proceedings official Report. East Bengal Legislative Assembly.* First Session March 1948.
- *Assembly proceedings official Report.* East Bengal Legislative Assembly. Third Session March 1949.
- *Pakistan National-Constituent Assembly Debates* Session 8, November 21, 1950.
- *Assembly proceedings official Report. East Bengal Legislative* Assembly. Ninth Session. Vol.IX-No.1, October 1952.
- *Assembly proceedings official Report. East Bengal Legislative* Assembly. Third Session.1956, Vol.XV-No.5.
- *Assembly proceedings official Report. East Bengal Legislative Assembly.* First Session.19562, Vol.21.
- Assembly proceedings official Report. *East Bengal Legislative Assembly.* First Session.19564-1965, Vol.XXVI No.5
- *Pakistan National Assembly debates,* Vol.II, June 22, 1966.
- Assembly proceedings official Report. *East Bengal Legislative Assembly.* First Session.19566-1967, Vol.30.
- Assembly proceedings official Report. *East Bengal Legislative Assembly.* First Session.19568-1969, Vol.33.
- Assembly proceedings official Report. *East Bengal Legislative Assembly.* First Session.19557, Vol.5.
- Education Commission: *Report by the Bangla Provincial Committee and with Evidence taken before the Committee Memorial Addressed to the Education Commission,* Calcutta, 1884.
- *Proceedings of the Fifth Meeting of the Advisory Board of Educations for Pakistan,* Held at Bahalpur on 5th and 6th March 1953. Government of Pakistan Ministry of Education.

Dhaka University Institutional Repository

- *Census of Pakistan Population 1961,* Vol-2, East Pakistan, Home Affairs Division, East Pakistan.
- *Bangladesh Population Census 1981,* Analytical Findings and National Tables August 1984. Bangladesh Bureau of Statistics.
- *Proceedings of the Fourth Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan,* Held at Lahore, From 29th November 1st December 1950.
- *Second Quinquunial Statistical Report on Public Instruction,* East Pakistan During the year 1952-14957. Government of East Pakistan, Directorate of Publication.
- *Bangladesh Education Sector Review.* Vol. II. UPL. 1999.
- *Report on Educational Progress in Pakistan,* Presented at 20th to 28th International Conference on Public Education, Geneva, 1947-1957 to 1964-65 Government of Pakistan Ministry of Education and Information.
- *Government of East Pakistan Finance Department,* Details of Demand for Grants and Charged expenditure for the year 1966-67, Vol.1.

সংবাদপত্র (News Papers)

দৈনিক আজাদ, ১৯৫২-১৯৬৭

- *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৯৫৪-১৯৭০
- *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৯৬৭,১৯৬৮,১৯৬৯
- *দৈনিক সংবাদ,* ১৯৫৬-৬৭
- *সাপ্তাহিক মাতৃভূমি,* ৬ ডিসেম্বের ১৯৭০
- *মাসিক মোহাম্মদী,* শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১,১৩৬৭
- *দৈনিক জনকণ্ঠ,* ৭ মার্চ ও ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৯
- *সওগাত,* শ্রাবণ, ১৩৫৯
- The Pakistan Observer, 1954-1955
- *The Dawn,* Karachi, 1970
- *The New York Times,* 26 March 1969.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত প্রবন্ধ (Printed Articles In Journals.)

- শহীদুল ইসলাম,আমাদের *শিক্ষানীতির অতীত ও বর্তমান*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ২৫,২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও পরিকল্পনা সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধমালা সংকলন
- নূরুল হুদা আবুল মনসুর ও শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, *১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধ ও পাকিস্তানের ভূমিকা: একটি পুনর্মূল্যায়ণ*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৫-২৬, ১৯৯৮-২০০১
- বাংলাদেশ বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
- বাখরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির ঊনত্রিশতম অধিবেশনে ৭-৮ মে ১৯৪৯, স্থান-মদনমোহন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, শুকদেব, ভোলা, সভাপতির ভাষন, সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খান, সভাপতি পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
- খান সারওয়ার মুরশিদ, সম্পাদক মনজুর মণ্ডলা, *শ্রাবণ*, ত্রৈমাশিক, ২য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, এপ্রিল জুন-১৯৮৭
- ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ,সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খান, পূর্ববঙ্গ শিক্ষা সংসদ, ৫ এবং ৬ জৈষ্ঠ্য ১৩৫৬
- D. Mon‡jv ur Ahmed, *Education is Progress Proceedings of the Symposi*, East Bengal Education Week, 1968.
- শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, প্রকাশকাল: ২০০১
- Education for all, Papers and Proceedings of the Symposia, East Pakistan Education week 1966-67. Ed. Abdullah-Al-Muti Sharfuddin, Dhaka, 1968.
- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন, সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী: ১৯৬৩-৬৫

প্রকাশিত বই (Printed Books)

- Buchanan. C, *The College of Fort William in Bengal*, London, 1805.
- Bhatt. B.D. and Aggarwal J. C, *Education Documents in India* (1813-1968), New Delhi. 1969.
- Choudhury A.H, *Economic Aspects of Higher Education and Student Unrest in Pakistan Society for Pakistan Studies,* Dhaka: First ed. March 1971.
- Hunter. W.W, *The Indian Musalmans*, Reprinted from the first Edition, Lahore, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

- Jahan. Rounaq, *Pakistan: Failure in National Integration*, Dhaka: The University Press Ltd. 1994.
- Khatun. Dr. Sharifa. *Development of Primary Education Policy in Bangladesh.* Published by the University of Dhaka, First ed. March 1992
- Karim. Nehal, *Exploitation, Domination and Alienation*, Dhaka: Osmany Library, 1994
- Keay. E.F, *Indian Education in Ancient and Later times: An Enquiry into its origin, Development` and Ideals*, New Dhlhi 1938.
- Karim Abdul, *Mahammadan Education in Bengal.* Calcutta 1900.
- Kabir. Mufizullah, *Experience of an Exile at Home*,Dhaka: Asitic Press, 1972
- Mathai, *Village Government in British India.* London. T.F. Irwin 1915
- Mahmod. Syed, *A History of English Education In India.* (1781-1893) Aligarh. 1895.
- Mohar. M. Ali , *History of the Muslims of Bengal.* Vol. Ib. Riyadh 1985
- Miah. M. Maniruzzan,, *Thoughts on Higher Education* Dhaka: *Kakali Prokhashoni*, 2003.
- Muhith. A. M.A. Bangladesh, *Emergencee of Nation.* Dhaka 1978.
- Rahim, Muhammad, Abdur, *The History of the University of Dhaka*, Dhaka University, 1981.
- Rahman. Fazlur. *New Education in Making New Pakistan*, Cassal and co.Lmt. London. 1953.
- Sharp. H. *Selections from Educational Record* , (1781-1839) Part-1, Calcutta, Superintendent of Government Printing 1920.
- Sayeed. K. B. *The Political System of Pakistan*, Boston,1967.
- Sen. Rangalal, *Political Elites in Bengal*, Dhaka: U.P.L., 1986.
- Salam.*K. M. Abdus, Emprovement in Secondary Education*, Dhaka, 1956.
- Tomas. F.W. *The History and Prospects of British Education in India*, Cambridge 1981.
- মো: আজহার আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬
- অলি আহাদ. *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*, ঢাকা: খোজরোজ কিতাব মহলো , ১৯৮২
- মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বয়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯২
- আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহলো , সপ্তম মুদ্রণ,১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

- ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যমও মাতৃভাষা*, ঢাকা: তিষা বুক ট্রেড, ২০০৩
- মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হলো অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়*, ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৮৯
- সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য : *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭
- আবুল মনসুর আহমদ, *পাক বাংলার কালচার*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস,১৯৬৬
- ড. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ. *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০০০
- বদরুদ্দীন উমর, *শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন*, ঢাকা: শ্রাবণী প্রকাশনী, ২০০১
- বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: ১ম খন্ড, ১৯৭০
- মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯১
- রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১
- কল্যাণী কার্লেকর, *ভারতের শিক্ষা জিজ্ঞাসা*, কলকাতা মাঘ-১৩৫১
- মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ১৯৮৭
- হেনা দাস, *আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন*, ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশন, ১৯৯৯
- ড. নিতাই দাস, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা*, ঢাকা: মীরা প্রকাশনী, ২০০০
- শ্রী ধীরেন্দ্র লাল ধর, *এই দেশেরই মেয়ে*, কলকাতা ৯, প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, শাম্যাচরণ স্ট্রীট, ১৯৪৯
- মুজিবুর রহমান খান, *পাকিস্তানের সৃষ্টি, পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭
- রতন লাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলন: দলিল পত্র*, ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন, ১৯৯১
- প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় জ্যোতি, *আমাদের শিক্ষা সমস্যা* , কলকাতা: শিখা প্রকাশনী, ১৯৬৯
- আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, দ্বিতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৬৮
- অনাথ নাথ বসু,*আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, কলকাতা, ১৩৫১
- মৃত্যুঞ্জয় বকসী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা
- ড. সুকুমার বিশ্বাস, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন*, কলকাতার সংবাদপত্র, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
- শফিউল আজম, মমতাজ জাহান, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত *শিক্ষাকোষ*, ঢাকা: সুইস ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো: ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

- আব্দুল মতিন ও রফিক আহমদ, *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
- মুহম্মদ আব্দুল, মান্নান *শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪
- মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষার ইতিহাসের সার সংগ্রহ*, ঢাকা: মিতা প্রকাশনী- ১৯৭৪
- আজিজুর রহমান মল্লিক, *ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২
- অনিল মুখার্জি, *স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামের পটভূমি*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ (দ্বিতীয় বাংলাদেশী সংস্করণ) ১৯৮০
- আব্দুল্লাহ আল মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৯৬
- সাঈদ উর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি আন্দোলন*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩
- ড. বসন্ত কুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা, স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮৭
- ড. রঙ্গলালসেন, *বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: শিখা প্রকাশন, ২০০৩
- এ. এস. এইচকে. সাদেক. *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ভাবনা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯
- সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬
- জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০০
- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলার ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২
- আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৬
- শামসুল হক, *শিক্ষা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩
- আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, ঢাকা: আইন ও সালিস কেন্দ্র, ১৯৯২
- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র:* ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৮ম খন্ড
- ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০-৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯
- ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ,২০০০
- ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২
- ড. মোহাম্মদ হান্নান, সম্পাদিত *সংবাদপত্রে শিক্ষা ভাবনা*, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০১
- হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনা,২০০২
- ড. কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৪